নীলকণ্ঠ হিমালয়

অবধূত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

শ্রীদেবব্রত ধর

সুহৃদ্বরেষু

এই লেখকের

মরুতীর্থ হিংলাজ
উদ্ধারণপুরের ঘাট
বশীকরণ
বহুব্রীহি
শুভায় ভবতু
দুইতারা
অবিমুক্ত ক্ষেত্রে
দেবারিগণ
ন ভূতং ন ভবিষ্যতি
ভূমিকালিপি পূর্ববৎ
পিয়ারী
হিংলাজের পরে
সীমন্তিনী সীমা
কৌশিকী কানাড়া
দুর্গম পন্থা
ভোরের গোধূলি
মায়ামাধুরী
দুরি বৌদি
নিরাকারের নিয়তি
মিড় [illegible]ক মূর্চ্ছনা
ক্লীম
[illegible]তীর্থ কালীঘাট

পাঠকের নিবেদন

'অবধূত' যখন তাঁর 'মরুতীর্থ' নিয়ে মুরুব্বীহীন হালে নিঃশব্দে বাঙলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেন তখন উভয় বাঙলার বাঙালী পাঠক মাত্রই যে বিস্মিত হয়েছিলেন সে-কথা নিশ্চয়ই অনেকের স্মরণে আছে। এ তো মরুতীর্থ নয়, এ যে রসে রসে ভরা 'রসতীর্থ'।

হিন্দু তীর্থের প্রতি মুসলমানের কোনো কৌতূহল থাকার কথা নয়, কিন্তু এই গ্রন্থ প'ড়ে পূর্ব পাকিস্তানী একটি মুসলমান তরুণ আমাকে বলে, সে নিশ্চয়ই হিংলাজ দেখতে যাবে—সে তখন করাচীতে চাকরী করে, তার পক্ষে যাওয়া সুকঠিন ছিল না। আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম, 'অমন কর্মটি করো না। আর্টিস্টের মডেলের সন্ধানে কেউ কখনো বেরোয়'! যে 'ভিখারিনী'-ছবি তুমি পর্শু দিন একশ' টাকা দিয়ে কিনলে তুমি কি সে-ভিখারিনীর সন্ধানে বেরোও, যাকে মডেল্-রূপে সামনে খাড়া রেখে আর্টিস্ট ছবি এঁকেছিল? বরঞ্চ বলব, তার সঙ্গে দৈবাৎ রাস্তায় দেখা হলে তুমি তো উল্টো ফুটে চলে যাও! কারণ, সে তো তোমার হৃদয়ে কোনো ঈস্থেটিক্ আনন্দ দিতে পারে না। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, অবধূত-মহারাজ সাধু ব্যক্তি; সে সাধুতা তিনি লেখক হিসেবেও রক্ষা করেছেন এবং তাঁর পুস্তকে তিনি অতিরঞ্জন করেন নি। কোনো কোনো সাধুবাবাজী 'বড়-তামাক' সেবন করেন; অবধূত কখনো করেছেন কি না বলা কঠিন—অন্তত তাঁর ডেরাতে সে 'খুশবাই' আমি পাই নি কিন্তু একথা বর্হক্ সত্য, তাঁর সৃষ্টিতে গঞ্জিকা-বিলাস বিলকুল নদারদ। কাজেই হিংলাজে গিয়ে তুমি টায় টায় তাই পাবে, দফে দফে সে-সব জিনিসই পাবে যার বয়ান অবধূত 'ইমানসে' দিয়াছেন; তাঁর ইন্ভেন্ট্রিতে ফাঁকি পাবে না। এবং পাবে না—এবং সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা—তাঁর বই প'ড়ে যে কাব্যরস, যে কলাসৃষ্টিরস, যে ঈস্থেটিক ডিলাইট পেয়েছিলে

সেই অনবদ্য অমৃত। তার শেষ প্রমাণ; সূর্যোদয় তো আমরা নিত্যি নিত্যি দেখি, তবে সূর্যোদয়ের ছবি কিনি কেন?'

তাহলে প্রশ্ন, অবধূত কি খাঁটি রিয়ালিস্টিক লেখক?

অবধূত কি বাস্তব জগৎ ছাড়িয়ে যেতে পারেন না?

কল্পনার ডানা জুড়ে দিয়ে তিনি যদি আমাদের নভোলোকে উড্ডীয়মান না করতে পারেন তবে বাস্তবের কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে কী এমন চরম মোক্ষলাভ![1]

এর উত্তর অতিশয় সরল। অবধূত যদি তাঁর কল্পনা, তাঁর সৃজনী-শক্তি, তাঁর স্পর্শকাতরতা মরুতীর্থের পাতায় পাতায় ঢেলে না দিয়ে থাকতেন তবে পুস্তকটি রসকষহীন মরুই থেকে যেত। বড় জোর সেটা হত গাইড বুক্। গাইড বুক্ বড়ই প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, আর্ট আরম্ভ হয় ঠিক সেই জায়গা থেকে যেখা[ন] প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। রাধু মালী কেনেস্তারায় করে নাইবার [জ] যে-জল এনে দেয় তাতে প্রয়োজন মেটে বটে, কিন্তু নন্দলাল কর্তৃ[ক] বহুবর্ণে বিচিত্রিত কুম্ভ মস্তকে ধারণ করে যখন তম্বঙ্গী মরাল গা[মিনী] জল নিয়ে আসে তখন সঙ্গে সঙ্গে আসে আর্টের উপাদান, সেই জ[ল] সঙ্গে সঙ্গে আসে কল্পনার উৎস, সৃষ্টির অনুপ্রেরণা—সেই পুণ্য[...] মরুতীর্থকে 'শ্যামল সুন্দর' করে তোলে, সে তখন দেয় 'তৃষা-হরা ভরা সঙ্গ-সুধা' এবং কে না জানে 'সঙ্গ' ও 'সাহিত্য' বড় কাছ[াকাছি বাস] করে।

কিন্তু ঐ এক 'মরুতীর্থ'ই তো অবধূতের একমাত্র বা সর্ব[শ্রেষ্ঠ] রসসৃষ্টি নয় যে সুদ্দুমাত্র এইটে বিশ্লেষণ করেই আমরা পুস্ত[ক]

১ যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা সেখানে মানুষ আপ[নাকে] হারায়। তাকে বা স্ত ব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব [নয়,] তার অনেকখানি অ বা স্ত ব, অর্থাৎ তা সত্য।' রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী [...] খণ্ড, পৃ ২৮৫।

লেখকের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে যাবো, এবং প্রশ্ন, রসের হাটে ভ্রমণ-কাহিনী কোন্ কাতারে বসার হক্ক ধরে, বাজারের বৈচিত্র্য নির্মাণে তার সেবা কতখানি, সে পাবে কোন্ শিরোপা? বিশেষত বাঙলা সাহিত্যে? লোকে বলে 'ঘরমুখো বাঙালী'; কাজেই তার কাছ থেকে আর সব-কিছুই আশা করা যেতে পারে, শুধু ভ্রমণ-কাহিনীটি মাফ করে দিতে হয়। তাই যদি হয়, তবে বলবো, 'পালামৌ'-র পরই 'মরুতীর্থ'। এবং তার পরও তাকে কেউ আসনচ্যুত করতে পারে নি। বলা বাহুল্য, এসব আলোচনায় আমরা গুরু রবীন্দ্রনাথকে বাদ দি।

তবে কি অবধূত শুধু ভ্রমণকাহিনীর কীর্তনিয়া—পার্ এক্সেলাঁস?

অধীন সমালোচক নয়, বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপকও নয়। তার প্রধান পরিচয়—সে যা মনে করে—পাঠক রূপে। সে বই পড়তে ভালোবাসে এবং যদ্যপি ঈশ্বরেচ্ছায়, বা নসীবের গর্দিশে, যাই বলুন, সে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাওয়ার ফলে বাঙলা ছাড়াও দু-একটি অতিশয় ধনী তথা খানদানী ভাষার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত হয়েছে, তথাপি সে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে আপন মাতৃভাষা বাঙলাতেই বই পড়তে। এবং কোনো বই পড়ে—বিশেষ করে সে-বইয়ের লেখক যদি অখ্যাত-নামা হয়, তাকে যদি নববধূর মত লজ্জিত শঙ্কিত পদে বাঙলা বাসরে প্রবেশ করতে দেখে তবে আঙ্গিনা থেকে তার কল্যাণ কামনা করে, বয়সে ছোট হলে আশীর্বাদ জানায়। আবার বলছি, পাঠক হিসেবে। 'অবধূত' 'শঙ্কর' আদিকে আমি উদ্বাহু হয়ে অযাচিত অভিনন্দন জানাই, বাঙলা সাহিত্যে তাঁদের প্রবেশ-লগ্নেই। পরবর্তীকালে কেউ কেউ আমাকে আরো আশাতীত আনন্দ দিয়েছেন, কেউ কেউ দেন নি, কিন্তু সে নিয়ে আমার ক্ষোভ নেই, কারণ এ-দুজনা আমাকে নিরাশ করেন নি।

অবধূতের বয়স হয়েছে, তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য। আমিও তদ্বৎ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, আমি সমালোচক বা অধ্যাপক নই,—তাঁর রচনা সম্বন্ধে আমার লিখবার যেটুকু হক্ক আছে সে শুধু, তিনি লেখক পার্

এক্‌সেলাঁস, আমি তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠকদের ভিতর পাঠক পার্‌ একসেলাঁস, পাঠকোত্তম। আমি 'উদ্ধারণপুরে'র কাছেই বাস করি; এর সঙ্গে আমার আবাল্য পরিচয়। এ 'ঘাট' দিয়ে উভয়ে একসঙ্গে না গেলেও শীঘ্রই আমরা 'ওপারে' মিলিত হব। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে সৃষ্টির চরম রহস্য জেনে নেবার পূর্বেই অবধূতের 'সৃষ্টি' সম্বন্ধে আমার বিস্ময় প্রকাশ করে যাই।

আমার পরিচিত কোনো কোনো কনিষ্ঠের ধারণা—যার উল্লেখ এইমাত্র করলুম যে, অবধূত আসলে ভ্রমণকাহিনী লেখক। বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ-ধারণা ভুল নাও হতে পারে। কারণ বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি,—গেরুয়াধারীকে সরাসরি প্রশ্ন শুধনো অনুচিত—তিনি দীর্ঘকাল সন্ন্যাসীশ্রমণজনোচিত স্থান পরিবর্তন বা পর্যটন করেছেন, এবং সে-কারণে তাঁর রচনাতে সব সময়ই অল্পবিস্তর আনাগোনা থাকে, এবং পরোক্ষভাবে সেটাকে ডাইনামিক করে তোলে। এটা সদ্‌গুণ, কিন্তু এটা অবধূতের একমাত্র গুণ তো নয়ই, প্রধানতম গুণও নিশ্চয়ই নয়।

আবার, কোনো কোনো কনিষ্ঠের ধারণা—এরা সাধারণত আমার সমুখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে—অবধূত প্রধানত সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে ফক্কুড়ী ধাপ্পাবাজী আছে সেটার নিরতিশয় নগ্নরূপ আমাদের সামনে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলিয়েছেন। এটাও পূর্বেকার মত আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। ফক্কুড়ী, ধাপ্পাবাজী বুজরুকী,[২]—এরই মোলায়েম নাম 'ধরাধরি' বা 'তদ্‌বীর' (অবধূতের ভাষায়ও বোধহয় আছে, 'বসুন্ধরা পূর্বে বীরভোগ্যা ছিলেন, অধুনা তদ্‌বীরভোগ্যা')—এসব তো সর্বত্রই আছে, এবং এ-বাবদে সন্ন্যাসীদের নিদারুণ টিট দিতে পারে হাল-ফিলের গৃহীরা, এবং কলকাতায় তাদের সন্ধানে বিস্তর

২ বুজরুকী শব্দটি এসেছে ফার্সী বুজুর্গ থেকে—অর্থ অতি ভদ্র; মুরুব্বী সাধুজন, উচ্চস্থানীয়; সেইটার অভিনয়, বাঙলায় ভণ্ডামী।

তকলাফ বরদাস্ত করতে হয় না; বস্তুত তাদের অনাচারে প্রাণ অতিষ্ঠ। হাট-বাজারে, মেলা-মজলিসে, সাহিত্য-বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে—যেখানে বিশ্বজ্ঞান, বিশ্বপ্রেম সেখানেই তো বিশ্ব-ফক্কুড়ী—এ তো পাড়ার পদিপিসীও জানে। তার দাওয়াই কি, সেও তো অজানা নয়। শুধু অজানা—এ-খাটাশের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? অবধূত সমাজ-সংস্কারক নন—ডন্ কুইক্‌সটের মত নাঙ্গা তলওয়ার দিয়ে বেপরওয়া বায়ুযন্ত্র (উইণ্ড-মিল) আক্রমণ করা তাঁর 'ধর্মে' নেই। লোকটি বড়ই শান্তিপ্রিয়। শুধু যেখানে বর্বর পশুবল অত্যাচার করতে আসে, এবং সে-পশুবল ফক্কুড়ীতেও সিদ্ধহস্ত সেখানে অবধূত, ফক্কুড়ীর মুষ্টিযোগ ফক্কুড়ি ছাড়া নান্যপন্থা বিদ্যতে বিলক্ষণ জানেন বলেই সেটা বীভৎস রুদ্ররূপে দেখাতে জানেন। কিন্তু এটা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, শীলের দিক। লেখক হিসাবে এটা তাঁর নগণ্যতম পরিচয়। কারণ লেখক হিসেবে 'হীরো' রূপ তিনি কস্মিনকালেও আত্মপ্রকাশ করতে চান নি।

আর্ট ও জীবন নিয়ে সবচেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন কবিরাজ গ্যোটে। সে আলোচনা বহুস্থলে এতই সূক্ষ্ম যে আপনার আমার মত সাধারণ পাঠক দিশেহারা হয়ে যেতে বাধ্য। তবে সে আলোচনার ভিতর না গিয়ে সরাসরি আর্টের ভিতর জীবন ও কোনো কোনো স্থলে লেখকের জীবনীরও অনুসন্ধান করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টি সঙ্কট-সঙ্কুল। একটি দৃষ্টান্তই এস্থলে যথেষ্ট। বাঙলাদেশে কেন, পৃথিবীর হাস্য-রসিকদের ভিতর 'পরশুরামে'র স্থান অতি উচ্চে। অথচ যে-সব সৌভাগ্যবান তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই জানেন, হাস্যরস ঠাট্টামস্করা দিয়ে তিনি মজলিস না জমিয়ে বরঞ্চ সুযোগ দিতেন আমাদের মত রামা-শ্যামাকে। একবার তাঁকে আমি একখানা চিঠিতে লিখি, তাঁর বাড়ির ও পাড়ার ছেলেদের সামনে আমি ম্যাজিক দেখাবো, তবে তিনি সেস্থলে সশরীর উপস্থিত না থাকলেই ভালো। তিনি কাতর কণ্ঠে উত্তর লেখেন, 'আমাকে গুমড়োমুখো দেখে

ভাববেন না, আমার রসবোধ নেই।' অবধূতের বেলা ঠিক তার উল্টো। তাঁর লেখাতে ব্যঙ্গ আছে, বিদ্রূপ আছে,—যেন হাসতে হাসতে তিনি বুজরুকির মুখোশ একটার পর একটা ছিঁড়ে ফেলছেন, কোনো কোনো স্থলে সেই সুবাদে তিনি বিকট বীভৎস রসেরও অবতারণা করেছেন কিন্তু অকারণে হাস্যরস অবতারণা করতে তাঁকে বড় একটা দেখা যায় না। অথচ অন্তরঙ্গজনের মধ্যে অবধূতের অন্য রূপ। সেখানে তিনি অভিনয়সহ যে বিশুদ্ধ হাস্যরস উপস্থিত করেন সে যে কী স্বচ্ছ, কী চটুল—যেন পার্বত্য নির্ঝরিণী আপন বেগে পাথর থেকে পাথরে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলেছে—তাঁরাই শুধু জানেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ। তাঁর একটি অভিনয় এমনই অনবদ্য যে সেটি টেলিভিজনে দেখানো উচিত। চুঁচড়ো চন্নগর অঞ্চলে এক বিশেষ সম্প্রদায়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ভোজন করা অভদ্রতার চূড়ান্ত। নিমন্ত্রণকারী সোনার থালার চতুর্দিকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে নিমন্ত্রিতের সামনে গলবস্ত্র হয়ে, হাত কচলাতে কচলাতে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বারবার শুধু ফরিয়াদ জানাবেন, তিনি অতিশয় দরিদ্র, সামান্যতম অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করতেও সম্পূর্ণ অক্ষম ; এবং নিমন্ত্রিতজনও অতি-বড়-গাওয়াইয়ার মত তালের আড়ির সঙ্গে কুআড়ি লাগিয়ে, ইস্টিকের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—থালার সামনের পিঁড়িতে বসাটাও নাকি পবিত্র, যুগ যুগ সঞ্চিত সর্ব ঐতিহ্যভঞ্জনকারী সখৎ বেয়াদবীর চূড়ান্ত—বলবেন, প্রায় চোখের জল ফেলে, যে, এরকম অত্যুত্তম ব্যবস্থা তাঁর চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনো দেখে নি, এ বাড়ির গৃহিণী রন্ধনে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী, আর হবেই বা না কেন, এঁরা যে পুরুষানুক্রমে দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের গৌরীশঙ্কর, 'নীলকণ্ঠ'! এহেন রসময় চাপান-ওতর বাস্তবে কতক্ষণ ধরে চলতো বা এখনো চলে সে অভিজ্ঞতা আমার নেই, কিন্তু অবধূত মৌজে থাকলে নিদেন আধঘণ্টা, এবং উভয়পক্ষের সেই নিছক কথার তুবড়ী-বাজী ফুলঝুরি শুধু লেখাতে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কারণ একা অবধূতই দুটি পার্ট একসঙ্গে প্লে করে যান। খনে গল-বস্ত্র কাঁদো-কাঁদো গৃহস্থ, খনে বাষ্পাকুল-কণ্ঠ নিমন্ত্রিতজন। ক্ষণে বিপজ্জলে আকণ্ঠনিমগ্ন কাতর নিমন্ত্রণকারী, ক্ষণে চরম আপ্যায়িত, কৃতজ্ঞতার ভারে আজানুন্যুব্জ, আনন্দাশ্রুতে চক্ষুদ্বয়সিক্ত নিমন্ত্রিত।

এবং এখানে এসে সত্যই অবধূতকে জোব্বার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে হয়!

অথচ আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, গেরুয়ার খুঁট না, যেন শৌখীন নিমন্ত্রিতের জেব থেকে বেরিয়ে এল ফুলকাটা-লেস-লাগানো হাওয়া-তোড়্-হাল্কাসে-হাল্কা বেড্শীট সাইজের রুমাল! বিশ্বাস করবেন না, আমি পেলুম ভুরভুরে আতরের খুশবাই। বলা বাহুল্য, নিমন্ত্রিতজন কণামাত্র খাদ্য স্পর্শ করবেন না—ভাবখানা এই, আমাদের কারোরই বাড়িতে অন্নাভাব নেই; তদুপরি খানদানী নবাব মাত্রই ডায়েটে থাকেন।

এই অভিনয় করার পরিপূর্ণ বিধিদত্ত দক্ষতা ছিল অতি বাল্যকাল থেকেই আরেকটি লেখকের— চেখফ্। পাঠশালে যাবার সময় থেকেই তিনি বাপ-কাকা পাড়া-প্রতিবেশী সকলের অনুকরণ করে অভিনয় করতে পারতেন—কেউ কেউ খুশী হয়ে তাঁকে লেবেন্চুস্ লাট্টুটা উপহারও দিতেন।

এই অভিনয়দক্ষতা আপন কলমে স্থানান্তরিত করতে পারলেই লেখকের 'সকলং হস্ততলং'—লেখা তখনই হয় convincing; তার বিগলিতার্থ, অভিনয় করার সময় যেরকম প্রত্যেকের আপন আপন ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা অপরিহার্য, লেখার বেলাও তাই। এখানে কর্মটি কঠিনতর। কারণ এখানে অঙ্গভঙ্গী করতে পারবেন না, চোখের জল ফেলে দেখাতে পারবেন না। অর্থাৎ টকি-সিনেমার কাজ গ্রামোফোন রেকর্ড দিয়ে সারতে হচ্ছে। আসলে তার চেয়েও কঠিন, কারণ, কণ্ঠস্বর দিয়ে বহুৎ বেশী ভেল্কিবাজী দেখানো যায়। অনেকের অনেক রকম ভাষা—কেউবা স্ল্যাঙ ব্যবহার করে, কারো বা ইডিয়ম

জোরদার, কেউ কথায় কথায় প্রবাদ ছাড়ে, কেউ বলে ভুশ্চাযের মত সংস্কৃত-ঘ্যাঁষা ভাষা, কেউ কিঞ্চিৎ যাবনিক—এ সব-কটা করায়ত্ত না থাকলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথাবার্তা convincing ধরনে প্রকাশ করা যায় না। এ বাবদে বাঙলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ: মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। আমি এ-বিষয় নিয়ে অন্যত্র দীর্ঘ আলোচনা করেছি; এ-স্থলে বলি, এ যেন একটা মিরাকৃল্। মাইকেল বাল্যাবস্থায় যশোর ছাড়েন, তারপর সেখানে আর কখনো যান নি। তদুপরি অনেক কাল কাটালেন বাঙলার বাইরে। অথচ পরিণত বয়সে এই নাটকে, অর্ধশিক্ষিত হিন্দু কর্মচারী, তার অশিক্ষিত হিন্দু চাকর, অশিক্ষিত মুসলমান চাষা, তার চেয়েও অগা তার বউ, এবং আরো চার পাঁচজন—সবাই মিলে অন্তত সাত আট রকমের কথা বলে খাঁটির চেয়েও খাঁটি মধুর যশোরী ভাষায়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শেডে।

'আলাল,' 'হুতোম' 'পরশুরাম' পেরিয়ে এ-যুগে এলে পাচ্ছি দুজন লেখক যাঁদের কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আছে। অবধূত জানেন খাস কলকাত্তাই—কিন্তু এ-কলকাত্তাই হুতোমের কলকাত্তাই নয়, কারণ এর থেকে বহু আরবী-ফার্সী শব্দ উধাও হয়ে গিয়েছে, ইংরিজি ও হিন্দী শব্দ ঢুকেছে এবং অভাব-অনটনের ভিন্ন জীবন প্যাটার্ন নির্মিত হওয়ার ফলে এক নূতন ইডিয়ম সৃষ্ট হচ্ছে—এবং গজেন্দ্র মিত্র জানেন কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘরোয়া মেয়েলি ভাষা। যত দিন সাধুভাষা চালু ছিল ততদিন এ দুটোর অল্পই কদর ছিল, কিন্তু চলতি ভাষা—সেও প্রধানত কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা—কল্কে পেয়ে আসন জমানোর সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর চাহিদা বাড়বেই। জনগণের কথ্য ভাষার শিকড় দিয়ে লিখিত ভাষা যদি নিত্য নিত্য প্রাণরস আহরণ না করে তবে সে একদিন শুকিয়ে গিয়ে 'ডেড্ ল্যান্গুইজ্' হয়ে যায়—সংস্কৃত, লাতিনের বেলা যা হয়েছিল, এ-দেশের 'শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে'র যা

হয়েছে। তাই বাঙলা থেকে সাধু ভাষা বর্জন করে আমরা ভালোই করেছি। ভাষাটির কাঠামো ছিল ঢাকার কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রচলন হল মেট্রপলিস্ কলকাতায়। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম এঁদের সকলেই রাঢ়ী ও কর্মভূমি কলকাতায়। এঁরা ঢাকার শব্দ, ইডিয়ম, প্রবাদ, বচন-ভঙ্গী আমদানী করতে পারেন না, আবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এসব মাল—পূর্বে যাকে বলেছি 'শিকড় দিয়ে প্রাণরস আহরণ করা'—সাধুভাষার সঙ্গে ঠিক জুৎসই লাগসই হয় না, ফিট্ করে না। এখন সে অসুবিধা ঘুচেছে। (ঢাকা মেট্রপলিস হতে চললো—সেখানকার লেখকরা যদি সাধুভাষাতে প্রাণরস সঞ্চার করতে পারেন তবে সেও নবীন পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হবে)।

কিন্তু এহ বাহ্য।

অবধূতের আনাগোনা বাঙলাদেশের বাইরেও বটে। বক্ষ্যমাণ 'নীলকণ্ঠে' যাদের সঙ্গে আমাদের ভবঘুরে প্রতিনিয়ত কথা বলছেন তারা বাঙালী নয়, অথচ বাঙলার মারফতেই তাদের চরিত্র convincing করতে হবে। সে আরও কঠিন কর্ম। কিন্তু লেখক যে রকম গোড়ার 'মজুমদার' 'রায় সায়েবের "ঘোড়ার" পিঠে চড়া,' 'সুবাসী দিদি' কলকাত্তাইদের ফুটিয়ে তুলেছেন, ঠিক তেমনি অবাঙালী 'অমরনাথ' 'জুলিমেম' এবং আরো গণ্ডায় গণ্ডায়। ভাষা করায়ত্ত থাকলে হাতীকেও বাঙলা বলানো যায়!

* * *

অবধূতের প্রতিটি গ্রন্থ পড়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এ-লোকটি কিসের সন্ধানে দুনিয়াটা চষে বেড়ায়? তার পায়ে চক্কর আছে সে তো বুঝি, এবং বলা উচিত কিনা জানিনে—তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হয়ে খবরটা পেয়েছি—যে, তিনি তন্ত্রে বিশ্বাস

করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে যে তাঁর গভীর জ্ঞান আছে সে-তত্ত্ব আবিষ্কার করতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। কিন্তু তান্ত্রিক একবার পথ পেয়ে গেলে তো ঘুরে বেড়ায় না! গ্যোটে বলেছেন, চরিত্রবল বাড়াতে হলে জনসমাজে যাও; জিনিয়াসের সাধনা করতে হলে নির্জনে, একাগ্র মনে। আমার মনে তখনই প্রশ্ন জেগেছে, 'আর যারা সাধু সন্ন্যাসীর পিছনে পিছনে ঘোরে?' বরদার মহারাজ আমাকে বলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সঙ্গে কাজ করার সময় প্রতি শনিবারের সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল অবধি সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে নর্মদার পারে পারে (হিমালয়ের পরেই নাকি সেখানে ওঁদের পরিক্রমা-ভূমি) ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ পেয়েও ছিলেন। সেই সন্ন্যাসীর করুণ কাহিনী পাঠক উপেন বাঁড়ুয্যের অদ্বিতীয় পুস্তক 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় পাবেন। এঁকে আনা হয়েছিল বারীন-উল্লাস-উপেনদের চরিত্রবল গড়ে দেবার জন্য। কিছুদিন এঁদের সঙ্গে থাকার পর ইনি প্রত্যেককে সনির্বন্ধ অনুনয়-বিনয় করেন, বিপ্লবীদের ভয়াবহ পন্থা পরিত্যাগ করতে। এঁরা যখন কিছুতেই সম্মত হলেন না তখন তিনি, সেই মুক্ত পুরুষ, শব্দার্থে সজল নয়নে বাগান-বাড়ি ছেড়ে চলে যান। যাবার সময় অতিশয় দুঃখের সঙ্গে যে ভবিষ্যৎবাণী করে যান সেটা আন্দামানে অক্ষরে অক্ষরে ফলে।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, কিন্তু কেমন যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না, অবধূত খুব সম্ভব এরকম একটি লোকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বা ঘুরে মরছেন। বিবেকানন্দ এ রকম লোক পান নি—বরঞ্চ অন্যেরা, তিনি কিছু পেয়েছেন কিনা, তার সন্ধানে লেগে যেত—এবং রামকৃষ্ণ মুক্ত পুরুষ হলেও এ ধরনের লোক নন। তিনি তো সর্বত্রই লোক-চক্ষুর সম্মুখে বিরাজিত। তাঁর সন্ধানে বেরুনো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে তো আমাদের কাজ চলে না। তিনি জীবন্মুক্ত। ছেলে বেলা থেকেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। আমরা খুঁজি এমন একজন, যিনি পঞ্চাশবার ফেল মারার পর ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। আমরা ফেল

করেছি আড়াই শ' বার। তিনিই বুঝবেন আমাদের বেদনাটা কোন্ খানে। যে সাধক সাধনার পথে খানা-খন্দে পড়ে হাড়-হাড্ডী গুঁড়িয়েছেন তিনিই তো শুধু আমাদের 'খবরদার! হাফিজ্!' চিৎকার করে আগে-ভাগে হুঁশিয়ার করতে পারেন।

কিন্তু কেন এই না-হক্ক মা নু ষে' র সন্ধানে হায়রানী?

উত্তরে সর্বদেশের, সর্বযুগের গুণীজ্ঞানী মানী অভিমানী তত্ত্ববিদের সেরা বলেন, ভগবানের মহত্তম সৃষ্টি মানুষ, অতএব মানুষের সন্ধানে বেরুতে হয়। চণ্ডীদাসও বলেছেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। উত্তম প্রস্তাব। অবধূতও বলছেন, এই বক্ষ্যমাণ 'নীলকণ্ঠেই'—'হিমালয়ের পথ ঘাট মঠ মন্দির নিয়ে বিস্তর লেখা হয়ে গেছে। সেই সব গ্রন্থ পাঠ করলে হিমালয় সম্বন্ধে জানতে বাকী থাকে না কিছুই। সুতরাং আর একবার হিমালয়ের পরিচয় দিয়ে লাভ কি! তার চেয়ে হিমালয়ের মানুষদের সম্বন্ধে কিছু বলে নি আমি। অনেকের কাছে হিমালয়ের সব থেকে বড় আকর্ষণ হিমালয়বাসী সন্ন্যাসীরা। আমি চেষ্টা করছি এই সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে কিছু জানাতে। (কারণ) অনেকের কাছে সন্ন্যাসীরা পরম পবিত্র রহস্যময় জীববিশেষ।' [৩] (এর পর অবধূত আরো তিনটি শব্দ দিয়ে একটি বাক্য রচনা করে মনে মনে প্রশ্ন শুধিয়েছেন, বা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কিংবা উভয়ই, কিন্তু সে-প্রশ্ন, সে বিস্ময় নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর মত ভাষার জউরী প্রথম যে

৩ শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবধূত সাতিশয় শ্রদ্ধা করেন, এ-কথা আমরা জানি কিন্তু খনে বিশ্বাসী, খনে agnostic, খনে nihilist, খনে কি, খনে কি না—মা কালীই জানেন—এই লোকটির ধোঁকা যায় না, ঠাকুরের সর্বনীতি বাবদে। বলছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "সব মতই মত সব পথই পথ।" বিদুর বাবার পথটা কি জাতের পথ তা আমি দেখেছি। ও-পথে ভগবানকে পাওয়া যায় না, শয়তানকে পাওয়া যেতে পারে।' "নীলকণ্ঠ" পৃ ১৬৯।৭০।

একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন ঐ দিয়েই তিনি কর্ম সমাধান করতে পারতেন, অথচ কেদার বদ্রীর পথে গঙ্গা যমুনার এমনই হুহুঙ্কার যে নিদেন তিনটি বার চিৎকার না করলে মানুষ নিজের গলা নিজেই শুনতে পায় না)।

ফার্সীতে একটি দোঁহা আছে :

'কুনদ্ হম্-জিন্স্ ব্ হম্ পর্ওয়াজ্,
কবূতর ব্ কবূতর বাজ্ ব্ বাজ্।'

'The same with same shall take its flight
The dove with dove and kite with kite'

'স্বজাতির সনে স্বজাতি উড়িবে মিলিত হয়ে
পায়রার সাথে পায়রা, শিকরে শিকরে লয়ে।'

অতএব হিমালয়ের হোক বা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থলেরই হোক, সাধু-সন্ন্যাসীদের চিনতে হলে তাঁদেরই একজন হতে হয়। অবধূত এ বাবদে তাঁর একাধিক গ্রন্থে এ তত্ত্বটির উল্লেখ করেছেন। এই সর্বজনীন গণতন্ত্র আমাকেও আনন্দ দেয়। লণ্ডনের এক প্রাতঃস্মরণীয়া সমাজসংস্কারিকা নারী যখন দেখলেন যে, পতিতাদের জন্য তিনি কোনো সেবাই করে উঠতে পারছেন না, তখন তিনি তাদেরই সমাজে প্রবেশ করলেন (আশা করি কেউ অন্যায় সন্দেহ করবেন না, যে আমি সাধুসন্ন্যাসী, পীর-দরবেশ ও পতিতাদের এক পর্যায়ে ফেলছি! এই অধমের পরিবারের মাত্র শতবর্ষ পূর্বেও রীতি ছিল যে সর্ব কনিষ্ঠকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনে চলে যেতে হত)। মহিলাটি শেষ পর্যন্ত সেখানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর সে-সমাজ ত্যাগ করে যে গ্রন্থ রচনা করেন সেটি অতুলনীয়, অমূল্য।

অবধূত মৌনব্রত, অজগরব্রত, পনছীব্রত[৪] সবই করলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যামো সঠিক চিনতে পারলেন প্রজ্ঞানাথ। সার্থক তাঁর নাম।

প্রজ্ঞাবলে ব'লে দিলেন 'তোমার পথ আলাদা। হয় তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে নয়ত ছুটে বেড়াবে।' আর যোগাভ্যাস বাবদে বললেন 'তোমার জন্য ঐ নাক-টেপাটেপি নয়, তোমার ধাতে সইবে না। দূর ছাই বলে ফেলে দিয়ে আবার ছুটে বেড়াবে।'

সেই ভালো। নইলে তাঁর অবস্থা বিশ্বকবি বর্ণিত 'ঘোড়া'র মত হয়ে যেত। 'অন্য সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শখ। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পর "না" হয়ে যাবে।'

'না' হয়ে গেলে (নত্বং, নাহং, নায়ং লোকঃ!) 'নীলকণ্ঠ' লিখত কে!

কিন্তু আমরা ভুল করছি না তো?

স্পষ্ট দেখতে পারছি তিনটি 'অবধূত'। যে-অবধূতকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি, যে-অবধূত বই লেখেন এবং যে অবধূত লাট্টুর মত চক্কর খায়। তিন জনাই কি একই ব্যক্তি? নিশ্চয়ই নয়। অন্তত তৃতীয় অবধূতকে দ্বিতীয় অবধূতের সঙ্গে গোবলেট করলে দুজনারই প্রতি ডাহা অবিচার করা হবে। বহু সার্থক লেখক প্রথম পুরুষে রসসৃষ্টি করেছেন; তাই বলে কি লেখক ও তাঁর 'আমি' চরিত্র একই ব্যক্তি? ডি ফো আর রবিনসন, সুইফ্‌ট আর গালিভার কি একই ব্যক্তি? এমন কি এই

---

৪ অজগর আহার সংগ্রহের জন্য কোনো প্রচেষ্টাই করে না—এর বিরুদ্ধ [illegible]বাদ আমি দক্ষিণ ভারতে শুনেছি। একাধিক গুণী বলেন, সে নাকি বড় [illegible]ুর শিষ দিয়ে পশুশাবক, এমন কি অত্যধিক কৌতূহলী বালকবালিকাকে [illegible]াকর্ষণ করতে পারে।

নীলকণ্ঠেই তিনি যে একাধিকবার আত্মচিন্তা করতে করতে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন সে পরিচয়ের সঙ্গে লেখক অবধূতের কি সব সময় মিল আছে ?

বিশেষ করে আমি একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ফার্সী অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে—সার্থক রস-সৃষ্টি করতে হলে চাই 'শনাখ্‌তন্‌-ই-হদ্দ-হর্‌-চীজ্‌।' অর্থাৎ সনাক্ত করতে পারা (শনাখ্‌তন্‌) প্রত্যেক বস্তুর (হর্‌চীজ) সীমা (হদ্দ)।'[৫] তার বিগলিতার্থ; প্রচণ্ডতম আত্মসংযম। বার বার ভুলে যাই আমরা 'সব কিছু বলতে গেলে কিছুই বলা হয় না' বার বার প্রলোভন[৬] আসে, আরো একটু খানি বলে নি, তা হলে কেচ্ছাটার আরো জেল্লাই বাড়বে। শৈলী ভাষা বাবদে পার্ফেক্ট্ আর্টিস্ট হাইনে পর্যন্ত প্রথম যৌবনে এ-প্রলোভন থেকে মুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর গুরু, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, আলঙ্কারিক বারন (ব্যারন্‌) ফন্‌ শ্লেগেলের কাছে তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছ নিয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন 'এ কি ! তোমার বল্লভার গালে অতগুলো তিল দিয়েছ কেন ?' হায়, আমরা বার বার 'হদ্দ সনাক্ত' করতে পারিনে, ভাবি তিল যখন সৌন্দর্য বৃদ্ধি[৭] করে তখন এঁকে দিই মানস-সুন্দরীর গণ্ডদেশে গণ্ডাদশেক তিল !

৫ 'রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা করে তবে নিষ্কৃতি পায়।' রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ২৮৪। পুনরায়, 'প্রাণের ধর্ম সুমিতি, আর্টের ধর্মও তাই।' সমপুস্তক, পৃ ২৬০।

৬ 'লোভ পরিমিতিকে লঙ্ঘন করে, আপন আতিশয্যের সীমা দেখতে পায় না।' পৃ ২৬০।

৭ হে শিরাজী, হে সুন্দরী, তব কপোলের ঐ ক্ষুদ্র তিল লাগি
হে তরুণী সাকী বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি।
এমনই হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি

পূর্বে লিখিত কোনো কোনো অনবদ্য গ্রন্থেও অবধূত মাঝে মধ্যে ভুলে যেতেন 'স্টপ্ ঈটিং হোয়াইল ইট্ ইজ্ টেস্টিং!—অর্থাৎ খাঁটি বাঙালীর কৃত্রিম 'উচ্ছ্বাস' থেকে তিনি সব সময় নিজকে মুক্ত রাখতে পারেন নি—বস্তুত তাঁর সব চেয়ে মশ্‌হূর কেতাবেই সবচেয়ে বেশী চন্দ্রশেখরীয় 'উদ্‌ভ্রান্ত' উচ্ছ্বাস—কিন্তু 'নীলকণ্ঠে' তিনি যে পার্ফেক্ট্ ক্যাডেন্স্ অব্ রেস্ট্রেন্ট্ দেখিয়েছেন সেটি আজকের দিনের কোনো বাঙালী লেখকই দেখাতে পারবেন না। এবং এই 'হদ্দ সনাক্ত করাটা' তিনি 'নীলকণ্ঠে' করেছেন অবহেলে, অক্লেশে। যেন ভানুমতী কড়ে আঙুল দিয়ে লৌহ ত্রিপিটক অদৃশ্য করে দিলেন—ছাতি না ফুলিয়ে, মাস্‌ল্ না বাগিয়ে, ঘেমে নেয়ে কাঁই না হয়ে। এই এফর্টলেসনেস পৃথিবীর সর্বকর্মক্ষেত্রেই চরমতম কাম্য।

হেঁটমুণ্ডে শূন্যে ঝুলে আছেন যোগীবর, আরেক উলঙ্গ যোগী গড়াগড়ি দিচ্ছেন বরফের উপর, নায়ক স্বয়ং পেরিয়ে গেলেন মারাত্মক ধ্বস্, তারপর সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত—পাঠক সর্বক্ষণ শুধোচ্ছে কি করে হল, তার পর কি হল? 'নো রিপ্লাই? সে কি মিসি বাবা!' এমন কি কলির কেষ্ট ঠাকুর—'অ! কন্ কি কর্‌তা? আমাগো লাঙ্গুল-বারিয়ায় ঢিতেন সাধুর নামডাও শোনেন নাই কানে—পোরাকপাল—' রসমতী যশোমতী গুজরাতী (জাতে 'পরেখ'—বাঙলা 'পরখ', পরশ-পাথর থেকে—ঠিক পরখ করে চিনে নিয়েছে সচ্চা মাল) ফরাসীতে যাদের বলে 'ভোয়াইওর' এস্থলে 'মাজোকিস্ট ভোয়াইওর—[৮]একমাত্র

[৮] সব দেশেই এক রকম লোক আছে যারা পাপাচারের, এমন কি অনৈসর্গিক পাপাচারের নিষ্ক্রিয় 'দর্শক' রূপে আপন কাম চরিতার্থ করে। ফরাসীতে 'দেখা'='ভোয়ার', 'দর্শক'='ভোয়াইওর'—(আমরা 'দৃশ্' থেকে 'দ্রষ্টা' ইংরেজ 'to see থেকে 'Seer', 'ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা' মুনি ঋষির জন্য ব্যবহার করি, ফরাসীতেও সে রকম 'ভোয়ার' থেকে 'ভোয়াইওর' সদর্থে ব্যবহার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয়নি—সেখানে 'voyant'='ভূতভবিষ্যৎ দ্রষ্টা' এবং clairvoyant='clear-seer' সমাসটিও আমরা চিনি। ফরাসী ভাষার

প্যারিসেই যাঁরা অজ্ঞাতবাসে ঘাপটি মেরে থাকেন, তাঁদেরই এক মহাপ্রভু দৈবযোগে হয়ে গেছেন নীলকণ্ঠে এসে মঠের মোহান্ত—ইনিই তাহলে নীলকণ্ঠের নীল গরল—এবং গণ্ডায় গণ্ডায় কত সাধু কত চোট্টা কত সাধারণ জন, কত মাছি কত পিস্সু। আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে স্পর্শ করেছে কেদারনাথ দর্শনাভিলাষিনী পুণ্যশীলা মেম সায়েব জুলি আর তার স্বামী এন্ড্রেন্। আমি হিন্দু নই, কেদারবদ্রী দর্শন করলে আমার অশেষ পুণ্য হবে, এ-ফতোয়া আমার তরে নয়, কিন্তু মনে করুন, আমি যদি কেদার যাবার জন্য স্বপ্নাদেশ পাই, আর ত্রিযুগী-নারায়ণ পেরিয়ে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছন মাত্রই ঝাড়া তিন দিন ধরে চলে ঝড়, বজ্রপাত—তাঁবু পর্যন্ত উড়ে চলে যায়—'হাজার হাজার দৈত্য রে-রে করে চতুর্দিক থেকে ছুটে আসছে যেন—কী! 'বিধর্মী চলেছে মহামহিম (লর্ড)[১] কেদারনাথকে দর্শন করতে, এতখানি স্পর্ধা বুঝি

বাঙালী পড়ুয়া যেন হুম্ করে কোনো ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহাজনকে 'ভোয়াইওর' না বলে বসে! 'Romain Rolland, Oh, c'est un grand voyeur !' ব'লে এক গুজরাতী নিরীহ সজ্জন প্যারিসের ফরাসী সমাজকে প্রথমটায় স্তম্ভিত করে দেন; পরে তারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ঠাঠা করে অট্টহাস্য তোলেন) এবং এই সম্প্রদায়ের কামনা—শব্দার্থে—পূর্ণ করার জন্য প্যারিসের 'অন্ধকার' অংশে প্রচুর প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু টিকিট এতই আক্রা যে অধীন সরজমিনে তদন্ত করতে পারেনি। এদের অন্যতম প্রোগ্রামে একজন আরেক জনকে বেধড়ক চাবুকও কষায়, পেরেকওলা জুতো দিয়ে লাথি মারে, এবং নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা দেয়। এর গাহককে 'মাজোকি সই ভোয়াইওর' বলা হয় এবং একদা আরব ছোঁড়ারা প্রোগ্রামে প্রধান অংশ নিত বলে—হয়তো—'ভোয়াইয়ু' শব্দের অর্থ—'স্ট্রীট আরব'।

১ 'লর্ড' কেদারনাথ সম্বন্ধে আমার এক মুখুজ্যে ভাতিজাও লেখে 'ঠাকুর দেখতে তেমন কিছু না; কিন্তু সন্ধেবেলায় যখন ডিনারের ইভনিং জ্যাকেটটি পরেন তখন বড্ডই মাইডিয়ার দেখায়।' তবে কেদার না হয়ে ইনি পথমধ্যে অন্য কোনো 'লর্ড'ও হতে পারেন।

নীলকণ্ঠের সহ্য হচ্ছে না'—এবং সর্বশেষে 'বিরাট এক ধ্বস নেমে কেদারনাথের তিন মাইল আগের রামওয়াড়া চটি লোপাট করে নিয়ে গিয়েছে'—তখন আমার মনের অবস্থা কি হয়! বেচারী বিদেশিনী যবনী মেম সায়েব জুলির জীবনে এই দুর্দৈবই ঘটেছিল। একেবারে মুষড়ে গিয়ে ভেঙে পড়ে—স্বামীকে বললে, 'চলো ফিরে যাই।' তার স্বামী অবধূতকে বলছেন, 'জুলি মনে করছে, লর্ড কেদারনাথকে দর্শন করতে হলে যতটা পবিত্র হওয়া উচিত, ততটা পবিত্র আমি (স্বামী) নই।'

কেদার-বদ্রীগামীর কাফেলা তো চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছেই—তার এবং মানসাদি বহু তীর্থ-যাত্রীর বর্ণনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিয়েছেন 'নীলকণ্ঠে'র বহু বহু পূর্বেই বিস্তর 'জরীন-কলম' বাঙালী, ইংরেজি, জর্মন, ইতালিয়ান ইত্যাদি লেখক আপন আপন মাতৃভাষায়—কিন্তু নীলকণ্ঠে চলেছে অবধূতের বাছাই করা আরেকটি চরিত্রের কাফেলা, হেঁটমুণ্ড সাধক, যশোমতী, মেম সায়েব যাদের কয়েকজনের উল্লেখ এইমাত্র করেছি কিন্তু হায়, অবধূত, রসসৃষ্টিতে 'হদ্দ' কোথায় সেটা 'সনাক্ত' করে ফেলেছেন এবং আমাদের কৌতূহল যখন চরমে পৌঁছয়, আমরা কলরব তুলে শুধোই, 'এটা কি করে হল? তার পর কি হল' তখন তিনি মৃদুহাস্য করে স্টপ্‌স্ ঈটিং বিকজ ইট ইজ টেস্টিং। মাথা চাপড়ে বলতে ইচ্ছে করে 'পোড়া কপাল আমাগো। লাঙ্গলবারিয়ার হীতেন সাধুর লগে লগে আর বেবাকগুলির নামডাক ভী ভালা কইরা বুজাইয়া কইলা না, কর্‌তা!'

কটাক্ষ করা এ-পাঠকের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, কবিগুরু কি ক্লেরভইয়াঁসের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে তাঁর পরিনির্বাণের স্বল্পকাল মধ্যেই এই গৌড় ভূমিতে তিন-তিন হাজারী পাঁচ-পাঁচ হাজারী পাতার মনসব নিয়ে পিল পিল করে বেরুবেন উপন্যাসের আমীর-ওমারহ—কেতাব নয়, পুঁথি নয়, আস্ত এক একখানা ইঁটের থান, না, তারই পাঁজা হাতে নিয়ে—এবং এদেরই উদ্দেশ্যে

বলেছিলেন 'মানবের প্রাণের লয়টাকে দানবের লয়ে.সাধনা করা চলবে। কিছুতেই তাল পোঁচচ্ছে না শমে।'[১০] অবধূত সমে পৌঁছতে জানেন। তিনি নিজেই এক জায়গায় আধারহস্য ছলে বলেছেন—কারণ সোজাসুজি ধর্মোপদেশ তিনি দেন না, নীতিও প্রচার করেন না—'সাক্ষাৎ অমৃত কি না! খাঁটি অমৃত কি আর তাড়ির মত ভাঁড় ভাঁড় খেতে হয়?' কারণ এর হদীস্-সবূৎ রয়েছে তাঁর, আমার, আপনার গুরু রচিত, পাতঞ্জলের যোগসূত্রের ন্যায় সাহিত্যের সূত্রাবলীতে: 'উপকরণের বাহাদুরি তার বহুলতায়, অমৃতের সার্থকতা তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে। আর্টেরও অমৃত আপন সুপরিমিত সামঞ্জস্য।'[১১] এ তত্ত্বটি বুঝে নিলে অবধূতের বাক্‌সংযম পাঠককে গভীরতর আনন্দ দেবে—আপনা কল্পনাজাল বোনার পথ দেখিয়ে দেবে।

এ-বাবদে শেষ প্রশ্ন: নীলকণ্ঠে তথাকথিত অলৌকিক কারখানা, ধর্মের নামে নিকৃষ্টতম পাপাচার, লাঙ্গলবারিয়ার জীতেন সাধুর পন্থা, 'মাজোকিস্ট ভোয়াইওর' বিহুর বাবার পন্থা—পাতার পর পাতায় প্রাচীন নবীন একটার পর আরেকটা সমস্যা যেন পাণ্ডোরার কৌটো থেকে বেরিয়ে—ঐ কালীকমলী-চটির বেশুমার ছারপোকারই মত—চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং সর্বাপেক্ষা মহামোক্ষম সমস্যা যেটি স্বয়ং অবধূতই তুলেছেন তিনটি শব্দ দিয়ে, যদ্যপি একটিই যথেষ্ট হত (তাজ্জব মানতে হয়, লোকটা কী সরল, কী 'নাইফ' এরকম সিংহের গহ্বরে মাথা গলায়!) এবং যার উল্লেখ আমি পূর্বেই করেছি সেটি আবার বলি—শোনা জিনিসই মানুষ ফের শুনতে চায়—'অনেকের কাছে সন্ন্যাসীরা হলেন পরম পবিত্র র হ স্য ম য় জীববিশেষ!' তার পর বলছেন, 'সত্যিই কি তাই!' (তিনি অনায়াসে প্রথম শব্দটি মাত্র দিয়ে, তাও শেষের 'ই'টি খারিজ করে দিয়ে লিখতে পারতেন, 'সত্যি!'—

---

১০ ১১ রবীন্দ্রনাথ, সমগ্রন্থ।

কারণ ফার্সীতে বলে 'দানিশমন্দ্‌রা এক হরফ্‌ ব্যস আস্ত্‌—'বুদ্ধিমানের জন্য একটিমাত্র হরফই যথেষ্ট—সমূচালফ্‌জ্‌ [লক্তো] তকফাজিল-ফজুল—বস্‌—এস্তের।' কিন্তু আমার মত অগা পাঠকও এস্তের। আমার মাথায় নিদেন তিনটে শব্দের তিনটে ডাণ্ডশ মারলে তবে কিনা একটা শব্দ মগজে সিঁধিয়ে ঘিলুর ঘিয়ে ভাজা হয়)।

সে-প্রশ্নের উত্তর? সে-সমস্যার সমাধান? এবং বাদবাকিগুলো?

এবার আর 'ফোনের মিসিবাবা' না—এবারে উচ্চতর পর্যায়ে যাই। বিচারপতি পন্টিয়ুস্‌ পিলাটুসের (জেস্ট্রিং পাইলট') সওয়ালে খৃষ্ট যখন বললেন 'আমি এসেছি স ত্য প্রতিষ্ঠিত করতে!' তখন পিলাটুস্‌ শুধোলেন 'সত্য কি?' হোয়াট ইজ ট্রুৎ? এবং খৃষ্ট কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই (উত্তর পাবেন কি না তার প্রতীক্ষা না করেই) কেউ কেউ বলেন, স্মিতহাস্য করে বিচারালয় ত্যাগ করলেন।[১২]

এখানেও তাই। অবধূত শুধোচ্ছেন বা/এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বলছেন, 'সত্যি?' এবং ঐখানেই দিলেন খতম করে! কিংবা মুলতুবী—'সিনে ডাইই'। কেন?

১২ আসলে পিলাটুস উচ্চশিক্ষিত খানদানী রোমবাসী, ইংরেজ ভাইসরয়দের মত· পরাধীন ইহুদিদের উপর শাসন করতে এসেছেন জেরুজালেমে। তাবৎ গ্রীকদর্শন তাঁর নখাগ্রদর্শনে এবং সোক্রাতেস যখন প্রশ্নে প্রশ্নে তথাকথিত পণ্ডিতজনকে না-জবাব করে দিতেন এবং পণ্ডিত শেষটায় বিভ্রান্ত হয়ে শুধোতো 'তা হলে তুমিই বলো "সত্য কি?"—সোক্রাতেস তখন মৃদুহাস্য করে চলে যেতেন বা বলতেন 'আম্মো জানিনে।' এ-সব তত্ত্ব পিলাটুস জানতেন, এবং আরো ভালো করেই জানতেন, ইহুদিদের ভিতর দর্শনের কোনো চর্চা নেই। তাই 'সত্য'-এর স্বরূপ নির্ণয় তিনি রাসটিক, সরল-বিশ্বাসী খৃষ্টের কাছ থেকে চাননি।

আবার তা হলে গুরুপদপ্রান্তে বসি। তিনি প্রব্লেম ও তস্য 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ', আকছারই দম্ভে প্রকম্পিত সলুশন্‌-বিজড়িত কাব্য-উপন্যাসাদি সম্বন্ধে বলছেন, 'মেঘদূত কাব্য থেকে একটা তত্ত্ব বের করা যেতে পারে, আমিও এমন কাজ করেছি, কিন্তু সে তত্ত্ব অদৃশ্য ভাবে গৌণ।...কাব্য হিসাবে কুমারসম্ভবের যেখানে থামা উচিত সেখানেই ও থেমে গেছে, কিন্তু লজিক হিসাবে প্রব্লেম হিসাবে (আমার সমস্যা হিসাবে) ওখানে থামা চলে না। কার্তিক জন্মগ্রহণের পর স্বর্গ উদ্ধার করলে তবেই প্রব্লেমের শান্তি হয়। কিন্তু আর্টে দরকার নেই প্রব্লেমকে ঠাণ্ডা করা, নিজের রূপটিকেই সম্পূর্ণ করা তার কাজ। প্রব্লেমের গ্রন্থিমোচন ইন্‌টেলেক্‌টের বাহাদুরি, কিন্তু রূপ-কে সম্পূর্ণতা দেওয়া সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনার কাজ। আর্ট্‌ এই কল্পনার এলেকায় থাকে, লজিকের এলেকায় নয়'।[১৩] অবধূত এ তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। নীলকণ্ঠ তার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন।

* * *

উত্তম গ্রন্থের চুম্বক দেওয়া, বিশ্লেষণ করা, 'তুলনাত্মক সাহিত্যের' দৃষ্টিবিন্দু থেকে তাকে ঐ 'জাঁর'-এর আর পাঁচখানা বইয়ের সঙ্গে তুলনা করা নিষ্প্রয়োজন ; পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় মাত্র। কিন্তু সে-পরিচয় দেওয়ার সময়ও লেখক—অবধূতের সর্বকালীন ও আমার জানা মতে তাঁর সর্বাগ্রগণ্য গুণমুগ্ধ পাঠক হিসেবে—এ-পরিচিতি দেবার হক্ক আমার একান্ত, অত্যন্ত সেই কারণেই—অধমের মনে ধোঁকা লাগে, মিছরির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তার সুতোটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি না তো ? কে জানে, আমি যে-সূত্রটি ধরে এ-

১৩ পুনরায় 'ইব্‌সেনের নাটকগুলি তো একদিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনই কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি।' 'সাহিত্যের মাত্রা'। সমগ্রন্থ পৃ ২৬০।

পরিচিতি পেশ করেছি সেটা অতি অবশ্য সূত্র বটে, কিন্তু হয়তো ঐ মিছরির সূতো র-ই মত! সূতো চিবিয়ে তো কোনো পাঠক মিছরির রস পাবেন না! সান্ত্বনা এইটুকু যে, বহুশত বৎসর ধরে অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকমণ্ডলী কালিদাসের পরিচিতি দিতে গিয়ে লিখেছেন—এবং সেটিকে অজরামর করার হেতু গদ্যে প্রকাশ না করে শ্লোকাংশে বেঁধেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। তাঁদের মতে অমুকের কাছে যাও 'পদলালিত্যের' জন্য, অমুকের কাছে যাও 'অর্থগৌরবের' তরে—আর কালিদাস?—ওঃ! তার 'উপমাটি' উত্তম; এবং তাঁদের শেষ সুচিন্তিত আপ্তবাক্য, সর্বগুণসম্পন্ন কবি কিন্তু মাঘ! আজ আমরা জানি, সুদ্ধমাত্র তুলনার বাহাত্বরী দেখিয়ে কেউ মহৎ কবি হতে পারেন না—উত্তম তুলনা দিতে পারার গুণটি অলঙ্কারশাস্ত্রপেটিকাসঞ্চিত একটি নিরাড়ম্বর অলঙ্কার মাত্রই, এবং এ সাদামাটা তুলনা-অলঙ্কারের কথা দূরে থাক সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার পরিয়েও কুরূপাকে সুরূপাতে পরিবর্তিত করা যায় না—কালিদাস ছিলেন সর্বগুণসম্পন্ন অলঙ্কারাতীত বিশ্বকর্মা, তুলনা-নির্মাণে দক্ষতা ছিল তাঁর সামান্যতম কৃতিত্ব।...তাই এ-স্থলে আমি যে পরিচিতি দিলুম সেটা হয়তো কালিদাসের বেলায় গোড়াতে যে-রকম হয়েছিল সেই রকম নিতান্তই আত্যন্তিক, ঐকান্তিক, অবান্তর, গুরুত্বহীন পরিচয়। কিন্তু ভরসা রাখি, কালিদাসের মত বিশ্বকর্মা না হয়েও অবধূত ভবিষ্যতে একদিন কালিদাসের মত সুবিচার পাবেন, কারণ, ন্যায়াধীশ-মহাকালের সম্মুখে সবাই সমান।

মহাকালের দরবারে কালিদাস অবধূত বরাবর—একথাটা আমাকে পুনরায় বলতে হল। কারণ আমি জানি, একাধিক জন, এমন কি অবধূতের গুণী গাহকও ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করে শুধোবেন, আমি যে এক নিশ্বাসে চেখফ্, কালিদাস ইত্যাদি প্রাতঃস্মরণীয়দের সঙ্গে অবধূতের নামোচ্চারণ করি তার অর্থ কি এই, যে, আমার মতে এঁরা সবাই সম গোত্রের! এর উত্তরে যে-কোনো অন্য দিনের চোদ্দ ক্যারেটের আলঙ্কারিক, যে-কোনো বট-তলার চতুরানন চতুর্-আনী মোক্তার

চতুর্মুখে চতুর্ভদ্র সাফাই গাইতে পারবেন কিন্তু আমার এসবেতে কোনো প্রয়োজন নেই। অধীনের নাক-বরাবর অতিশয় সুচিন্তিত তথা অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত নিবেদন মাত্র একটি: অবধূত কেন, তাঁর চেয়ে শতগুণে নিরেস কোনো কবিকেও যদি আজ অধিক পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এবং প্রয়োজন-অনুরোধে তৃতীয় পক্ষের দোহাই কেটে তাঁকে/তাঁদেরকে আবাহন জানাতে হয়, তবে কি আমি বে-ওকুফ নাদানের মত স্মরণ করবো পাড়ার আকাট যেদো-মেদোকে? না, গঙ্গাস্বরূপা তৃতীয়া কন্যা মাতা কুন্তীদেবীর অনুকরণে স্মরণ করবো ধর্মরাজ, পবনেশ্বর, বাসবাধিপতিকে? কালিদাস, চেখফ, রবিকবিকে? —না, বিবাহ বাসরের 'প্রীতি-উপহার'-রচক পোয়েট লরিয়েটকে, দাস্যমনোবৃত্তি-সঞ্জাত অধুনাবিষ্কৃত ভি. আই. পি কুলের চরম পদলেহনাবতার ভি. আই. পি'র ঘোষ-'কবিকে'? অবশ্য, অতি অবশ্য, যদি অবধূত মহাকালের মোকাদ্দমা হেরে যান (যদ্যপি আমার বিশ্বাস ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্রকে সাক্ষীরূপে না ডেকে যেদো-মেদোকে ডাকলে মক্কেল অবধূত মোকদ্দমা তো হারবেনই, এস্তক সুপ্রীম কোর্টে আপিল করবার তরে সার্টিফিকেট অবধি পাবেন না।) তবে সম্পূর্ণ দোষ আমারই। আমি যে-কেস হাতে নিয়েছি সেটি মর্মান্তিক। কারণ অবধূত আমাকে বাঙলা সাহিত্যের হট্টগোলের মাঝখানে তাঁর নাম সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করার জন্যে মোক্তার পাকড়াননি। বস্তুত আমিই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, আপন খুদ, খুশ-এখতেয়ারে, অবধূতের সত্য মূল্য নিরূপণার্থে, সাহিত্য আদালতের 'নিরপেক্ষ-বন্ধু,' 'আমিকুস্ কুরিআএ্যা'রূপে অবতীর্ণ হয়েছি। সে-স্থলে হয়তো অবধূত বাধা দিতে পারতেন কিন্তু তিনি এবাবদে সুবুদ্ধিমান বলে সাহিত্যিক, দেওয়ানী, ফৌজদারী সর্ব আদালৎ এড়িয়ে চলেন। এটি 'এক্সপার্টি', এক-তরফা মোকদ্দমা।

কিন্তু আদালতের তুলনাটা কথায় কথায় উঠলো। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ,' রবিকবির 'যোগাযোগ' কোনো আদালৎ বিচার করবে

না। নীলকণ্ঠও কোনো এজলাসের সম্মুখে দাঁড়াবেন না।[১৪] সাহিত্যে সর্বকালের সর্বজনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক পাঠক স্বয়ং। 'আদালতের' বাইরে আমিও নগণ্য পাঠক। সে কিরে আমি এ-প্রস্তাবনার প্রস্তাবনাতেই একাধিকার বার কেটেছি। এবং আমি অতিবৃদ্ধ পাঠক বলে একাধিক নবীন পাঠক আমাকে শুধোবে,

'নীলকণ্ঠ বইখানা ভালো ?'

'অত্যুত্তম।'

'সর্বোত্তম ?'

'এতাবৎ লিখিত বইয়ের মধ্যে সর্বোত্তম, কিন্তু এ-কেতাব সর্বোত্তম হবে না, যদি ইটি সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁকে অনুপ্রেরণা না জোগায় যে এটাকেও পেরিয়ে গিয়ে তিনি আরো উত্তম কেতাব লিখতে পারেন।'

*　　　*　　　*

এবারে শেষ কথা।

'চেনা বামুনের গলে পৈতে কেন মিছে ?'—ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। অবধূতের গলায় আমি আবার পৈতে পরাতে যাচ্ছি কেন—বিশেষত তিনি যখন উৎকৃষ্ট রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ? কিন্তু তিনি যে গেরুয়া পরেন, এবং যতদূর জানি, গেরুয়া পৈতে দুটো এক সঙ্গে পরা নিষিদ্ধ। তবু যে আমি নব-'পরিচিতির' এই পৈতেটি তাঁর দণ্ডে জড়িয়ে দিচ্ছি তার কারণ তিনি মায়াজালে বদ্ধ হয়ে কিছুদিন ধরে আমাদের সঙ্গে বাস করছেন—তিনি যা করুন, করুন—আমাদের

১৪ বছর কয়েক পূর্বে কিন্তু রসসমুদ্রে এ হেন একটা টর্নাডো-ম্যালস্ট্রোম হব-হচ্ছে হব-হচ্ছে'র পাঁয়তারা কষাছিল এমন সময় জানিনে কার হুকুমে শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। রীতিমত 'বিল' তৈরী হয়েছিল, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশসায়েব স্থির করে দেবেন, কোন্ নাটক উত্তম, অভিনয় করা যেতে পারে।

উচিত তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি-পরিচিতির পৈতেটি তাঁর সামনে নিবেদন করা। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লার কসম খেয়ে বলতে পারি, এ-পৈতেটিও ভস্ম করে তিনি একদিন অন্তর্ধান করবেন—নীলকণ্ঠের কণ্ঠে কিংবা ধূর্জটির জটায়। সেই পৈতেটি এই (এবং একমাত্র এই পৈতেটিই আমার চেনা এক নম্বরের অবধূত, দুই নম্বরের লেখক অবধূত ও তিন নম্বরের গ্রন্থের 'আমি' অবধূত তিনজনকেই এক সঙ্গে পরানো যায়):

তিন অবধূতেরই বোধ হয় সব চেয়ে প্রিয় শ্লোক

> ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
> কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

'ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা করার প্রবৃত্তি, কুল, শীল তথা জাতের বড়াই'—এসব থেকে মুক্ত হতে হবে। অত্যুত্তম প্রস্তাব। তাই 'নীলকণ্ঠে' দেখতে পাই, খেতে না পেয়েও তাঁর কষ্ট হচ্ছে না দেখে তিনি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছেন—সন্ন্যাসীবর ক্ষুধা জয় করে ফেলেছেন! —পরক্ষণেই আনগ্ন গাত্রে বরফে গড়াগড়ি দিলেও তাঁর শৈত্য বোধ হয় না দেখে তিনি তো সপ্তম স্বর্গে! নীলকণ্ঠের উচ্চতর স্তরে যে দুটি সাক্ষাৎ কৃতান্তদ্বয়, দারুণ অন্নাভাব ও নিদারুণ শৈত্য, এ দুটিই—নামে অবধূত এখন সিদ্ধিতে অবধূত—জয় করে ফেলেছেন! এবারে তিনি টেলিফোন খুঁজছেন, লর্ড কেদারনাথের সঙ্গে একটা রাঁদেভু স্থির করে তাঁর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করবেন বলে!

আর লজ্জা ঘৃণা ভয় ইত্যাদি সে তো অবধূত ক বে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে—পুস্তকে বিনয়বশত যা বলুক বলুক। আমি পুনরায় এক কোমর গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে পৈতে স্পর্শ করে পাঁচপীরের কসম খেতে রাজী আছি।

কিন্তু হায়, অবধূত এ-পৃথিবীতে এসেছেন অশুভক্ষণে। তাঁর নির্ঘণ্ট দীর্ঘ, তিনি কোন্ কোন্ পাশ হতে মুক্ত হতে চান, তিনি কোন্

কোন্ রিপু জয় করতে চান। অনেকগুলো জয় করতে করতে তো উঠছেন তিনি উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বতর লোকে—চিত্তলোক এবং ইহলোক উভয়েতেই—পৌঁছে গেছেন গরুড়চটি। সম্মুখে আর চড়াই নেই—কেদার ক্রোশমাত্র দূরে। অবধূত নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিলেন। কিন্তু, হা হতোস্মি সকালে দেখেন, একি! রাতারাতি হড়্হড়িয়ে নেবে গেছেন যাত্রারম্ভস্থল দেবপ্রয়াগে!·· ···আবার আরম্ভ হল নূতন করে রিপুজয় চিত্তজয় অজগর-পন্থা পক্ষী-পন্থা মারফৎ, আরোহণ করলেন না জানি আরো কত উচ্চ ভূমিতে। এবারে রাতারাতি হড়্হড়িয়ে চুঁচড়োয়—হ্যাঁ আমাদের এই চুঁচড়োয়!

কেন? কেন এ-দুর্দৈব?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—অবশ্য অবধূত এবং বাঙালী পাঠক আমার সঙ্গে একমত না হলে আমি বিস্মিত হব না—তিন অবধূতে একজোটে যে-সব পাশ ছিন্ন করার মৎলব নিয়ে সেগুলোর নিঘণ্টু নির্মাণ করেন তখন একটি পাশের কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন। সেটি কি?

ইংরিজিতে বলে milk of human kindness। দুঃখীর প্রতি দরদ, অপমানিতের প্রতি সহানুভূতি, অত্যাচারীর প্রতি প্রকাণ্ড আক্রোশ (এমনিতে অবধূত রাগের পাশে বাঁধা পড়েন না)—এক কথায় পীড়িত বঞ্চিত ধূলিলুণ্ঠিত জনের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁর বুক যেন বেদনাভরে, করুণাভারে ভেঙে পড়ে যেতে চায় (যে অবস্থায় পুব বাঙলার মেয়ে বলেছিল 'ইচ্ছা করে, হৃদয়ডারে, গামছা দিয়া বান্ধি'), কিন্তু থাক্, এটা গুছিয়ে বলবার মত ভাষা আমার নেই।

এই মিল্ক্ অব্ হিউমেন কাইণ্ডনেসের পাশ সম্বন্ধে না তিনি সচেতন, না তিনি তপস্যা করেন সেটা ছিন্ন করতে। তবে কি মুক্তপুরুষের হৃদয়ে আমাদের মত বদ্ধজনের প্রতি করুণাধারা প্রবাহিত হয় না? অবশ্যই হয়। লক্ষগুণে বেশী নয়। কিন্তু তার পূর্বে মুক্ত হওয়ার জন্য এ-পাশও ছিন্ন করতে হয়।

কিন্তু আমি নিরাশ হচ্ছিনে। এই নীলকণ্ঠ হিমালয়েই, এই পথ

দিয়ে যাবার সময়ই ক্ষুদ্রহৃদয়দৌর্বল্য বশতঃই (milk of human kindness !) ধর্মপুত্র স্বেচ্ছায়-সঙ্গী সারমেয়টিকে ত্যাগ করতে সম্মত হন নি। ধর্মরাজ তৎসত্ত্বেও তাঁর জন্য স্বর্গদ্বার খুলে দেন। সেই ব্যত্যয় কি আবার হতে পারে? নীলকণ্ঠের উপাসক মাত্রই এর উত্তর দিতে ভয় পাবেন। আমি তাঁর উপাসক নই। আমি নিরপেক্ষ তৃতীয়পক্ষ। আমি নির্ভয়ে বলবো, এই 'ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য' হৃদয়ে ধারণ করেই অবধূত নীলকণ্ঠের হৃদয়ে স্থান পাবেন। কিন্তু খৃষ্ট সাধুর স্মরণে বলি, 'মোক্ষ? মোক্ষ নিশ্চয়ই চাই, প্রভু, কিন্তু not just yet!' অবধূতের মোক্ষটিও যেন বিলম্বে আসে। কারণ, পূর্বোক্ত খৃষ্ট সাধুই বলেছেন, তখন মুক্ত পুরুষ মৌন হয়ে যান। অবধূত পূর্ণ তিন বৎসর নীলকণ্ঠে মৌনব্রতী ছিলেন—আমাদের কোনো ক্ষতি হয় নি, কারণ, তারপর তিনি বাঙলা সাহিত্য-মজলিসে তাঁর সাধনার ধন সঙ্গীতে পরিবর্তিত করে গান গাইলেন এক যুগ ধরে।

এবারে মৌন হলে সাহিত্যের সাধারণ পাঠক, সাধারণ 'মানুষ' বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অথচ তিনিই গেয়েছেন,

'জয়, মানুষের জয়!'

এই একটিমাত্র জয়ধ্বনি আছে দগ্ধপৃথ্বীতলে যে জয়ধ্বনিতে কি হিন্দু কি মুসলমান, কি কৃষ্ণ কি শ্বেত সর্বমানুষ আত্মহারা হয়ে যোগ দেয়॥

সৈয়দ মুজতবা আলী

নীলকণ্ঠ হিমালয়

এ গুরো—এ তোতা বাবা—এ মহারাজ।

প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠি, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা ভেঙে যায়। যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, দম ফাটবার যোগাড়। কোনও রকমে লেপ কাঁথা ফেলে উঠে বসে হাঁপাতে থাকি। স্পষ্ট শুনতে পাই গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ, মাথার মধ্যে না বুকের মধ্যে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

প্রায়ই ঘটে ঐ জাতের ব্যাপার। খুবই বিপদে পড়ে যাই শীতের রাতে, বিশেষত যদি সাঁইসাঁই করে হাওয়া বয় আর সেই সঙ্গে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। ঐ রকম রাতগুলো ঠায় বসে থেকে কাটাই আমি, ঘুমিয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই, সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠতে হবে।

আঁতকে উঠে তোতা মহারাজকে ডেকে ফেলি। কোথায় তোতা!

অভিশাপ, নীলকণ্ঠের অমোঘ অভিশাপ। ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনও উপায় নেই এ জীবনে। লক্ষ কোটি মণ পাথর হঠাৎ খসে পড়ে নীলকণ্ঠের অঙ্গ থেকে, কেন পড়ে কেউ জানে না। কখন কোন্‌ মুহূর্তে শুরু হবে সেই মহাপতন তাও কি কেউ বলতে পারে! কার পাপে ঐ সর্বনাশটা ঘটে!

আমি শুধু শুনেছি সেই হুহুংকার। নীলকণ্ঠ যখন খেপে ওঠেন, তখন যে নাদ সৃষ্টি হয় তাঁর অন্তরে, তা আমি শুনেছি। সেই সর্বনাশা নাদ আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বাসা বেঁধেছে।

তোমরা ভক্ত। ভক্তির কাজল চোখে মেখেছ তোমরা, তাই ঐ নীলকণ্ঠ তোমাদের কাছে দয়াময় ভগবান। তোমাদের কাছে যিনি করুণাময় শিবশম্ভু পার্বতীনাথ ভোলা মহেশ্বর, আমার কাছে তিনি নীলকণ্ঠ। দেখেছি আমি তাঁর মহাসংহারমূর্তি, প্রত্যক্ষ করেছি তাঁর

প্রলয়নৃত্য। সেই নৃত্যের তালে তালে বাজে ডম্বরু বাজে শিঙা। সে মহাসঙ্গীত কি ব্যাপার তা আমি মর্মে মর্মে জানি। ভুলতে পারি না, ভোলবার উপায় নেই। সেই শব্দ, যার আসল নাম বোধ হয় শব্দব্রহ্ম—আর সেই স্পন্দন! বোঝা যায় না কোথায় হয় স্পন্দনটা, মনে হয় চরাচর বিশ্বটাই যেন থরথর করে কাঁপছে। মনে হয় এই পৃথিবী গ্রহটাকে দু হাতে ধরে মাথার ওপর তুলে কে যেন অনবরত ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

ঐ শব্দ আর ঐ কাঁপুনি কিছুতেই ভুলতে পারি না আমি। তাই আমার কিছুতেই নেশা হয় না। নীলকণ্ঠ আমার নেশার বিষটুকু কণ্ঠে ধারণ করে আছেন।

তখন কিন্তু বেশ নেশা ধরত। তোতা মহারাজ ভুর্‌রা টানত। প্রসাদ পেতাম, নেশা জমে উঠত। ঠাণ্ডায় হাঁটু দুটো জমে গেছে, অসাড় হয়ে গেছে কোমরের নিচে পর্যন্ত। ঐ অবস্থা হলে তোতা বলত—থক গিয়া। থক গিয়া তো কষে দুটি টান দাও ছিলিমে, সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা। ভুর্‌রার তুল্য বস্তু এ দুনিয়ায় আর কি আছে!

ভুর্‌রা কিন্তু গাঁজা নয়। অনেকের ধারণা হিমালয়ে যাঁরা থাকেন তাঁরা গাঁজা টানেন। পাবেন কোথা? অত দামী বস্তু হিমালয় অঠরে হামেশা পৌঁছয় না। তাই অগতির গতি ভুর্‌রা। পাহাড়ে জঙ্গলে ভাঙ জন্মায়। টিহিরী উত্তরকাশীর আশেপাশে প্রচুর জন্মায়, যমুনোত্তরীর কাছাকাছি স্থানেও ভাঙ গাছ নজরে পড়েছে। ভুর্‌রা হল কাঁচা ভাঙ্‌ গাছ আর শুকনো খইনির তামাক। ঐ দুই পদার্থকে পাথরের ওপর পাথরের বাড়ি দিয়ে কুটতে হবে। কুটতে কুটতে মাখা তামাকের মত তাল পাকিয়ে যাবে। তারপর ছোট ছোট গুলি বা টিকে বানিয়ে রোদে শুখোতে হবে বা আগুনে সেঁকে নিতে হবে। ওর একটি বা দুটি গুলি লম্বা ছিলিমে ফেলে গনগনে এক টুকরো কাঠকয়লা চড়িয়ে দাও কষে দম। ব্যাস একদম সব ফর্সা। হাল্কা-

কাঁপানো ঠাণ্ডা, খালি পেটের জ্বালা, পিসু পোকা বিলকুল উধাও। ঘৃণা লজ্জা ভয় সমস্ত খতম।

হাঁ, আসল কথাটা হল ঐ—ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়।

নীলকণ্ঠ আমার লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন জাতের বিষকেই গিলেছেন। এখন শুধু ঐ কাঁপুনিটুকুই সার। কাঁপুনিটুকু সম্বল করে এখন বেঁচে আছি।

ওদের কথা কিন্তু এখনও মনে আছে। ছুতোয়নাতায় ওরা আমার সামনে উপস্থিত হয়। কিছুই বলে না। শুধু তাকিয়ে থাকে। সেই চাউনি হল বরফের চাউনি। বরফের চাউনি কেমন তা কি কেউ জানে!

প্রথমে আমি ঐ বরফের চাউনি দেখেছিলাম কানফাটা নারায়ণ স্বামীর চোখে। মালবারের ছেলে কান ফাটিয়ে নারায়ণ স্বামী বনে গিয়েছিল। ভাল করে হিন্দী বলতে পারত না। বেচারা তখনও কুড়ি পার হয় নি। আবদার করতে লজ্জা পেত না। গোরখপুরের এক শেঠ্ গঙ্গোত্তরীতে গিয়ে সাধুদের হরিণের চামড়া দান করতে শুরু করলেন। নারায়ণ স্বামী চেঁচাতে লাগল—হাম শের কো মৃগছালা মাঙ্‌তা হায়, শের কো মৃগছালা মাঙ্‌তা হয়। শের কো মৃগছালা পেল না বলে মৃগছালাই নিল না। রাগ অভিমান করে গুম্ মেরে বসে রইল। তখন বিশ বছরের নারায়ণ স্বামীর চোখে রাগ অভিমান দুঃখ দেখেছিলাম।

বছর দেড়েক পরে আবার দেখা হল তার সঙ্গে। বৃদ্ধ কেদারের কাছে এক চটিওয়ালার দরজায় পড়ে আছে। গা-ময় ঘা, মুখের ওপর মাছি ভ্যানভ্যান করছে, দুই চোখে বরফের চাউনি। কি হল!

চটিওয়ালা বললে, বেচারার বয়েস অল্প তাই বিপদ ঘটে গেছে। নাগা সাধুদের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিল। বাকিটা আর বললে না।

বলবার দরকারও ছিল না। বুঝতে পারলাম, যাঁরা নাগা হয়ে ইন্দ্রিয় জয় করার সাধনা করেন তাঁরা ওর তাজা দেহটা পেয়ে জোরসে তপস্যা চালিয়েছিলেন। সেই বিষটা কানফাটা নারায়ণ স্বামী হজম করতে পারে নি। সবাই কি সব পারে!

বিষ, আগাগোড়া সবটুকু হলাহল। ঐ হলাহল যিনি অনায়াসে কণ্ঠে ধারণ করেছেন তিনিই নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের স্মৃতি সবটুকুই বিষ। সেই বিষ আমি আজ এতদিন পরে ওগরাতে চেষ্টা করছি। আমি যে নীলকণ্ঠ নই।

নীলকণ্ঠের কিরীট চিরতুষার মণ্ডিত। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আগুন। কি সেই আগুন!

তাঁর কন্যার নাম হিমানী। হিমানী-কন্যা আজও আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে হিসহিস করে গরজাচ্ছে। হিমানী-কন্যা আমায় জানিয়ে দিয়েছে, নীলকণ্ঠের চোখে যে আগুন জ্বলছে সে আগুনের কি জাত। হিমানী-কন্যা বলছে—বল তুমি, বলতেই হবে তোমাকে আমার পিতার আসল স্বরূপ। যতদিন না সমস্ত অকপটে বলছ ততদিন নিষ্কৃতি নেই।

অতএব এতদিন পরে শুরু করছি। হাঁ, কমসে-কম ছত্রিশ বছর পরে কলম নিয়ে বসেছি হিমানী-কন্যার মহামহিম পিতার আসল পরিচয় দিতে। পারব তো!

এই তো সেদিনের কথা।

মনে হয় ব্যাপারটা যেন সেদিন ঘটেছিল। অথচ জানি, খুবই ভাল করে জানি যে এই ব্যাপারটা এ জীবনে ঘটেছিল কমসে-কম ছত্রিশ বছর আগে। ছত্রিশ বছর আগে যা ঘটেছিল তাকে ঐতিহাসিক কাহিনী বললে কি ভুল বলা হবে!

সেই ছত্রিশ বছর আগের এক সন্ধ্যায় সর্বপ্রথম জানতে পারলাম যে নীলকণ্ঠের সঙ্গে পরিচয় হবে আমার। সেই পরিচয়টা হয়ে

মর্মান্তিক ধরনের। তারপরও অবশ্য অনেক কাল বেঁচে থাকব। সেই কালটার জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্ত অবস্থার সবটুকু থাকবে নীলকণ্ঠের দখলে। অর্থাৎ থাকবে শুধু হলাহল, নীলকণ্ঠের স্মৃতি। সেই হলাহল হজমও করতে পারব না, উগরে ফেলতেও পারব না।

হেসেছিলাম। মনে মনে ভেঙচি কেটেছিলাম তাঁকে যিনি আমার ভবিষ্যৎ জীবনটাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন। তারপর পাঁচটা বছর পার হল না, ভেঙচিটা সুদে আসলে উসুল হয়ে আমার কাছেই ফেরত এল। উত্তরকাশীর কালীবাড়িতে মা আনন্দময়ী বাকশক্তি হরণ করে কানে কানে বলে দিলেন—"চোখ চেয়ে দেখবি, কান পেতে শুনবি, আর বুদ্ধি দিয়ে বুঝবি। জিভ বার করে দাঁতে কামড়ে থাকলে কি কেউ কিছু বলতে পারে রে? তাই তোর মা জিভ বার করে দাঁতে কামড়ে রয়েছে। ঐ রকমটাই করে দিলুম। যা, ঘুরে বেড়াগে যা। যাকে খুঁজছিস এইবার সে ধরা দেবে।"

কে সে! কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি!

সেদিন বুঝতে পারি নি মা কি বলেছিলেন। আজ বুঝছি, যার নাম হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারা সেইভাবে বুঝতে পারছি যে কাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম আমি, কাকে ধরতে পেরেছি।

যাকে ধরতে পেরেছি তাকে নিয়েই চোরের মত বসে আছি আজ। লজ্জার মাথা খেয়ে কারও কাছে কবুল করতেও পারি না যে ধরেছি কাকে। কবুল করলেই বা বিশ্বাস করবে কে! যদি বলি, কালী কেষ্ট শিব ব্রহ্মা ছত্রিশ কোটি দেব-দেবীর একটিও ধরা দেয় নি আমার ফাঁদে, কেবলমাত্র নিজেকেই ধরতে পেরেছি, কিছুটা চিনতে পেরেছি নিজেকে একমাত্র ঐ নীলকণ্ঠেরই কৃপায়, তাহলে হয়তো সাধুসজ্জনে হাসবেন। তখন হয়তো বা কেউ জানতে চেয়ে বসবেন—"কেমন মনে হল নিজেকে?"

অকপটে জবাব দিতে গেলে বলতেই হবে—"ভয়াবহ বীভৎস একটা প্রাগৈতিহাসিক অস্থি হিংস্র জানোয়ার, জিভটা লক্‌লক্ করছে,

নখদন্ত বার করে তেড়ে খেতে আসছে। পারছে না ঐ 'নীলকণ্ঠের জ্বালায়। সদাসর্বক্ষণ সজাগ নীলকণ্ঠ মাথায় তুষার-কিরীট পরে অগ্নি-নেত্রে তাকিয়ে আছেন। আর হলাহলটুকু হরণ করে নির্বিষ করে ছাড়ছেন।"

থাকুক, আত্মপরিচয় দিতে বসি নি। বসেছি নীলকণ্ঠের পরিচয় দিতে। একটা পিঁপড়ে এক বিশালকায় হাতির রূপ বর্ণনা করার চেষ্টা করছে। ভবিতব্য আর কাকে বলে!

ভবিতব্য কাকে বলে যদি বোঝাতে হয় তাহলে ছত্রিশ বছর আগেকার ঐতিহাসিক কাহিনীটুকু সমস্তই শোনাতে হবে। ইংরেজীতে যাকে বলে ইমোশন্, সেই ইমোশনের যুগ ছিল ছত্রিশ বছর আগে। তখন দু চোখে ইমোশনের রুপোলী সুর্মা আঁকা থাকত। আর বুকের ভেতর জ্বলত ধূপ, সেই ধূপের মশলা হচ্ছে রোম্যান্স। রোম্যান্স অর্থে প্রেম সম্পর্কীয় ব্যাপার যদি মনে করেন কেউ তাহলে মূলেই গড়বড় হয়ে বসবে। সেই রোম্যান্সের খাঁটি অর্থটা হচ্ছে যা কিছু আজগুবী আকাশফাটা কিম্ভূতকিমাকার ঘটনা তার পানে ধাওয়া করার জন্যে প্রচণ্ড আকুলিবিকুলি। কানে গেলেই হল, অমুক জায়গায় অমুকে তমুক কাণ্ড করছেন। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর হাঁচড়পাঁচড় শুরু হয়ে যেত। যতক্ষণ না সেই অমুক স্থানে সমুপস্থিত হয়ে অমুকের দ্বারা অনুষ্ঠিত আকাশফাটা কাণ্ডকারখানার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটছে ততক্ষণ আর শান্তি নেই। কতবার ঠকতে হয়েছে, নিজেকে বিশ্ববাঙ্লা ছাড়া হাঁদারাম মনে হয়েছে, ঠাস ঠাস করে নিজের গালে চড়াতে ইচ্ছে করেছে, সে হিসেব দিতে গেলে বোকা বনতে হবে। ঠকবার মত ব্যাপারগুলো মন থেকে বেমালুম উবে গেছে কি না। যাবেই যে, তিন ডজন বছর কাবার করে যে কাহিনী শোনাতে বসেছি, তা যে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে আজও। সেই আলোয় ঠকবার ব্যাপারগুলোকে মোটে চেনাই যাচ্ছে না।

সেই ঐতিহাসিক ছত্রিশ বছর আগের কালের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে এ যুগের কিছুই মিলবে না। ইংরেজীতে যাকে বলে র‍্যাশন্যাল্, সেই র‍্যাশন্যাল যুগ চলছে এখন। এ যুগের সাংঘাতিক দুই অস্ত্র বিচারবুদ্ধি আর যুক্তি, দু হাতে ঐ অস্ত্র দুখানা ধারণ করে কচাকচ আগাছা কাটতে কাটতে পথ সাফ করে এগিয়ে চলেছে এ যুগের মানুষ। বুঝতেই পারছি না, এ যুগের র‍্যাশন্যাল মানবমানবীদের দরবারে আমার এই ঐতিহাসিক কাহিনী পেশ করাটা উচিত হচ্ছে কি না।

কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি!

ন্যাড়া সোম যদি থাকত হাতের কাছে পরামর্শ করতে পারতাম। করলেই বা কি ফল ফলত! যা জবাব দিত ন্যাড়া তা তো জানাই আছে। বলত—"অত বিচার বিবেচনার দরকারই বা কি। দুগ্‌গা বলে দাও ঝাঁপ, তারপর যা থাকে কপালে।"

অর্থাৎ ভবিতব্য কাকে বলে সেটা বোঝাতে গেলে সেই ছত্রিশ বছর আগের ইমোশন্ আর রোম্যান্সের যুগের কাহিনীটা আগাগোড়া শোনাতেই হবে।

অতএব ন্যাড়ার পরিচয় দিয়েই শুরু করা যাক।

ওর দুটো নাম ছিল, কেউ বলত ন্যাড়া কেউ বলত নুলো। একই কারণে বেচারা হঠাৎ ন্যাড়া আর নুলো হয়ে পড়েছিল। কারণটি হচ্ছে পটাশ আর মোমছাল। পটাশ মোমছাল আর পাথরের টুকরো এক সঙ্গে একটা মোড়কের মধ্যে পুরে তার ওপর কষে পাট জড়াতে হবে। বিনা ঝুঁকিতে ঐ কর্মটি সম্পাদন করতে হলে পটাশ আর মোমছালকে আলাদা আলাদা জল দিয়ে মাখতে হবে। দুটি ছোট ছোট পুরিয়ায় আলাদা করে সেই ভিজে মশলা নিয়ে তার চারপাশে পাথরকুচি দিয়ে বাঁধতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় মাল তৈরী হলে একটু অসুবিধে আছে। ভিজে মশলা না শুখোলে বাঞ্ছিত ফললাভ

হবে না। তাই মেথিলেটেড্ স্পিরিট দিয়ে ভিজিয়ে মাল বাঁধছিল ধনঞ্জয় সোম। ন্যাড়ার নাম তখন ধনঞ্জয় সোমই ছিল। ধনা সোম পাট জড়িয়ে বাঁধছে, হাত দুখানা রয়েছে একটা গামলার ওপর। গামলা ভরতি মেথিলেটেড্ স্পিরিট, হাবু লাহিড়ী একটা মগে করে সেই স্পিরিট তুলে ওর হাতের ওপর ঢালছে। বাঁধা হয়ে যাবার পর বড় জোর মিনিট পনের লাগবে স্পিরিটটুকু উবতে। তখন আলতো করে মালটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দাও ফাঁকা মাঠে। সঙ্গে সঙ্গে বুম্, আশপাশের বাড়ির কাঁচের সাশি একখানাও আস্ত থাকবে না।

বোধহয় সেদিন ছিল ভূত-চতুর্দশী। মল্লিকদের পোড়ো আস্তাবলের ভেতর চলছে মাল বানানো। তখন বেলা দুপুর, সমস্ত পাড়াটা কেঁপে উঠল। পড়ি তো মরি করে ছুটলাম সবাই। গিয়ে দেখি, একদম পরিষ্কার, আস্ত আস্তাবলটাই উড়ে গেছে। পেছনেই একটা বেল গাছ ছিল, সেটারও প্রায় অর্ধেকটা সাবাড়। ইট, সুরকি, কড়ি, বরগা সরিয়ে ওদের বার করা হল। হাবিটার মুখ মাথার অর্ধেকটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ধনার বাঁ হাতের কবজির নিচে থেকে উধাও হয়েছে দেখা গেল। কাঠকয়লার মত রঙ্ হয়েছে দুজনের। হাবিকে আর হাসপাতালে নিয়ে গেল না, ধনাকে নিয়ে গেল। তিন মাস পরে একেবারে সেই সরস্বতী পুজার সময় ফিরে এল ধনা ন্যাড়া আর নুলো হয়ে। তারপর আর ওর মাথায় একটাও চুল গজালো না।

মনটা কিন্তু ওর একদম ঝলসায় নি। অত কাণ্ডের পরেও যেমন তাজা তেমনি সবুজ রয়ে গেছে ওর মন। কোথায় কোন্ আজগুবী ব্যাপার ঘটছে, সমস্ত জানতে পারত ও। কি করে অত সংবাদ রাখত সেটাও এক রহস্যময় ব্যাপার। সর্বপ্রথম ন্যাড়াই আনল সংবাদটি। নিমতলা স্ট্রীটে এক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটছে। একজন আছেন সেখানে যিনি ভূত-প্রেতের সঙ্গে কথা বলেন। মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে তার ভেতর প্রেত আমদানি করতে পারেন। তখন সেই

ঘুমন্ত মানুষটাকে হুকুম করে যা খুশি তাই করাতে পারেন। আরও কত কি পারেন।

সন্দেহ প্রকাশ করলে বোমা ফাটবার ভয়। স্বয়ং হ্যাড়াই বোমার মত ফেটে পড়বে। তার মতে দূরে বসে বিচার বিবেচনা করে মেয়েরা। পুরুষের কাজ হচ্ছে সোজা সেই নিমতলা স্ট্রীটে গিয়ে স্বচক্ষে সবকিছু প্রত্যক্ষ করে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা। সুতরাং খাঁটি পুরুষমানুষের মত লেঠা চুকিয়ে ফেলবার জন্যে দুজনে রওয়ানা হওয়া গেল।

জীবনে সত্যিকারের রহস্যের পেছনে ধাওয়া করা সেই বোধহয় প্রথম। মরবার পরে মানুষ রামছাগল হয়, না ভূত-প্রেত হয়ে লোকের বাড়িতে ঢিল ফেলে নির্মল আনন্দ উপভোগ করে তা নিয়ে আগে কখনও মাথা ঘামিয়েছি বলে মনে করতে পারছি না। ইমোশন্ আর রোম্যান্সের তাড়নায় কি রকম পাগল হয়ে উঠতাম সেই ছত্রিশ বছর আগে, তারই একটু পরিচয় দিচ্ছি। হয়তো এর নামই ভবিতব্য, যে ভবিতব্য নাকি অখণ্ডনীয়।

ভদ্রলোকের নামটি ঠিক মনে পড়ছে না। তাঁর দরজায় একখানা চকচকে পেতলের পাতে খোদাই করা ছিল, প্রফেসর মজুমদার আর্চার হিপনটিস্ট এণ্ড আরও অনেক কিছু। ফ্রান্স, জারমেনী, ইংলণ্ড ইত্যাদি সব নামকরা দেশ থেকে বিস্তর উপাধি পেয়েছিলেন নাকি তিনি। তার প্রমাণও পাওয়া গেল তৎক্ষণাৎ। তখনকার দিনে কোট প্যান্ট টাই পরা অবস্থায় তিনি দর্শন দান করলেন। একটি বেঁটে খাটো শক্ত গোছের মানুষ, চক্ষু দুটি অস্বাভাবিক সাদা, এমন সাদা যে চোখের তারা দুটো আছে বলে মনেই হয় না।

প্রথম দিনই আমাদের দেখালেন তাঁর একটি অসাধারণ শক্তি। শব্দভেদী বাণ, রাজা দশরথ ঐ শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ে ঋষিপুত্রকে মেরে চরম বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন। সেই বিদ্যার সঙ্গে পরিচয় লাভ

করার জন্যে প্রফেসরের সঙ্গে আমাদের তিনতলার ছাতে উঠতে হল। ছাতের একদিকে এক উঁচু পাঁচিল, পাঁচিলের দু তিন হাত সামনে একটা তার খাটানো, সেই তারে গোটাকতক ছোট ছোট পেতলের ঘণ্টা ঝুলছে। পঁচিশ ত্রিশ হাত সামনে হাতে ধনুক বাণ নিয়ে ছোট একখানি টুলের ওপর বসলেন প্রফেসর। একখানা বড় রুমাল দিয়ে আমরা তাঁর চোখ বেঁধে দিলাম। এমন ভাবে বাঁধলাম যে কান দুটো যেন খোলা থাকে। তারপর তিনি ঘণ্টাগুলোর দিকে পেছন ফিরে বসলেন। লম্বা একখানা ছড়ি হাতে নিয়ে ন্যাড়া ঘণ্টাগুলোর কাছে দাঁড়াল।

প্রফেসর হাঁকলেন—ওয়ান। ন্যাড়া একটা ঘণ্টার গায়ে ছড়ি দিয়ে বাড়ি লাগাল—টুং। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর, বাণটাও ছুটে এল সেই মুহূর্তে। খসে পড়ল ঠিক সেই ঘণ্টাটাই যেটার গায়ে বাড়ি লাগিয়েছিল ন্যাড়া। ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ্‌ বার বার পাঁচবার পাঁচটা বাণ লক্ষ্য ভেদ করল। যাকে ভাল কথায় বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দশা, ঠিক সেই জাতের দশা প্রাপ্ত হয়ে চক্ষু ছানাবড়া করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গোলাম বনে গেলাম। প্রফেসর সেদিন দুটি তাজা শিকার করলেন।

শুরু হয়ে গেল শাগরেদি। শাগরেদি করতে করতে কত রকমের কাণ্ডকারখানা যে দেখেছি তার সবটুকু বলতে শুরু করলে আস্ত একখানা উপন্যাস দাঁড়িয়ে যাবে। উল্লেখযোগ্য দু একটি বলি। যেমন দমদমের সেই রায়সাহেবের ঘোড়ায় চড়া ব্যাপারটা। হিপনটিজিমের খেল্ দেখবার জন্যে অনেক বড়লোক সন্ধ্যা মজলিসে প্রফেসরকে আমন্ত্রণ করতেন। আমরাও সঙ্গে যেতাম। দমদমের এক বাগানবাড়িতে খেলা দেখানো হচ্ছে। হঠাৎ এক সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসলেন প্রফেসর। খোদ কর্তা রায়সাহেবকে হিপনটাইজ করে মস্ত বড় এক তাকিয়া এগিয়ে দিয়ে বললেন—"চড়ে বসুন আপনার ঘোড়ার ওপর, আপনি খুব ভাল ঘোড়া চড়েন শুনেছি,

দেখান আমাদের ঘোড়ায় চড়ার কায়দা।" বলে তাকিয়ার এক মাথার দড়ি খুলে তাঁর হাতে দিলেন। তাকিয়ার ছু পাশে ছু পা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন হোঁতকা রায়সাহেব বাহাত্বর, তাকিয়ার দড়ি ছু হাতে ধরে হেট্ হেট্ করে ঘোড়া হাঁকাতে শুরু করলেন। মোসাহেবরা তো হুজুরের কাণ্ড দেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে তখন। প্রমাদ গণলাম আমরা, হুঁশ ফিরে পাবার পরে হুজুর কি মূর্তি ধারণ করবেন কে জানে! সমস্ত ব্যাপার শুনে হয়তো হুকুম দেবেন আমাদের সব কজনকে ধরে চাবকাবার জন্যে। একটা আস্ত রায়সাহেব বাহাত্বরকে নিয়ে ফিচলেমি করা, চাট্টিখানি কথা নয়।

ভালয় ভালয় সেযাত্রা ফিরে আসতে পেরেছিলাম আমরা। কারণ হুঁশ ফিরে পাবার পর হুজুর সাহেবের ভয়ানক ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। কোনও রকমে আমাদের বিদেয় করে তিনি ঘুমাতে চলে গেলেন। ঐ জাতের ছোটখাটো রসিকতাই প্রায় করতেন প্রফেসর মানুষকে হিপনটাইজ করে। মনে পড়ছে, আর একবার এক অতি বিখ্যাত বড়লোককে চকখড়ি খাইয়েছিলেন 'শাঁখআলু খান' হুকুম করে। মাঝে মধ্যে পেল্লায় কাণ্ডও ঘটে বসত। তখন আমরা প্রফেসরের শাগরেদ্ কজন জান কবুল করে ওঁকে বাঁচাতাম। সেই জাতের এক পেল্লায় কাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে এ প্রসঙ্গ ইতি করছি।

যাঁরা জানেন প্রেতাবেশ কাকে বলে তাঁদের ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হবে না। কখনও কখনও মোহাচ্ছন্ন লোকের ভেতর প্রেতের আবির্ভাব ঘটে বসত। হিপনটাইজ করলেন প্রফেসর কাউকে, তারপর দেখা গেল যে লোকটি তাজ্জব কাণ্ডকারখানা শুরু করেছে। যে মানুষ ইংরেজী পর্যন্ত জানে না, অনর্গল সে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগল। জীবনে যে সা রে গা মা সাধেনি, সে হঠাৎ উঁচু ঘরাণার ভৈরবী ঠুংরী জুড়ে দিল। একবার এক ট্যাঁস চক্ষু বুজে চণ্ডীপাঠ করেছিল ঝাড়া মিনিট পনের ধরে। ঐ রকম ব্যাপার কিছু ঘটলেই তাড়াতাড়ি প্রফেসর মোহনিদ্রা ভাঙাবার জন্যে চেষ্টা করতেন। বিপদ কেটে যেত।

যখন কুপ্রেত উপস্থিত হত তখন কিন্তু ব্যাপারটা সহজে মিটত না। হাওড়ার নামজাদা এক উকিলবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন হয়েছিল। হিপনটিজম সম্বন্ধে দু চার কথা বলতে না বলতে এক ছোকরা উকিল চেটাং চেটাং বোলচাল ঝাড়তে লাগলেন। তাঁর মতে প্রফেসরের সমস্ত কেরামতি হচ্ছে স্রেফ বুজরুকি। গোবেচারা ভাল মানুষদের ধোঁকা দিয়ে হাততালি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন প্রফেসর ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনে মোটেই রাগ করলেন না প্রফেসর. ছোকরার একেবারে গা ঘেঁষে বসে এ-কথা সে-কথা আলাপ করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে লোকটি ঢুলতে লাগল। তারপর মেঝের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ঘরসুদ্ধ ভদ্রলোকেরা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

দু হাত মেলে এগিয়ে গেলেন প্রফেসর। ছোকরার শরীরের এক বিঘত ওপর দিয়ে খুব আস্তে আস্তে বারকতক সঞ্চালন করলেন হাত দুখানা। তারপর ওঁর নিজস্ব ঢঙে অমানুষিক স্বরে হুকুম দিতে লাগলেন "ওঠ, উঠে বস।"

একটু একটু করে সোজা হয়ে উঠতে লাগল তার কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত। বীভৎস অবস্থা হয়েছে তখন তার চোখমুখের। চোখের তারা দুটো কপালের পেছনে ঠেলে উঠেছে, আধখানা জিভ বেরিয়ে পড়েছে, নাকের ফোঁড় দুটো ফুলে উঠেছে অস্বাভাবিক রকম। সোজা হয়ে বসবার পর একটা পৈশাচিক আওয়াজ বেরুতে লাগল সেই জিভ বার করা মুখ থেকে। ধাঙড়রা খুঁচিয়ে শুয়োর মারে যখন তখন অনেকটা ঐ জাতের চিৎকার করে শুয়োরে। ব্যাপার দেখে কয়েক হাত পিছিয়ে গেলেন প্রফেসর, তাঁরও চোখ দুটো তখন কপালে উঠে গেছে। ভয়াবহ কণ্ঠে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—"কে তুমি? তুমি কে?"

ইতিমধ্যে লোকটা সটাং উঠে দাঁড়াল। দু হাত মেলে এগিয়ে চলল প্রফেসরের দিকে বিকট হুংকার ছাড়তে ছাড়তে। অন্য যাঁরা ছিলেন ঘরে, তাঁরা হুড়োহুড়ি করে ঘর ছেড়ে পালালেন।

প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর—"ধর ধর, ধরে ফেল ওকে।"

আমরা চার-পাঁচজন শাগরেদ লাফিয়ে পড়লাম তার ওপর। তুলকালাম কাণ্ড চলতে লাগল, রোগা পটকা ছোকরার শরীরে তখন অসুরের শক্তি, ঘরের আসবাবপত্র সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কোনও রকমে তাকে ফেলা হল আবার মেঝেয়, ফেলে ঠেসে ধরে রইলাম সকলে। একটু এগিয়ে এসে প্রফেসর আদেশ দিতে শুরু করলেন—"ঘুমোও, ঘুমিয়ে পড়, তুমি ঘুমোচ্ছ, তুমি ঘুমোচ্ছ, ভয় নেই, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাক তুমি।"

ক্রমেই কাঠের মত শক্ত শরীরটা এলিয়ে পড়তে লাগল। তারপর তার মুখচোখের অবস্থাও পাল্টাল। তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা সরে দাঁড়ালাম।

লম্বা একটা শ্বাস ফেলে প্রফেসর বললেন—"তোমাদের জন্যেই বেঁচে গেলাম আজ। একটা শয়তান কুপ্রেত এসে গিয়েছিল। মারা পড়ত ছোকরাও, এযাত্রা খুব বেঁচে গেল।"

ঐ পর্যন্তই। ঐভাবেই সুপ্রেত বা কুপ্রেতের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু ওতে তো মন ওঠে না। মন ওঠে যদি একটা প্রেতকে বাগ মানিয়ে বশীভূত করা যায়। সেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মত, যিনি তাল-বেতালকে হুকুম করে অসাধ্য সাধন করতেন। ও সমস্ত কিছুই লাভ হল না, তল্পি বহাই সার হল। তখন ভালয় ভালয় কেটে পড়তে পারলে বাঁচি।

নিমতলা স্ট্রীটে গিয়ে প্রফেসরের পাল্লায় পড়াটা খুবই সহজ কাজ বলে মনে হয়েছিল, কেটে পড়াটা কিন্তু মোটেই সোজা বলে মনে হল না। বাঁধা পড়ে গেছি তখন, যেতেই হবে ওঁর কাছে, ওঁর হুকুম মাফিক নির্দিষ্ট দিনে ঠিক হাজির হতে হবে। যাব না বলে হাজার প্রতিজ্ঞা করেও নিস্তার নেই, যথাসময়ে ঠিক যথাস্থানে উপস্থিত হয়েছি। খুবই ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছি তখন যে আমরাই ভূত-প্রেতের খপ্পরে পড়ে গেছি।

উদ্ধার পেলাম কি করে সেইটুকু শোনালেই এ কাহিনী-শেষ হবে।

এবং এইখান থেকেই হল সূত্রপাত।

সর্বপ্রথম শুনলাম নিজের নিয়তি। আমাকে নাকি হিমালয়ে যেতে হবে। বেশ কিছুদিন পচে মরতে হবে হিমালয়ের জঠরে। তারপর পাব মুক্তি। অজানাকে জানবার তাড়নায় ভূতের বেগার খাটবার জন্যে হিমালয়ে গিয়ে সাধনা করতেই হবে আমাকে, তাই নাকি আমার ভবিতব্য।

শুনে সেদিন হেসেছিলাম।

আজ আর হাসি না, ভুলেই গিয়েছি হাসতে। এ জীবনের যাবতীয় কান্না-হাসির চাটনি নীলকণ্ঠ চেটেপুটে গিলে ফেলেছেন। গিলে জঠরে পাঠালে লেঠা চুকে যেত, হজম হয়ে যেত সব। তা তো হয় নি, সবটুকুই যে বিষ। হাসি-কান্না হল হলাহলের গাঁজলা, জীবন-সমুদ্র মন্থন করলে যে হলাহল উৎপন্ন হয় তারই গাঁজলা হচ্ছে কান্না-হাসি। সেই হলাহল যিনি কণ্ঠে ধারণ করে আছেন তাঁর নাম নীলকণ্ঠ। তাঁর বিষাক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে আকাশ নীলে নীল হয়ে আছে। নেশায় ঢুলছে বিশ্বচরাচর। আর নেশার ঘোরে আমারও মনে হচ্ছে—এই তো সেদিনের কথা।

ভুল, মারাত্মক ভুল। সেদিনের ঘটনা নয়, ছত্রিশ বছর আগে ঘটেছিল এই ঘটনাটি। অনবরত নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে যে তুমি ছত্রিশ বছর আগেকার একটা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা করছ। খুব সাবধান, গোঁজামিল দিও না, ধরা পড়ে যাবে। ছত্রিশ বছর আগের সেই সব ঐতিহাসিক মানুষ, যাঁদের সম্বন্ধে তুমি লিখতে বসেছ, তাঁদের মধ্যে দু-চারজন হয়তো এখনও সশরীরে বর্তমান রয়েছেন। ভুল করলে ধরা পড়ে গিয়ে অপদস্থ হবে।

অতএব সাবধান হয়েই বলি।

তখন বোধহয় অগ্রহায়ণ মাসের শেষ। সন্ধ্যা হতে না হতেই

কুয়াশায় আর ধোঁয়ায় শহরটা অজানা শহর হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পরে রওয়ানা হওয়া গেল। উদ্দেশ্য মহাপুরুষ দর্শন। মহাপুরুষ দর্শন করতে যাওয়াও সেই প্রথম জীবনে। কেন যাচ্ছিলাম মহাপুরুষ দর্শন করতে!

মুক্তি মোক্ষ নির্বাণ জাতের মূল্যবান বাক্যগুলো তখনও স্থান পায় নি মগজে। সংসার-জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে বৈরাগ্য উদয় হয়েছিল চিত্তে এ কথা বললেও মিথ্যে কথা বলা হবে। সত্যি কথা বলতে হলে বলতেই হবে যে সুবাসীদিদির জন্যে মহাপুরুষ দর্শন করতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সুবাসীদিদির চিত্তে কি ছিল তা তিনিই জানেন। পাক্কা সাড়ে তিন মণ ওজনের বপুখানির ভেতর সুবাসীদিদি কত মণ কামনা-বাসনা লুকিয়ে নিয়ে বেড়াতেন তাই বা কে বলবে! এ কথা কিন্তু ঠিক যে জাগতিক বাসনা-কামনাগুলোকে উনি পোষ মানিয়ে ফেলেছিলেন বছর পঞ্চাশের মধ্যেই। পোষ মানাতে মানাতেই গড়ানহাটায় আর নিমতলা স্ট্রীটে ওঁর নামে খান পাঁচেক তিনতলা বাড়ি রেজেষ্ট্রী হয়েছিল। ফলে তখন পরমার্থিক কামনা-বাসনাগুলোর ওপর নজর পড়েছিল সুবাসীদিদির। বিস্তর দালাল টাউট্ খাঁটি মহাপুরুষদের টিপস্ বিক্রী করার জন্যে ওঁর আশেপাশে ঘুরঘুর করত। কোন মহাপুরুষ কোথায় এসে ঘাপটি মেরে রয়েছেন, কার কি জাতের বিশেষ ক্ষমতা আছে, কিভাবে কখন কার কাছে গেলে ঠিকসে পাকড়াও করা যাবে, বিলকুল জেনে নিয়ে তবে ব্যাক্ করতে বেরুতেন সুবাসীদিদি। হয়তো জিততেন্ কিংবা হারতেন, তাতে কিছু আসত যেত না। জাত জুয়াড়ী হার-জিত নিয়ে মাথা ঘামায় না। খেলা হল খেলা, ইংরেজীতে যাকে বলে স্পোর্টিং স্পিরিট। সেই স্পিরিট ছিল সুবাসীদিদির। তাই কখনও শুনি নি সুবাসীদিদির মুখে কোনও মহাপুরুষের নিন্দে। নিন্দেবান্দার দরকার কি, নতুন একটির সন্ধান পেলে পুরানোটির কথা একদম ভুলে যাবার অত্যাশ্চর্য শক্তি ছিল সুবাসীদিদির।

ঐটুকুই নাকি মূলধন, যার নাম নৈর্ব্যক্তিক ভাব। জাগতিকই বল বা পরমার্থিকই বল, যে কোনও জাতের কামনা-বাসনাগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে ঐ নৈর্ব্যক্তিক ভাবটুকুই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগে। ঐ সহজাত আসক্তিহীনতা গুণটুকু ছিল বলেই না মেদিনীপুর জেলার অজ পাড়াগাঁ থেকে শ্রীমতী সুবাসিনী নাম্নী এক পনের বছরের বালিকা কলকাতায় এসে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে পাঁচখানা অট্টালিকার অধিশ্বরী হতে পেরেছিল।

সুবাসীদিদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল প্রফেসর মজুমদারের আখড়ায় আসা যাওয়া করতে করতে। যে বাড়ির দোতলা ভাড়া নিয়েছিলেন প্রফেসর সেখানির মালিক ছিলেন সুবাসীদিদি। ভাড়া দিতেন না কখনও। ভাড়ার বদলে সুবাসীদিদি ওঁর কাছ থেকে সারভিস্ নিতেন। দরকার পড়লে সুবাসীদিদির কোনও বেয়াড়া ভাড়াটেকে টাইট্ করতেন প্রফেসর। ওঁর গুণের জন্যে সুবাসী-দিদি ওঁকে বিশেষ সুনজরে দেখতেন। তার প্রমাণ, প্রফেসরকে কখনও "ওরে ও মুখপোড়া মিনসে" ছাড়া অন্য কিছু বলে সম্বোধন করতেন না।

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে—এই চিরন্তন আইন অনুযায়ী চাকা ঘুরল। হঠাৎ দেখা গেল সুবাসীদিদি প্রফেসর মজুমদারকে খাতির করতে শুরু করেছেন। মুখপোড়া মিনসের বদলে মজুমদারমশাই চালু হল। শুধু তাই নয়, সর্বজনসমক্ষে প্রফেসরের কথা উঠলেই দিদি মহাসম্ভ্রমে ওঁর সুখ্যাতি করতে শুরু করলেন।

ব্যাপারটা কিন্তু জানতে পারল অনেকে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গিয়েছিলেন নাকি প্রফেসর। আর একটু হলেই দিদির একটি পয়মন্ত ভাড়াটেকে প্রায় হাতিয়ে ফেলেছিলেন। দিদির শ্রীমুখের বাণী হুবহু পেশ করছি, তাহলেই রহস্যটা পরিষ্কার হবে।

"ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবি ঘুঘু, এতবড় আস্পদ্দা! সুবাসী

বাড়িউলীর বুকে বসে দাড়ি উপড়োবি—এ্যাঁ! আমার ভাড়াটের মাথা চিবুবি আমার নাকের ডগায় বসে! দেখি কে কার মাথা চিবোয়!"

অতঃপর লাগল সংগ্রাম। প্রথমেই দাড়া ভাঙার পালা। দাড়া মানে শাগরেদ। সর্বাগ্রে দিদি প্রফেসরের শাগরেদ কটিকে খসাতে সচেষ্ট হলেন। একটু আধটু অনুগ্রহ বিতরণ করতেই ফল হল, আমি আর ন্যাড়া বাদে সবাই দিদির দলে যোগদান করলে। কিছু দিন পরে ন্যাড়াও খসল, চলে গেল জামসেদপুর ওর মামার সঙ্গে ব্যবসা করতে। একলা আমি রইলাম টিকে, ভূত-প্রেত বশ বানাবার কায়দাটুকু যেভাবে হোক প্রফেসরের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। এক বছরের বেশী শাগরেদি করে শুধু হাতে ঘরে ফিরব, এটা কি একটা কথা হল!

ঐ জেদ, সুবাসীদিদি বলতেন গোঁয়ারতুমি, ঐ গোঁয়ারতুমি রোগটাই শেষ পর্যন্ত ভূত-প্রেতের খপ্পর থেকে উদ্ধার করলে আমাকে। প্রথমে ঘুষ, তারপর ভয় দেখানো, তারপর সত্যি সত্যি গুণ্ডা লাগানো, সর্বরকমের চেষ্টা করে হার মানলেন দিদি আমার গোঁয়ারতুমির কাছে। হার মেনে অন্য পথ ধরলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী দিদি আমার সত্যিকারের ব্যামোটি ঠিক ধরে ফেলেছিলেন। একটা আজগুবী ব্যাপার থেকে ছাড়াতে হলে আর একটা চরম আজগুবী কাণ্ড সামনে ধরে লোভ দেখানো চাই। মারাত্মক রকম গোপনীয় ভাবে দিদি জানালেন যে পূর্বজন্ম পরজন্ম বলতে পারেন এমন একজন মহাপুরুষ এসেছেন।

পূর্বজন্ম! তার মানে আগের জন্মে আমি কোথায় কাদের বাড়িতে জন্মেছিলাম, আমার বাপ মা ভাই বোন আত্মীয়স্বজন কারা ছিল আগের জন্মে, সমস্ত জানতে পারব! আগের জন্মে কি করেছি, কি ভাবে মরেছি, বিয়ে হয়েছিল কিনা, ছেলেমেয়ে আছে কিনা, কি করছে তারা, এইসব জানা যাবে!

দিদি বললেন—"শুধু তাই নয়, পরের জন্মে কোথায় জন্মাবে, কি করবে, তাও বলে দেবেন বাবা। একশ আট বছর সমানে সূর্যের পানে তাকিয়ে তপস্যা করেছেন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্ত দেখতে পান।"

তা পেতে পারেন, কিন্তু বলবেন কেন আমায়! প্রফেসর মজুমদারের মত শেষ পর্যন্ত ল্যাজে খেলাবেন না তো?

না, সে ভয়ও নেই। আস্ত মহাপুরুষ কি না, তাই একদম দয়ার শরীর। হয় দয়া করেন, নয়ত তাড়িয়ে দেন। ঐ পোড়ারমুখো ভুতুড়ে মিনসের মতন ভদ্দরলোকের ছেলেদের মাথা চিবিয়ে বিনে পয়সায় গোলামী খাটান না।

শুনে কতটুকু আশ্বস্ত হয়েছিলাম তা বলা মুশকিল। ঝাঁপ দেবার জন্যে তৈরী হলাম কিন্তু। ঝাঁপ যে দিতেই হবে। পর-জন্ম জানবার জন্যে বিশেষ মাথাব্যথা নেই বটে, কিন্তু আগের জন্মে কোথায় ছিলাম কি করেছিলাম এটা তো জানতেই হচ্ছে। এত বড় একটা মজাদার মৌকা কি ফসকাতে আছে!

একশ আট বছর ঠায় যিনি সূর্যের পানে তাকিয়ে তপস্যা করেছেন সেই হিমালয়ে বসে তাঁকেও শহরের টানে কলকাতায় আসতে হয়! সামান্য একটু খটকা লাগল বৈকি। তবে খটকাটুকু টিকে রইল না। কলকাতায় আসার আসল কারণটিও দিদি জানেন, মহাপুরুষ নিজের গুরুর আসন দেখতে এসেছেন। কলকাতা শহর যখন শহর হয়ে ওঠে নি, তখন চিত্তেশ্বরীতলাতে এক হাজার আটটা নরবলি দিয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন যিনি, তিনিই হলেন এই মহাপুরুষের গুরু। তিনি দেহরক্ষা করেছেন, ইনি আছেন, ঝাড়া আড়াইশ বছর বেঁচে আছেন। এই শেষবার গুরুর আসন দর্শন করতে এসেছেন, ফিরে গিয়ে সেই মানসসরোবরে দেহরক্ষা করবেন।

চিত্তেশ্বরীতলাটা আবার কোথায়!

চিৎপুর রোড বাগবাজারের খালে গিয়ে শেষ হয়েছে বলেই জানতাম। আসল ব্যাপার কিন্তু তা নয়, খাল পার হয়ে খানিক এগিয়ে গেছে আদি চিৎপুর রোড। চিত্তেশ্বরীর মন্দিরের সামনে থেকে চিৎপুর রোড শুরু। চিৎপুর রোড আজকের রোড নয়।

ঘোড়ার গাড়ি চেপে বাগবাজারের পোল পার হয়ে ঘোড়-সাহেবের তলায় নেমে আগে পীরসাহেবকে সিন্নি চড়ালেন দিদি। পোল পেরোলেই বাঁদিকে ঘোড়সাহেবের তলা। ওখানে সিন্নি চড়িয়ে না গেলে নাকি পীরকে অসম্মান করা হয়। বড়ই জাগ্রত পীরসাহেব, সশরীরে যখন ছিলেন তখন হেঁটে গঙ্গা পার হতেন। হেঁটে গঙ্গা পার হবার সেই ভয়ঙ্কর শক্তিটাকে কবরের মধ্যে শুয়ে অন্য কাজে লাগান। ভক্তদের সর্ববিধ মনস্কামনা পূর্ণ করেন। দিদির কাছ থেকেই জানলাম যে ঘোড়সাহেবের বিশেষ কৃপা হলে ঘোড়দৌড় খেলায় লোকে রাতারাতি লাখপতি হতে পারে। লাখপতি হবার শখটা তখনও দানা বাঁধে নি চিত্তে। তার চেয়ে ভূত-প্রেত বশ মানানো বা পূর্বজন্মটা জানা অনেক জরুরী ব্যাপার। অতএব আবার গাড়ি ছাড়ল, পাথরের ইট-বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে বিকট আওয়াজ করে এগিয়ে চলল চিৎপুর রোডের উৎপত্তি স্থানে। এক হাজার আটটি নরবলি দিয়ে একদা এক মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন যেখানে সেখানে চলেছি। এক হাজার আটটা মানুষের মুণ্ড এক জায়গায় ডাঁই হয়ে পড়ে আছে, চোখ বুঁজে গাড়ির কোণে বসে হেঁচকানি খেতে খেতে সেই মুণ্ডের পাহাড়টা স্পষ্ট দেখতে পেলাম যেন। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ি থামল। দিদি বললেন—"চল, এসে পড়েছি।"

একটু যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকছিল নামতে, নিজের মুণ্ডটার কথা মনে পড়েছিল হয়তো। কে জানে, সংখ্যাটা এক হাজার আট থেকে সেই রাত্রে ন'য়ে দাঁড়াবে কি না!

আলো নেই, থাকলেও ধোঁয়া আর কুয়াশার দরুণ কোনও কাজে লাগছে না। গাড়ি থেকে নেমে দিদির বিশাল বপুখানির আড়ালে আত্মগোপন করে গেট পেরিয়ে ভেতরে পা দিলাম।

যতদূর মনে পড়ছে মন্দিরের পেছনদিকে ছোট্ট একখানি ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকেছিলাম দিদির সঙ্গে। ঢুকেই মনে হয়েছিল হ্যারিসন রোড চিৎপুর রোডের মোড়ে ফুলের দোকানগুলোর সামনে উপস্থিত হলাম যেন। ফুলের গন্ধে ঘরখানা ভরপুর। সর্বপ্রথম নজর পড়ল বাতিগুলোর পানে। থোড়ের মত মোটা কোমর সমান উঁচু চারটে বাতি জ্বলছে ঘরের চার কোণে। মাঝখানে একরাশ গোলাপ মস্ত একখানা পরাতের ওপর ডাঁই হয়ে রয়েছে। তার পেছনেই আসন, কম্বলের ওপর বাঘছাল পাতা রয়েছে। আসনের ওপর কেউ নেই।

আসনের সামনে থালার পাশে প্রণাম করে দিদি বসে পড়লেন। দেখাদেখি আমিও তাই করলাম। ফুলের গন্ধ, বাতি চারটের আলো সবটুকু জড়িয়ে কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব, এক হাজার আটটা নরমুণ্ডের ভাবনা তখনকার মত মন থেকে উধাও হল। কিন্তু মহাপুরুষটি কোথায়!

দিদির মুখপানে তাকিয়ে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করলাম।

ফিসফিস করে দিদি বললেন—"আসবেন, ঐ আসনে এসে বসবেন। খুব সম্ভব গঙ্গায় গেছেন।"

বসে রইলাম। একজন দুজন করে নিঃশব্দে আরও অনেক লোক এল। ঘরটা প্রায় ভরতি হয়ে গেল মানুষে। সবাই চুপ করে বসে আছেন, কেউ নড়ছেনও না। রাত বাড়তে লাগল।

পাশেই কামানের গোলা বানাবার বিরাট এক কারখানা, সেখানে পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে নটা বাজল। ভাবনা নেই, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়োয়ান চেনে দিদিকে, দরকার হলে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকবে।

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ঘরের মধ্যে সবাই যেন নড়ে উঠলেন। একটা সন্ত্রস্ত ভাব, একটু উত্তেজনা, তারপরই শোনা গেল ঘণ্টার আওয়াজ। গেটের সামনে চিত্তেশ্বরীর মন্দির, অনেকগুলো ঘণ্টা ঝুলছে সেখানে। সবকটা ঘণ্টা বেজে উঠল হঠাৎ। ঘণ্টাগুলো থামবার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট টের পেলাম, দেখতে পেলাম বললে ভুল বলা হবে, টের পেলাম বলাই ঠিক। টের পেলাম সামনের আসনে বাঘছালের ওপর কে যেন বসে আছেন। মূর্তিটা যেন বাষ্প দিয়ে তৈরী, বাষ্প দিয়ে তৈরী মূর্তিটা ক্রমেই জমে উঠতে লাগল। অবশেষে দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হল সর্ব অবয়ব, স্পষ্ট হয়ে উঠল আস্ত মানুষটি। দাড়ি গোঁফ চুল কিছু নেই, অঙ্গেও কোন আবরণ নেই, সোজা হয়ে বসে আছেন ছোটখাটো এক বৃদ্ধ। হাঁ, বৃদ্ধই বটে, কিন্তু আড়াইশ তিনশ বছর বয়েস বলে মনে হল না। তবে যথেষ্ট বুড়ো হয়েছেন, অন্ততঃ একশ বছরের কাছাকাছি পৌঁছেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুধে-আলতা-গোলা গায়ের রঙ, শরীরে এতটুকু মেদ নেই। কোমরটি এমন সরু যে দু হাতের চেটোয় ধরা যায়। নজর করে দেখলাম যে তিনি চোখ মেলে আছেন, আর মুখখানি প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠেছে। প্রায় মিনিট দুয়েক ঘরসুদ্ধ মানুষ অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন সেই অপরূপ মূর্তিটির পানে। তারপর তাঁর ঠোঁট দুখানি নড়ে উঠল। অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরুল, যেন তিন চার বছরের শিশু কথা বলছে। শুনতে পেলাম—"রাম রাম জয় সীয়ারাম।"

রাম রাম রাম রাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম—চাপা গলায় সবাই বার বার উচ্চারণ করতে লাগলেন।

তারপর দেখলাম একে একে সবাই উঠে গেলেন মহাপুরুষের কাছে, একেবারে ওঁর কাছে গিয়ে বসলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে মিনিট তিন চার ধরে কি সব কথাবার্তা হল। এতই আস্তে আলাপ হল যে কিছুই শোনা গেল না। আলাপ করে ঘর ছেড়ে চলে যেতে

লাগলেন সবাই, শেষ পর্যন্ত আমি আর সুবাসীদিদি বসে রইলাম। বপুখানি তুলে দিদি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন না। বসে বসেই বললেন—"বাবা, সেই ছোঁড়াটাকে নিয়ে এসেছি।"

আমার পানে তাকিয়ে পরিষ্কার বাঙলায় তিন বছরের ছেলের স্বরে মহাপুরুষ বললেন—"কাল সন্ধ্যার আগে একখানা নতুন সিল্কের রুমাল নিয়ে এস, একলা এস।"

এমনভাবে কথাগুলি বললেন যে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করার কথা মনেই উঠল না। মস্ত বড় কিছু একটা পেয়ে গেলাম এই জাতের একটা ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন বুদ্ধি। তাড়াতাড়ি মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। একটু পরে দিদিও এলেন। চড়লাম গিয়ে দুজনে গাড়িতে, আবার সেই হেঁচকানি, গাড়ির কোণে মাথা রেখে মুখ বুজে বসে আছি। যাবার সময় নরমুণ্ডের পাহাড় ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে, ফেরবার সময় ঠিক উল্টো ব্যাপার। ওপর ভেতর ফুলের গন্ধে ছেয়ে আছে। আর বুকটা ভরে আছে তৃপ্তিতে। বার বার নিজেকে নিজে বলছি—"মেরে দিয়েছ, এতদিনে পাবার মত কিছু পেয়ে গেছ।"

অনেক রাত্রে সেই ছাকড়া গাড়িই আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল যথাস্থানে। ইহজন্মের বাপ মা ভাই বোনরা যেখানে থাকতেন, যেটাকে তখনও নিজের বাড়ি বলে জানতাম, সেখানে পৌঁছলাম। কখন যে নেমে গিয়েছিলেন দিদি খেয়াল করি নি। খেয়াল করবার মত অবস্থাই ছিল না তখন, সেই রাতের বাকীটুকু আর পরের দিন বিকেল পর্যন্ত ঐ রকম বেখেয়াল অবস্থায় কাটল। সন্ধ্যার অনেক আগেই নতুন একখানা সিল্কের রুমাল নিয়ে চিত্তেশ্বরীর মন্দিরে উপস্থিত হলাম। যা কল্পনাও করতে পারি নি তাই ঘটে বসল। ফটকের সামনে দেখা হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে। একটি কৌপিন পরে আছেন, হাতে একটা কাঠের কমণ্ডলু ঝুলছে। ইশারা করলেন সঙ্গে আসবার জন্যে। পেছু পেছু চলতে লাগলাম।

ছাত্রিশ বছর আগে যে ঘটনা ঘটেছিল তা বলতে বসেছি। হয়তো ভুল হচ্ছে, হয়তো কিছু ছাড় পড়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই। খুঁটিনাটি সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারলে বলাটা সার্থক হত, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। প্রথম কারণ, খুঁটিনাটি সব কিছু ছত্রিশ বছর পরে মনে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কারণ, এবং এইটেই আসল কারণ, সেদিন সন্ধ্যার সময় বরানগরের কোন্ ঘাট দিয়ে গঙ্গায় গিয়ে নেমেছিলাম সেই মহাপুরুষের সঙ্গে তাও খেয়াল করি নি। এইটুকুই শুধু মনে পড়ছে যে একটা ঘাট দিয়ে গঙ্গার জলে নেমেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে একখানা পানসি এগিয়ে এসেছিল সামনে। উঠে পড়েছিলাম তাঁর সঙ্গে সেই পানসিতে। আর একটি মাত্র মানুষ ছিল সেই পানসিতে, বৈঠে হাতে নিয়ে বসেছিল। আমরা উঠে মাঝখানে বসলাম, তারপর পানসি মাঝগঙ্গায় এগিয়ে গিয়েছিল।

এখন যা বলতে যাচ্ছি বা বলবার চেষ্টা করছি, সেটা অসংলগ্ন প্রলাপ হয়ে দাঁড়াবে এ আমি জানি। যুক্তিতর্ক এই কাহিনীর ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না। সুতরাং এটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নয়, এটাও আমি অকপটে মানছি। তবু এটা শোনাতেই হবে। পূর্বজন্মে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, কি করেছি, কি করি নি, বিলকুল জানা হয়ে গেল আমার। আস্ত একটা জীবন, বাপ মা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র পরিজন সবাই জুটল, জন্ম থেকে মৃত্যু সমস্তই ছায়া-ছবির মত ঘটে গেল চোখের সামনে। উত্তেজনা আনন্দ শোক দুঃখ সমস্তই মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে গেল—ঐ আমি! তার প্রমাণ কোথায়!

নাম পেলাম, ঠিকানা পেলাম, সবই পেলাম। কিন্তু তাতে কি গেল এল! সেই নাম-ঠিকানায় খোঁজ নিলে নিশ্চয়ই জানা যেত যে অমুক নামের লোকটা সেই বাড়ির বড় ছেলে ছিল বটে এবং সেই বড় ছেলে তার স্ত্রী পুত্র রেখে জোয়ান বয়েসে মারাও গিয়েছে বটে। সেই মরে যাওয়া লোকটার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে দেখেও আসা যেত। কিন্তু

তবু তো ঐ প্রশ্নটাই থেকে যাচ্ছে। সেই বড় ছেলে, সেই'বড় বউয়ের মরা স্বামী, সেই পিতৃহীন ছেলেমেয়েদের মরা বাপ যে ইহজন্মে এই আমি, এটা কি করে সঠিক প্রমাণ করা যাবে! সেই আমি, মরে এই হয়ে জন্মেছি, এটার বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ কোথায়!

যাক, ও ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। অনেক দিন পরে ঘুরতে ঘুরতে একটা গ্রামে দু-তিন রাত কাটাতে হয়েছিল। অনেকবার গ্রামটার নাম শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আরে এই তো এসে পড়েছি ঠিক ঠিকানায়! খোঁজ নিয়ে জানলাম, হ্যাঁ, ঐ গ্রামে চৌধুরীবাড়ি আছে বটে। গেলাম চৌধুরীবাড়িতে, চৌধুরীবাড়ির বড় ছেলের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে দেখাও হল। পঞ্চাশ পার হয়েছেন তিনি, উৎকট রকম ছুঁচিবাইগ্রস্তা মানুষ, স্পষ্ট দেখতে পেলাম হাতে পায়ে হাজা ধরে গেছে। অনেক পেড়াপীড়ি করার পর নবদ্বীপের রক্তবর্ণ লোমের কাপড় পরে হাত পাঁচেক তফাতে এসে দাঁড়ালেন। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা, জল মুখে দেন নি। কারণ ঠিকভাবে শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেন নি তখনও। ভয়ানক রকম বিরক্ত হয়ে প্রথমেই বলে বসলেন যে একটি পয়সা দিতে পারবেন না তিনি, আমার মত সাধু-সন্নেসী অনেক দেখেছেন, কোনও বুজরুকি তাঁর কাছে খাটবে না।

সবিনয়ে নিবেদন করলাম যে একটি পয়সা আমি তাঁর কাছ থেকে নিতে চাই না। এমন একটা সংবাদ তাঁকে দিতে চাই যাতে তাঁর আখেরে ভাল হবে।

সে পাত্রীই নয়, আখেরে ভাল হবার লোভ দেখাতেও বিন্দুমাত্র কাবু হলেন না।

তখন বললাম, গ্রামের ইতরভদ্র পাঁচজনের সামনেই চিৎকার করে বললাম, উনি যদি সত্যিই অমুক চৌধুরীর পরিবার হন তাহলে এখুনই যান ওঁর শোবার ঘরে। একখানা বড় আয়না আছে অমুক চৌধুরীর খাটের সামনে। সেই আয়নাটা নামিয়ে পেছনের টিনখানা

খুলে দেখুন কি আছে। আমি বসে রইলাম, যতক্ষণ না উনি দেখে এসে বলছেন যে কি আছে সেখানে ততক্ষণ নড়ছি না।

নড়লামও না এবং চৌধুরীবাড়ির বড় ছেলের বিধবা পত্নীটিও আমার সামনে ফিরে এলেন না। পরে সংবাদ পেয়েছিলাম যে দাঁত-বার-করা চৌধুরীবাড়ির অঙ্গে নতুন প্রলেপ পড়েছে। ছুঁচিবাইগ্রস্তা বিধবা মহিলাটি তাঁর মৃত স্বামীর নামে গ্রামেই একটি পাকা দালান তৈরী করে মাতৃমঙ্গল আশ্রম স্থাপন করেছেন। এবং যে বুজরুক সন্নেসীটি হঠাৎ এসে তাঁকে বিপুল পরিমাণ গুপ্তধনের হদিশ দিয়ে গেছে সে ব্যাটার পাত্তা লাগাবার জন্যে মুঠো মুঠো টাকা খরচা করছেন।

করুন গে তাঁর যা খুশি। আমি কিন্তু কিছুতেই নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে আগের জন্মে আমি সেই ছুঁচিবাইগ্রস্থা মহিলাটির ভাগ্যবান স্বামী ছিলাম। ওঁদের গুপ্তধনের সংবাদ আমাকে বলে দেওয়াটা বরানগরের সেই মহাপুরুষের পক্ষে এমন কি একটা অসম্ভব ব্যাপার! মোটেই নয়।

পূর্বজন্মটা সম্বন্ধে ধোঁকা লাগতে পারে, কিন্তু ইহজন্মটা! ইহজন্মে কবে কোথায় কি ঘটবে তাও যে জানিয়ে দিয়েছেন আমাকে। এবং অক্ষরে অক্ষরে সেগুলো ফলে যাচ্ছে।

সেদিন কিন্তু খুব একচোট মনে মনে হেসেছিলাম। সাধু হয়ে হিমালয়ে যাব, হিমালয়ে গিয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করে তপস্যা করব ইত্যাদি লম্বা ফিরিস্তি জানতে পেরে খুবই মজা লেগেছিল। আমি হব সাধু! তপস্যা করব!

কার তপস্যা করব!

এবং কি উদ্দেশ্যেই বা করব তপস্যা!

তখন তো বুঝতে পারি নি, নীলকণ্ঠের তপস্যা করতে হবে। হলাহল কণ্ঠে ধারণ করেছেন যিনি তিনি নীলকণ্ঠ। তপস্যা দ্বারা নীলকণ্ঠকে তুষ্ট করবার ফলে একদা আমারও মন বুদ্ধি বিবেক বিষে জরজর হয়ে যাবে এটা যে কল্পনায় আনতে পারি নি তখন।

ভবিতব্য অখণ্ডনীয়, কার সাধ্য রোধে তার গতি !’

আজ এতদিন পরে তাই বসেছি নীলকণ্ঠের পরিচয় দিতে। শুধু বিষ, শুধু হলাহল। মস্তকে যাঁর তুষার-কিরীট, অঙ্গের ভূষণ যাঁর গঙ্গা যমুনা অলকানন্দা, তিনি বিষের জ্বালায় জ্বলছেন। সেই জ্বলুনির শিখা বেরুচ্ছে তাঁর কপাল-নেত্র থেকে। সেই শিখার স্পর্শে ভস্ম হচ্ছে অসত্য। ভণ্ডামি আর ভাবপ্রবণতার যুগ শেষ, নির্মম বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় ঘটছে মানুষের। দেবত্ব এবং পিশাচত্ব দুটোই ধাপ্পা, পাপ পুণ্য অর্থহীন স্তোকবাক্য। যুগযুগান্ত ধরে ঐ হিমালয় তার সাক্ষী রয়েছেন। মানুষের আত্মম্ভরিতা হিমালয়কে টেক্কা দিতে চাচ্ছে।

হিমালয় আমার কাছে নীলকণ্ঠ। প্রায় তিন বছর মৌনব্রত, অজগর ব্রত এবং পঞ্চীব্রত অবলম্বন করে হিমালয়ের বুকে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। কি দেখেছি, কতটুকু জেনেছি, কি বুঝেছি, এতদিন পরে তার হিসাব মিলাতে বসলাম। এ হিসেব খাপছাড়া হতে বাধ্য, ত্রিশ বছর আগে যা ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেবার সাধ্য পিশাচের থাকতে পারে হয়তো, মানুষের নেই।

আমি মানুষ, মানুষ যা পারে যতটুকু পারে তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। মানুষ মানুষের পরিচয় দিতে পারে, পাষাণের জন্যে পাষাণের বুক ফাটতে পারে, মানুষের ফাটতে যাবে কেন! তাই নীলকণ্ঠের পরিচয় হল মানুষের পরিচয়, যে মানুষের অন্তরের বিষ হরণ করেন নীলকণ্ঠ। বিস্তর মানবমানবী ঐ নীলকণ্ঠের বুকে বাস করছে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই সংসারধর্ম পালন করছে, অল্প কয়েকজন করছে তপস্যা। প্রতি বছর বিস্তর মানবমানবী পুণ্য অর্জন করার বাসনায় হিমালয়ে তীর্থ করতে যায়। কি নিয়ে ফেরে! পুণ্য!

নীলকণ্ঠের অন্তরে কোথায় লুকিয়ে আছে পুণ্য তা একমাত্র ঐ নীলকণ্ঠই জানেন।

॥ ২ ॥

যার নাম পরমাত্মীয়। জিজ্ঞাসা করবে শুধু নাম আর ঠিকানা। এমনই কায়দায় জিজ্ঞাসা করবে যে চমকে উঠতে হবেই। মুখের কথায় অজানা অচেনা মানুষকে বশ করবার শক্তি কাকে বলে তা জানতে হলে দেবপ্রয়াগে গিয়ে ওখানকার পাণ্ডা মহারাজদের কাছে তালিম নেওয়া উচিত। আমার বন্ধু পাণ্ডা অমরনাথ বুলন্দরওয়ালে পাহাড় থেকে নেমে বম্বে দিল্লী কলকাতায় জীবনবীমার দালালি করে লাখ লাখ টাকা কামাতে পারত, দামী দামী মোটরে চড়ে বড় বড় হোটেলে পান-ভোজন করতে পারত, এমন কি একজন হুঁদে মন্ত্রী উপমন্ত্রী পর্যন্ত হতে পারত দেশ স্বাধীন হবার পরে। রঙ রূপ চোখের চাউনি অতি-সম্ভ্রান্ত জাতের চালচলন এবং সর্বোপরি সর্বাবস্থায় মিষ্টি কথা বলে মানুষকে কাবু করে ফেলবার সহজাত শক্তি, এতগুলো উপকরণ থাকলে হবে কি, অমরনাথ পাণ্ডা। বদরীবিশাল ছাড়া কিছুই বোঝে না। সোনা রূপা হীরে জহরৎ এন্তার আছে ঘরে, চোদ্দ পুরুষ পাণ্ডাগিরি করতে করতে বিপুল বিত্ত জমিয়ে রেখে গেছে। কোনও দিকে কোনও ভাবনা নেই। কিন্তু সব থেকেও কিছু নেই, হাহাকার বাসা বেঁধে রয়েছে মনের মধ্যে। গঙ্গা আর অলকানন্দার আর্তনাদ শুনতে শুনতে কাটাতে হবে জীবনটা। পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়, চোখের দৃষ্টি চারিদিকে বাধা পায়। অনেক ওপরে এক খাবলা আকাশ, ঐ এক খাবলা আকাশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। উদার উন্মুক্ত আকাশ, সেই আকাশের তলায় আকাশের মত বড় আদিগন্ত ধরণী, ধরণীর বুক জোড়া নদী, যার এ-কূলে দাঁড়িয়ে ও-কূলে নজর পৌঁছয় না, এই সব বিশাল ব্যাপার-গুলোর স্বপ্ন দেখে অমরনাথ। আর মনে মনে নিজের অদৃষ্টকে গাল পাড়ে।

বোধহয় ভুল করে ফেলেছে। আমার মত হাভাতেকে জিজ্ঞাসা করছে নাম ঠিকানা! আমাকেও কি যাত্রী ঠাওরাল নাকি!

রসিকতা করে ফেললাম। হলেনই বা পাণ্ডা, কিন্তু একদম সমবয়সী, রসিকতা করতে দোষটা কোথায়! বললাম—"শিকার পাকড়াবার আগে চোখ দুটো মেলে একটু দেখে নিও ঠাকুর। দেখেও বুঝতে পারছ না আমার জাতটা কি। আমার মত মাঙ্‌নে-খানে-ওয়ালাকে শিকার করে কি লাভ হবে তোমার? উল্টে দুবেলার ডালরুটি খসবে।"

হো হো শব্দে হেসে উঠল অমরনাথ, যারা স্নান করছিল গঙ্গা অলকানন্দা সঙ্গমে তারা পেছন ফিরে তাকাল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে অলকানন্দার আর্তনাদ ডুবে গেল হাসির প্রতিধ্বনির তলায়। তারপর নিজের মুখের ওপর হাত বুলিয়ে কালো টুপিটাকে মাথার ওপর আর একটু টিপে বসিয়ে দিয়ে অমরনাথ বললে—"ভুল করলে তুমি। তোমাকে আমার আস্তানায় তুলে ডালরুটি গেলাব এতটা বোকা পেয়েছ নাকি আমাকে। তারপর মৌকা পেলে আমার ঘরওয়ালীটিকে নিয়ে তুমি সটকাবে আর আমি এই পাহাড়ের গর্তে বসে বুক চাপড়াব। না, ততটা বেকুফ আমি নই।"

আধ বিঘত জিভ বার করে বললাম—"নারায়ণ নারায়ণ, এসব কথা কানে তুলতে আছে? দেখছ না আমি সাধু। কামিনী কাঞ্চন—রাম রাম—ঐ পাপ কথা দুটো কানে শোনাও মহাপাপ।"

"তাহলে মহাত্মাজী, এখন গা তুলুন এখান থেকে। ঘাটের ওপর বসে বসে ঐ কামিনীদের স্নান করা দেখে আর পাপ বাড়াবেন না।" বলতে বলতে অমরনাথ আমার ঝোলা আর কম্বল তুলে নিল। পেছন ফিরেও তাকাল না, টপাটপ সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে গেল।

অগত্যা গা তুলতে হল। গাড়োয়ালে খাঁটি গাড়োয়ালীর ঘরে সর্বপ্রথম আশ্রয় পেলাম। বুলন্দরওয়ালে অমরনাথ যে ঘরে আশ্রয় দিল তার এক হাত লম্বা পৌনে হাত চওড়া বাতায়নের ফাঁক দিয়ে

নীলকণ্ঠের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে কয়েকটা দিন কাটল। অতটুকু ফোকরের ভেতর দিয়ে সুবিশাল নীলকণ্ঠের কতটুকু পরিচয়ই বা পাওয়া যায়! গঙ্গার ওপারে জঙ্গল, যতদূর মনে পড়ছে সেই জঙ্গলের নাম বলগোনা ফরেস্ট, মহামান্য সরকারের দ্বারা সংরক্ষিত অরণ্য, যেখান থেকে রেল লাইনের তলার কাঠ যোগান দেওয়া হয়, সেই মহামূল্য সম্পত্তি দিনরাত আঁধারে ডুবে আছে। পাহাড়ের চূড়ার আড়াল থেকে এক আধবার উঁকি দেন সূর্যদেব, একটু আধটু আলো স্পর্শ করে বলগোনা অরণ্যকে। তাতে তো আর আঁধার ঘোচে না। আলো নেই উত্তাপও নেই অরণ্যের বুকে, আছে শুধু লালসা, সোনার লালসা। গাছ কেটে মাফ মত টুকরো করে গড়িয়ে নামিয়ে দেওয়া হয় গঙ্গায়, মা গঙ্গা বহে নিয়ে যান সেই কংখলের খালে। সেখানে লোহার তার দিয়ে বানানো জালে গিয়ে আটকায় টুকরোগুলো। তখন তাদের তুলে নিয়ে গাড়ি বোঝাই করে পাচার করে দেওয়া হয়। ফলে বলগোনা অরণ্যের বুকে ফিরে আসে সোনা, কাঠের বদলে সোনা, সোনার অরণ্য বলগোনা, মানুষের সোনার লালসা মেটায়।

মেটাতে কি পারে! সোনার লালসা কি মেটে!

অমরনাথের ক্ষুদ্র বাতায়নপথে সোনার অরণ্য বলগোনার অন্ধকার রহস্য হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। কিন্তু পালাবার উপায় নেই। যেন বন্দী করে রেখেছে, ঘরের বাইরে পা বাড়ালেই সঙ্গে সঙ্গে চলল, কিছুতেই চোখের আড়াল হতে দেবে না।

শেষ পর্যন্ত রেগে গিয়ে একদিন বললাম—"কি চাও তুমি বল তো? তোমার সঙ্গে জীবন কাটাবার জন্যে সংসার ছেড়ে এসেছি নাকি?"

বদরীনারায়ণের পাণ্ডা রাগতে জানে না। অনেকটা জিভ বার করে অমরনাথ বলল—"নারায়ণ নারায়ণ, ও রকম কথা কি ভাবতে পারি আমি। কিন্তু কেন যে সংসার ছেড়ে উঠে এলেন এই পাহাড়ী রাজ্যে তাই যে বুঝতে পারছি না। খুনখারাপি বা চুরিচামারি

করে পালিয়ে এসেছেন তাও যে মনে হচ্ছে না। কোনও এক খুব-সুরতীয়ার জন্যে বিবাগী হয়েছেন কি! উঁহু, তাও নয়। তবে!"

কোনও রকমে হাসি চেপে বললাম—"কি করে বুঝলে যে কোনও খুবসুরতীয়ার জন্যে বিবাগী হই নি আমি?"

জিভ তালুর সঙ্গে ঠেকিয়ে অদ্ভুত একটু শব্দ করল অমরনাথ চুকচুক চুকচুক, সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে দোলাতে লাগল। পরমবিজ্ঞের মত বলল—"ঠিক যে কারণটির জন্যে বুঝতে পেরেছিলাম যে মহাত্মাজী একেবারে আনকোরা। মেয়েরা যেখানে গা খুলে স্নান করছে, তার চার সিঁড়ি ওপরে কোনও পাকা মহাত্মা কিছুতেই পাকা বেকুবের মত হাঁ করে বসে থাকবে না। যে মানুষ ঐভাবে বসে থাকতে পারে, তার কাছে মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ সমান। কোনও খুবসুরতীয়া যদি চিবিয়ে বসত মাথাটা, তাহলে মেয়েমানুষ সম্বন্ধে খানিকটা হুঁশজ্ঞান থাকত।"

"দেখ অমরনাথ," ভয়ানক গম্ভীর চালে শুরু করলাম—"ঐসব বাজে কথা থাকুক, তোমার মতলবটা কি তাই আমি জানতে চাচ্ছি। কাল খুব ভোরে আমি যাত্রা করছি, হপ্তাখানেকের ভেতর যেভাবে হোক উত্তর-কাশীতে আমি পৌঁছতে চাই। তোমার ঘরে বসে ডালরুটি গেলবার জন্যে এখানে আমি আসি নি। আমাকে গুরু খুঁজতে হবে।"

"কেন! আমাকে পছন্দ হচ্ছে না কেন! বদরীনারায়ণের পাণ্ডা, ব্রাহ্মণের ছেলে, আজন্মকাল দেবপ্রয়াগের মত জায়গায় বাস করছি। আর কি কি গুণ আপনি চান মহারাজ!" বলে অমরনাথ একটা লম্বা শ্বাস ছাড়ল। তারপর নিজের কপালে একটা চাঁটি মেরে বলল—"একেই বলে নসিব, উপযুক্ত চেলা মেলা আমার নসিবে নেই। একেই আপনার বাঙলা দেশে বলে পোড়া কপাল।"

হাসাবেই, না হাসিয়ে কিছুতে ছাড়বে না। ওর গুরুগম্ভীর মুখ-পানে তাকিয়ে হো হো শব্দে হেসে উঠলাম।

অমরনাথ হাসল না। খাঁটি আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—"সত্যি বলুন না, কি খুঁজতে এসেছেন এখানে? যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তারা এখানে মরতে আসে কেন? যদি বলেন হিমালয় দেখতে এসেছেন তাহলে এ ভাবে আসবার মানে কি? টাকাকড়ি বিছানা-পত্র লটবহর সঙ্গে আনা উচিত ছিল। যারা জম্মু-হাভাতে তারা কলকে সম্বল করে সাধু হয়, গাড়োয়ালে তাদের নাম ফক্কড়। মুরোদ নেই রোজগার করে খাবার, তাই ঐরকম লক্ষ্মীছাড়া হয়ে জীবন কাটায়। কান ফুটো করে নাথ হয়ে গেল বা তুলসীদাস খানিকটা মুখস্থ করে কপালে থার্ড ক্লাস এঁকে রামায়েত বলে পরিচয় দিতে লাগল।"

"কপালে থার্ড ক্লাস এঁকে!" আকাশ থেকে পড়লাম একেবারে।

অমরনাথ বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। রামায়েতরা লম্বা তিনটে দাঁড়ি আঁকে কপালে, রেলগাড়ির থার্ড ক্লাস কামরার গায়ে যেমন আঁকা থাকে, তাই ওদের নাম থার্ড ক্লাস। তারপর খুবই সম্ভ্রমের সঙ্গে জানতে চাইল কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু আমি।

আসল কথাটাই বলে ফেললাম—"কোনও সম্প্রদায়েই এখনও মাথা মুড়োই নি ভাই, খুঁজতে বেরিয়েছি।"

"খুঁজে বার করবে গুরুকে!" কালো টুপির নিচে অনেকগুলো খাঁজ পড়ল অমরনাথের কপালে। দস্তুরমত মাস্টারমশাই স্টাইলে জিজ্ঞাসা করল—"চিনবে কেমন করে? আসল নকল চেনবার ক্ষমতা আছে তোমার? নিজেকে বেশ বড় জহুরী ঠাওরেছ দেখছি! হরিদ্বার হৃষীকেশ ছাড়িয়ে দেবপ্রয়াগ চলে এসেছ। কত শত সাধু-মহাত্মা পড়ে রইল পথে। তাদের ভেতর কাউকে পছন্দ হল না বুঝি? নিশ্চয়ই তাদের মেকী মাল বলে মনে হল?"

ভেবেচিন্তে জবাব দিলাম—"আসল মেকী কিছুই মনে হয় নি ভাই। আসল কথা কি জান, আসল মেকী চেনবার ক্ষমতাও নেই আমার। মানে, হরিদ্বার হৃষীকেশ, হাঁ তা অনেক মহাত্মাকে দর্শন

করলাম বটে, কিন্তু ঐ যে কি বলে না, মন আটকে যাওয়া, কোথাও মন আটকাল না।"

কপালের কোঁচগুলো মিলিয়ে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বুলন্দরওয়ালে অমরনাথ বলল—"আটকাবেও না কোথাও তোমার মন। তার কারণ হচ্ছে তোমার মত মানুষ নেকামো সহ্য করতে পারে না। ধাপ্পা তোমাকে দিতে পারবে অনেকে, অনেক জায়গায় মন তোমার আটকেও যাবে। কিন্তু ঐ যে বললাম না—নেকামি—ঐটে শুরু হলেই আর রক্ষে নেই, তুমি কেটে পড়বে। আর নেকামি রোগটাই হচ্ছে সাধু-সন্ন্যাসীদের সব চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাধি। নেকাপনা সম্বল করে ওঁরা বেঁচে আছেন। যাক, আর আমার ভয় নেই তোমার জন্যে। ছেড়ে দোব তোমাকে, পথটা খুলুক, চটিওয়ালারা বসুক, নয়ত না খেয়ে মরবে যে। আর বড় জোর দিন পনরো, তারপরই তুমি যাত্রা করবে। উত্তরকাশী পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই এখানে যাত্রী এসে পড়বে।"

অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। মাথার ভেতর তখন উত্তরকাশী বাসা বেঁধেছে। একবার পৌঁছতে পারলে হয় উত্তরকাশী। সেখানে বড় বড় সাধু-মহাত্মা কত আছেন।

সত্যি কথা বলতে কি প্রায় একদৌড়ে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম। পালাতে হবে, যেন তেন প্রকারেণ চেনা-জানা পৃথিবীর খপ্পর থেকে নিস্তার পাওয়া চাই। তাই হরিদ্বারে থামলাম না, হৃষীকেশে থামলাম না, দিন তিনেক উদয়-অস্ত হেঁটে দেবপ্রয়াগে পৌঁছে গেলাম। যাত্রা তখনও শুরু হয় নি, মাঘের শেষ বা ফাল্গুনের শুরু। বেশ মনে পড়ছে, কাশী থেকে যেদিন বেরুই সেদিন গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে লোকে গঙ্গার ঘাটে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছিল। কাশী ছাড়বার সাত-আট দিন পরেই দেবপ্রয়াগে উপস্থিত। সঙ্গে খান দুয়েক পাঁচ হাতি কাপড় আর একখানা প্রমাণ মাপের খদ্দরের

চাদর। সবই গেরুয়ায় ছোপানো, গেরুয়া পরেই কাশীবাস করছিলাম। তাই নতুন করে আর একবার সাধু হবার জন্যে হৃষীকেশে হরিদ্বারে থামতে হয় নি। হরিদ্বারে কালীকম্বলী ছত্র থেকে একখানি ছোট্ট বই পেয়েছিলাম, ইংরেজীতে পথের নির্দেশ ছিল তাতে। এক চটি থেকে আরেক চটির দূরত্ব কত, চড়াই ওতরাই কোথায় কেমন আছে, ধর্মশালা কোথায় কোথায় আছে, ধর্মশালায় কি কি পাওয়া যায়, এমন কি পথ চলতে চলতে তেষ্টা পেলে কোথায় কোথায় পানীয় জল পাওয়া যাবে তাও লেখা ছিল সেই ছোট্ট পুঁথিতে। আরও যা ছিল তা হচ্ছে ধনকুবের শেঠজীদের নাম ঠিকানা পরিচয়। কোন্ শেঠজী কত টাকা দান করে কোন্ ধর্মশালাটি বানিয়ে দিয়েছেন, কোন্ পুলটি তৈরী করতে কোন্ শেঠজীর কত টাকা খসেছে, বিলকুল সবিস্তারে বলা হয়েছে। ওজন হবে বড় জোর আধ ছটাক, সেই আধ ছটাকী পুঁথির দৌলতে পথ ঘাট একদম জলবৎ তরলং বলে মনে হয়েছিল। দেবপ্রয়াগ পৌঁছতে পৌঁছতেই ভুলটা ভাঙল। কিন্তু তখন তো আর ফেরবার উপায় নেই।

কেন নেই ?

অতি সঙ্গত জিজ্ঞাসা। এবং ঐ অতি সঙ্গত প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তরই দিতে পারা যায়। সেটি হল, ফিরব কোথায় ? ফেরবার জায়গা থাকলে তো ফিরব। ঘর বলতে যা বোঝায়, আত্মীয়স্বজনের টান, যার ভাল নাম হল সংসার-বন্ধন, সে বন্ধনটা এমনই পলকা ছিল, যে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে ছিটেফোঁটা কষ্ট করতে হয় নি। একদম বিনা অজুহাতে এক দিন বেরিয়ে এসেছিলাম যে ঘর ছেড়ে, সে ঘরের দরজায় ফিরে গিয়ে দাঁড়াবার বাসনা একটি বারের জন্যেও মনের কোণে উদয় হত না। রোগটা তখন প্রায় ধরে ফেলেছি—অসন্তুষ্টি। আরও ভাল করে বলতে গেলে বলা যায়, কোনও কিছুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার অক্ষমতা। ঘর বাড়ি সমাজ আত্মীয়স্বজন, যেখানে জন্মেছিলাম যাদের মাঝে বড় হয়ে উঠেছিলাম, তাদের সঙ্গে একদম

মিল নেই। তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থহীন তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার, যে ব্যাপারগুলোর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে গেলে শুধু হাসিই পেত। মনে হত, আহা বেচারা বেচারীরা! বেশ আছে, খাচ্ছে ঘুমোচ্ছে খেয়োখেয়ি করছে। ভাবতেই পারে না, বিপুল বিশ্বের অন্তরে কি পরিমাণ রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। কি সেই রহস্য? তা কি ছাই আমিই জানতাম? জানা হয়ে গেলে রহস্য আর রহস্য থাকবে কেমন করে। সেই অজানা রহস্যই হল মূল ব্যাধি, ঐ ব্যাধির সব থেকে বড় লক্ষণ হল অসন্তুষ্টি, যে অসন্তুষ্টি শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে পথে নামালে। এটা কি একটা অজুহাত হল? অসন্তুষ্টির কারণটি সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলে অজুহাত খাড়া করা অসম্ভব। তাই বলছিলাম—বিনা অজুহাতে একদিন বেরিয়ে এসেছিলাম যে ঘর ছেড়ে, ফিরে গিয়ে সে ঘরের দরজায় দাঁড়াই কেমন করে। দাঁড়ালেই যে দরজা খোলা পাব সে নিশ্চয়তা কোথায়!

এতক্ষণে সঠিক কথাটি বলা হল। ঐ অনিশ্চয়তা, প্রতি মুহূর্তে নতুনের সঙ্গে মুখোমুখি হবার বাসনা, সদা সর্বক্ষণ চরম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় যে বাসনার জন্যে, ঐ অনিশ্চয়তার আকাঙ্ক্ষা ঘরে ফিরে গেলে মিটবে কেমন করে!

ত্রিশ বছর আগে অনিশ্চয়তার আকর্ষণে ঘর ছেড়েছিলাম। নীলকণ্ঠের অন্তরে নিশ্চয়তা বলতে কিছুই নেই, ঐ জাতের একটা ধারণা কি জানি কেন বাসা বেঁধেছিল মগজে। কালীকম্বলীর আধ ছটাকী পুঁথি সে ধারণাটির মাথা খেয়ে দিল। বাঁধা রাস্তা, মাইল-স্টোন দিয়ে হিসেব করা মাপা পথ, পদে পদে চটি ধর্মশালা ছত্র, পুলিস ডাক্তার রাস্তা বাঁধাবার এঞ্জিনিয়ার এবং তস্য সাঙ্গপাঙ্গগণ, তারপর অগুণতি দোকানদার, গিসগিস করছে থুকথুক করছে যেখানে সেখানে অনিশ্চয়তা তিষ্ঠোতে পারে কখনও! কাব্যি-রোগাক্রান্তরা হয়তো নীলকণ্ঠের রূপে মজে গিয়ে প্রলাপ বকতে পারেন, পুণ্যলোভাতুর যাঁরা তাঁরা দেবভূমির মাহাত্ম্যে জরজর

হাপুস নয়নে বুঁদ হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু আমি কি নিয়ে বসে থাকি দেবপ্রয়াগে?

বন্ধুবর অমরনাথ বোধ হয় সঠিক রোগটি ধরতে পারল। এক অভিনব প্রস্তাব পেশ করে বসল একদিন। কলকাত্তাওয়ালী কালী আছে দেবপ্রয়াগে, কালী দর্শন না করে কি দেবপ্রয়াগ ছাড়া যায়!

কিছুতেই নয়।

দেবপ্রয়াগের সবচেয়ে বড়মানুষ দেবতা রঘুনাথজী। যাঁরা তীর্থ করতে আসবেন, তাঁদের অতি অবশ্য দর্শন করতে হবে। আমি তীর্থ করতে আসি নি, তাই দর্শনের গরজ ছিল না। কলকাত্তাওয়ালী কালী দেখতে গিয়ে রঘুনাথজীকেও দর্শন করতে হল। রঘুনাথজীর পর ক্ষেত্রপাল।

ক্ষেত্রপাল! মন্দিরের সামনে পৌঁছে গুরুগম্ভীর স্বরে শুরু করে দিলাম—

ওঁ চঞ্চৎকপালসুকৃপাণসশূলদণ্ডমুচ্চড্‌ডমড্‌ডমরুমণ্ডিতপাণিদণ্ডম্‌।
নীলাঞ্জনপ্রচয়পুঞ্জমিব প্রসন্নং শ্রীক্ষেত্রনাথকমহং ভজামি॥

অনেকগুলো ড, প্রত্যেকটি ড একটু সজোরে উচ্চারণ করার ফলে সেই নির্জন পাহাড়ী জঙ্গলে সত্যিই যেন ডমরু-ধ্বনি শোনা গেল। মস্ত বড় বড় চোখ করে অমরনাথ আমার মুখপানে তাকিয়ে রইল। ধ্যান শেষ করে মিনিট দুয়েক চোখ বুজে থেকে বললাম—"বলি দাও, ক্ষেত্রনাথকে বলি দিতে হয়।"

সভয়ে জবাব দিল অমরনাথ—"এখানে তো বলি হয় না মহারাজ।"

"বলি মানে ছাগল মেষ মানুষ কাটা নয়, বলি কথাটার অর্থ হচ্ছে পূজার উপকরণ। কালীর জন্যে যা নিয়ে চলেছ তার থেকে খানিকটা এখানে বলিদান দিয়ে যাও, নয়ত মা তোমার পূজা গ্রহণ করবেন না।"

চাট্টি শুখনো কিসমিস পেস্তা বাদাম এক ঠোঙা এলাচদানা সিন্দূর ধূপ আর ফুল বেলপাতা নিয়ে যাচ্ছিল কালীর পূজা দিতে।

অর্ধেকটা ক্ষেত্রপালের দরজায় নামিয়ে দিল। বাঁ হাত মুঠো করে ঐ হাতের তর্জনী সোজা রেখে বলি স্পর্শ করে বলতে লাগলাম—

ওঁ নগ্নত্বং মুক্তকেশং রবিশশিনয়নং পিঙ্গলং কেশভারং হস্তে দণ্ডং প্রচণ্ডং অলিপিশিতযুতং বামহস্তে কপালং। ক্রীড়ন্তং মাতৃচক্রে কহকহহসিতং নাদগম্ভীরঘোরং
রক্তাক্ষং সিদ্ধনাথং প্রহসিতবদনং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্॥ ওঁ ক্ষাঁ ক্ষীঁ ক্ষূঁ ক্ষৈঁ ক্ষৌঁ ক্ষঃ
হুঁ স্থান ক্ষেত্রপাল মুকুটখর্পরমুণ্ডমালাবিভূষণ মহাভীমরূপধর বর্ষকেশ জয় জয় দিগম্বর
মহাভূতপরিবার সংত্রাসকর অগ্নিনেত্র মদ্যপানমদোন্মত্ত ত্রিশূলায়ুধ শৃঙ্গীবাদনতৎপর
এহি এহি মম সর্ব্ববিঘ্নং নাশয় সর্ব্বোপচারসহিতং ইমং বলিং গৃহাণ হুঁ ফট স্বাহা ক্ষাং
এষ বলি ক্ষেত্রপালায় নমঃ।

বলিদান নিবেদন করে ভক্তিভরে প্রণাম করলাম ক্ষেত্রপালকে—

যোঽস্যক্ষেত্রনিবাসী চ ক্ষেত্রপালস্য কিঙ্করঃ। প্রীতোঽস্তু বলিদানেন সর্ব্বরক্ষাং করতু মে॥

অমরনাথও প্রণাম করল। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই বললাম—"চল এবার, মা কালী দর্শন করে আসা যাক।"

"প্রসাদ—" বলিদানের উপকরণগুলোর দিকে ইশারা করলে অমরনাথ।

"পড়ে থাকবে ঐখানেই। পূজা দেওয়া এবং বলিদান দেওয়ার ভেতর তফাৎ ঐটুকুই। পূজার প্রসাদ নেওয়া যায়। বলিদান দিলে সেটা প্রসাদ হয় না।" বলে পেছন ফিরলাম।

জঙ্গল শুরু হল। ভয়ঙ্কর জঙ্গল, পথ নেই বললেই চলে। থাকলেও তখনও তা পরিষ্কার করা হয় নি। অমরনাথ সামনে এগিয়ে এল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চড়াই ভেঙে উঠতে লাগলাম। বেলা

তখন দশটা বা এগারটা, হলে হবে কি, জঙ্গলের ভেতর তখনও ভোর হয় নি। অন্ধকার ঘাপটি মেরে রয়েছে।

মুখ টিপে চলেছি দুজনে। বেশ বুঝতে পারছি কি যেন ভাবছে অমরনাথ, গুরুতর কিছু ভাবছে। খুব সম্ভব আচমকা ঐ কটমট সংস্কৃত শোনার দরুণ হকচকিয়ে গেছে। গুরুকুল থেকে কষে সংস্কৃত শিখে এসেছে বুলন্দরবাসী যজমানদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার জন্যে, ক্ষেত্রপালের ধ্যান মন্ত্র বলিদানের মন্ত্র প্রণাম মন্ত্র বুঝতে একটুও ওর কষ্ট হয় নি। আমার মুখ থেকে সংস্কৃত মন্ত্র বেরুবে এটা নিশ্চয়ই আশা করে নি। তাই বোধ হয় অমন ভাবে হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

বেশ মজা লাগল। হরদম ঠাট্টা ইয়ারকি করছিলে জাদু, এখন কেমন বুঝছ! ভাগ্যে কাশীতে রহস্য পূজার মন্ত্রগুলোও ঝাড়া মুখস্থ করেছিলাম, এতদিন পরে সত্যিকারের একটা কাজে লেগে গেল। এই পাহাড়ের গর্ভে বাস করে ঐসব সাংঘাতিক মন্ত্র কখনও শুনতে হয় নি বাছাকে। এইবার বোঝ, কতখানি এলেম পেটে পুরে তবে তোমাদের ঘাড় মটকাতে এসেছি।

কে কার ঘাড় মটকায়! কালীর মন্দিরে পৌঁছবার আগেই অমরনাথ বলল—"খুবই অপরাধ হয়ে গেল মহারাজ। আপনি কৌল তা তো বুঝতে পারি নি। জানতে পারলে কারণ নিয়ে আসতাম।"

"কারণ!"

"জী হাঁ, আমরাও কৌল কি না।"

আর একটি মাত্র প্রশ্ন করা বাকী ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—"কোন কুল?"

অমরনাথ জবাব দিল—"শ্রী।"

তখন দেখা দিলেন খোদকর্তা শ্রীকৌশিকী নাথ শর্মা, অমরনাথের জেঠামশাই। বয়েস হয়েছে, দেহযষ্টিখানি ধনুকের মত বেঁকে গেছে। গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখে প্রছন্ন কৌতুকের আলো, খুব

মোটা দুধের মত সাদা এক জোড়া ভুরুর আওতায় ভাসমান চক্ষুদুটিতেও ভাবনা-চিন্তার লেশমাত্র নেই। গরদের ধুতি চাদর পরে তার ওপর খুব দামী কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে উপস্থিত হলেন। গেরুয়া পরা একটা বাঙালী ছোকরাকে পাকড়াও করে এনে শ্রীমান ভাইপো ডালরুটি গেলাচ্ছে, সংবাদটি তাঁর কানে পেঁাছেছিল। ওরা অমন কত লোককে আনে, কিছুদিন সেবাযত্ন করে, তারপর যার যেখানে ঠিকানা চলে যায়। তাই এসব ব্যাপার নিয়ে কর্তারা কেউ মাথা ঘামান না। কিন্তু গতকাল রাত্রে সংবাদ শুনে মাথা ঘামাতে বাধ্য হলেন। কৌলের সংসারে কৌলের পদধূলি পড়েছে, অহো কি সৌভাগ্য! অতএব এখন কৌলচিত আচার-অনুষ্ঠান-পূর্বক আর এক প্রস্থ সেবাযত্ন শুরু করতে হবে।

রক্ষে কর মা!

সবিনয়ে নিবেদন করলাম গুরু যা আদেশ করেছেন। ব্রহ্মমন্ত্র দিয়ে বলেছেন।—

তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর॥

অর্থাৎ সুখে বিচরণ করতে হবে। এক জায়গায় বসে ডালরুটির শ্রাদ্ধ করলে চলবে না।

কৌশিকীনাথ যাকে বলে পহেলা নম্বর সমঝদার শ্রোতা। ঘন ঘন মাথা নেড়ে কেয়াবাত কেয়াবাত করে উঠলেন, অমন একটা লাগসই কথা যেন জীবনে শোনেন নি। তারপরই কিন্তু উল্টো চাল চাললেন। ফিসফিস করে বললেন—"কিন্তু গুরু, আমারও তো আচার পালন করা চাই। আমি সংসারী, গুপ্ত কৌল, সংসারে কৌলের পদধূলি পড়েছে, ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠান যে করতেই হবে।"

বল্লেই দু চোখ বুজে শুরু করলেন—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥"

অতঃপর রফা হল। আরও তিন রাত থাকতে রাজী হলাম। তিন রাত চক্রানুষ্ঠান হবে। কিন্তু আমাকে শোনাতে হবে সব। হিমালয়ের ভেতরে কৌলধর্ম কবে এল, কোথা থেকে এল, কে নিয়ে গেলেন, সমস্ত আমি জানতে চাই।

তথাস্তু তথাস্তু। কৌশিকীনাথ সব রকম শর্তেই রাজী।

ব্রহ্মযজ্ঞ। ব্রহ্মানলে আহুতি দেবার জন্যে অতি পবিত্র কারণ, সুদূর স্কটল্যাণ্ড থেকে বোতলে ভরে এসে যে কারণ জাহাজ থেকে নামে বম্বাই কলকাতা বন্দরে, সেই কারণ হরিদ্বার হৃষীকেশ লছমনঝুলা টপকে দেবভূমি দেবপ্রয়াগে সমুপস্থিত হয়েছে, এটা কল্পনা করতে পারি নি। কিন্তু সমস্তই গুপ্তাচার। স্বয়ং রামচন্দ্রজী সাক্ষাৎ সীতা দেবীকে পাশে নিয়ে গঙ্গা অলকানন্দ সঙ্গমে জাঁকিয়ে বসে আছেন। আসমুদ্র ভারত থেকে বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসেন নারায়ণ আর কেদারনাথ দর্শন করতে, ঢেলে দিয়ে যান সোনা-দানা-ধনদৌলত। সবাই জানেন তীর্থগুরু পাণ্ডা মহারাজরা হয় পরম বৈষ্ণব কিংবা পরম শৈব। আর ঐ ওপরে বসে আছেন শ্রীরামচন্দ্রজী, যিনি হলেন পাণ্ডাকুলের আরাধ্য দেবতা। সুতরাং গুপ্তাচার পালন করবার পক্ষে দেবপ্রয়াগের মত অনুকূল স্থান আর আছে কোথায়?

অতীব গুরুগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠান শুরু হল। কিন্তু শক্তি কই! একমাত্র ঐ বোতলআশ্রিতা প্রথম তত্ত্বটি ছাড়া আর সবই অনুকল্প, সৈন্ধব লবণ আর আদার কুচি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তত্ত্ব মাংস মৎস্য হরিদ্বার থেকেই নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণের সংসারে ঐ দুই অস্পৃশ্য দ্রব্য প্রবেশ করেছে, এই রকম ব্যাপার কেউ কল্পনা করতেই পারে না। চতুর্থ তত্ত্ব মুদ্রার দর্শন পাওয়া গেল, লঙ্কা মেশানো ছোলা ভাজা রূপে চক্রে উপস্থিত হলেন। পঞ্চম তত্ত্বের অনুকল্প রক্তচন্দন, রক্তচন্দনের সঙ্গে কুঙ্কুম তো যথেষ্ট পরিমাণে মেশানই হয়েছে। তাহলে আর বাকী থাকল কি?

না সত্যিই কিছু বাকী রইল না। নিষ্ঠা ভক্তি, যথাযথ সুরে পাঠক উচ্চারণ করে মন্ত্রপাঠ, হিমালয়ের বুকে নিশীথের নিষ্করুণ আর্তনাদ সমস্ত মিলে মিশে কালশক্তি কালীর রহস্যপূজা ষোল আনা সফল করে তুলল। পঞ্চম পাত্রের পর চক্রেশ্বর কৌশিকীনাথ শান্তিস্তোত্র পাঠ করলেন—

ওঁ পাহি ত্বং করুণাময়ি প্রিয়তমং সৎসাধকং রক্ষতু ভ্রষ্টান্নাশয় নাশয় প্রিয়তমাবক্ত্রারবিন্দং ময়া।
নিত্যং দেহি সাধুং সুধাচয়ময়ীং সিদ্ধিং শিবে সিদ্ধিদং জ্ঞানং মোক্ষবিধায়কং কুরু শিবে সংহারিণী পাশবে ॥

সবই দেখলাম শুনলাম। কিন্তু কেমন যেন একটু খটকা বেধে রইল মনের মধ্যে। এইটুকুই কি সব? গুপ্তাচার বলতে যা বোঝায় তা বোধহয় গুপ্তই রয়ে গেল আমার কাছে। বাইরের ঐ অনুষ্ঠানটুকু সম্বল করে কৌশিকীনাথের মত মানুষরা সন্তুষ্ট হয়ে আছেন? কৌশিকী-নাথের মত আরও চারজন কৌলকে দেখলাম। জ্ঞান বুদ্ধি চৈতন্য যেন প্রদীপ-শিখার মত জ্বলছে সকলের চোখে, জ্যোতিষ্মান্ আনন্দে ডুবে আছেন সকলে। ভয় ডর হাহাকারকে সমূলে নাশ করবার পর মানুষ ঐরকম আনন্দস্বরূপ হয়ে যায়। মহাশক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ঐ অবস্থাটা হতে পারে না। কেবল-মাত্র ব্র্যাণ্ডি হুইস্কির দৌলতে কেল্লাফতে করে ফেলেছেন এঁরা, এটাই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

কৌশিকীনাথকে চেপে ধরলাম পরদিন। উনি সাড়ম্বরে আনন্দ-ভৈরবের ধ্যান আওড়াতে লাগলেন। থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"ওতে কি হবে? ও আমার মুখস্থ আছে। হসক্ষমলবরযূঁ আনন্দভৈরবায় বষট্ আর সহক্ষমলবরযীঁ আনন্দভৈরব্যৈ বৌষট্ মন্ত্র দুটো আমিও কমসে কম হাজার বার উচ্চারণ করেছি। কিন্তু তাতে কি? আনন্দের ছিটেফোঁটাও তো এ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না।"

আলটপকা এসে পড়ল সেই পুরনো কাসুন্দি, সেই মূলাধারে

ত্রিকোণে ঘুমিয়ে আছেন যে কুলকুণ্ডলিনী তাঁকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। থাক, হয়েছে। সুষুম্না পর্যন্ত পৌঁছতে দিলাম না। থামিয়ে দিয়ে বললাম—"পচে গেছে কান, ঐ একঘেয়ে কপচানি শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। আপনারাও তাহলে ঐ ষট্‌চক্রের ফেরে পড়ে পাক খাচ্ছেন! উত্তম কথা, অতি সুপবিত্র সনাতন পন্থা ঐ ষট্‌চক্র। কিন্তু ষট্‌চক্রের পাকে বোতল বোতল অতি মূল্যবান ব্র্যাণ্ডি হুইস্কি কেন গচ্চা দিচ্ছেন সেটাই যে মাথায় ঢুকছে না!"

ভাইপো অমরনাথকে কি যে হুকুম দিলেন কৌশিকীনাথ বলতে পারব না। পরদিন সকালেই অমরনাথ আমাকে রওয়ানা করিয়ে দিল। কুটকুটে নয় এমন দুখানি কম্বল, লোহা-বাঁধানো পাঁচ হাত লম্বা লাঠি একগাছা, বিরাট একটা তামার কমণ্ডলু চড়ল ঘাড়ে, বোঝা বাড়ল। গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চললাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটল অমরনাথ, একটি কথাও বললে না। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে আমার চাদরের খুঁট ধরে টান দিল। মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। বোকা গাড়োয়ালীর চোখমুখ থমথম করছে। কোনও রকমে বলল—"যদি কখনও দরকার হয় মনে রেখো পাণ্ডা অমরনাথ বুলন্দরওয়ালে দেবপ্রয়াগ। কোনও রকমে একটা খবর পাঠিও।" বলতে বলতে পেছন ফিরে লাগাল দৌড়। নিমেষের মধ্যে বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল।

চাদরের খুঁটটা উঠিয়ে কাঁধে ফেলতে গিয়ে দেখি বেশ ভারী ভারী ঠেকছে।

চলেছি টিহরী। কালীকম্বলীর পুঁথি সঙ্গে রয়েছে, মাইলপোস্ট-গুলো দেখে হিসেব করে চলেছি। আগে আগে একপাল রামছাগল চলেছে পিঠে মাল নিয়ে। ছোট ছোট দুটি বস্তা বা কাঠের বাক্স দুটি ঝুলছে পিঠের দু পাশে, চাল ডাল আটা লবণ ঘি আলু মায় দেশলাই বিড়ি কেরোসিন সর্বস্ব চলেছে টিহরীতে। টিহরী হল শহর,

হাকিম পুলিস হাসপাতাল এমন কি জেলখানা পর্যন্ত আছে এমন জাতের খানদানী শহর। সেখানে বড় বড় বেনিয়ারা রয়েছেন, তাঁরাই এই সব মাল আমদানি করছেন। রপ্তানি করবেন উত্তরকাশী গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী। যাত্রাপথে যত চটি আছে, সব চটিতে টিহরী থেকে রসদ যাবে।

রামছাগলদের অনুগামী লক্ষণমানুষ চলেছেন পাঁচ সাত জন। দলে ভিড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম এই দুনিয়ায় সব থেকে সুখী মানুষ কারা। যারা পিঠে করে মোট বয়, মোট বয়ে হিমালয়ের চড়াই ওতরাই ভাঙে, দেহের সঙ্গে বাঁধা পিঠের মোটটাকে পাহাড়ের গায়ে সুবিধা মত একটা খাঁজে আটকে সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারে, তারাই হল এই বিশ্বের সব থেকে সুখী মানুষ। ভাবনা-চিন্তা দায়-ধান্দা ওদের স্পর্শ করতে পারে না। রিক্ততা দারিদ্র্য কায়িককষ্ট ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ওদের কাছে চরম শৌখিনতা। পিঠে করে মোট বহা যেন একটা অতি সুপবিত্র ধর্ম। মোট পিঠে নিয়ে চড়াই ভেঙে ওঠা কর্মটি হল তপস্যা। ঐ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলে অর্থাৎ চড়াইয়ের তুঙ্গস্থানটিতে পৌঁছতে পারলে চরম্ শান্তি। পিঠে বাঁধা মোটটাকে পেছন ফিরে পাহাড়ের খাঁজে আটকে রেখে সেই মোটের সঙ্গে বাঁধা অবস্থাতেই চক্ষু বুঁজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক ঘুমিয়ে নাও। তারপর নাম, নেমে যাও যতক্ষণ না আবার একটা চড়াই শুরু হচ্ছে। কোনও সমস্যা নেই জীবনে, কোনও অশান্তি নেই। পিঠে বাঁধা মোটের ভেতর কি চলেছে তা জানবারও গরজ নেই এতটুকু। মোটের ওপর রামছাগলের পিঠে যা চড়তে পারে না তেমন দামী জিনিস কিছু চলেছে, এইটুকুই জানা আছে। এবং তার দ্বারাই প্রমাণ হচ্ছে যে রামছাগলদের অনুগামী *লক্ষণমানুষরা শ্রেষ্ঠ জীব।*

শ্রেষ্ঠ জীবেরা আর যা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে পেটের ভেতর পুরে তার মূল্য অপরিমেয়। পিঠে রয়েছে ঔষধপত্র যন্ত্রপাতি কাঁচের

জিনিস, ওগুলোর মূল্য আর কত হবে! কিন্তু পেটের মধ্যে যা রয়েছে তার নাম সংবাদ, সংবাদপত্রে যাকে বিশ্ববিচিত্রা বলে চালানো হয় তাই। হৃষীকেশ পর্যন্ত ট্রেন আছে, মালপত্র হৃষীকেশ পর্যন্ত ট্রেনে বা লরিতে গিয়ে পৌঁছয়। তারপর রামছাগল আর লক্ষণমানুষদের পিঠে চাপে। অর্থাৎ ওরা হৃষীকেশ পর্যন্তই আসে, কেউ কেউ হয়তো হরিদ্বারেও এক-আধ বার চক্কর দিয়ে যায়। ঐটুকুই যথেষ্ট, ওখান থেকেই ওরা সংবাদ সংগ্রহ করে দিল্লী বম্বাই লাহোর কলকাতার। সাগরপারের সাহেব লোগ্‌দের অতি বিশ্বস্ত সংবাদও কিছু কিছু জুটে যায় ঐ সঙ্গে ফাউ হিসেবে। হিমালয়ের অন্তরে প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ হিসেবে সেই সমস্ত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ঝর্ণা আর পাহাড়ী নদীর একঘেয়ে কান্না শুনতে শুনতে যাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে তারা কিছুক্ষণের জন্যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ভাবে— আহা পৃথিবীটা কত চমৎকার! পাহাড়ের গর্ভে আমৃত্যু বন্দীজীবন যাপন্ করতে হয় না যাদের তারা কত সুখী! তারা স্বাধীন তারা যা খুশি করতে পারে, যখন যেখানে খুশি যেতে আসতে পারে। রেল-গাড়ি মোটরগাড়ি ঘোড়ারগাড়ি এমন কি গরু দিয়েও গাড়ি টানায়। আর সেইসব গাড়িতে চড়ে গড়গড় করে যেখানে খুশী চলে যায়। আহা কি আরাম!

তা বলে ওদের মনে হিংসে নেই মোটেই। ওরা হিমালয়ের সন্তান। ভাগ্যে হিমালয় ছিল, ভাগ্যে হিমালয়ের ঐ চড়াই ওতরাই ছিল, ভাগ্যে কেদার-বদরী গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী ছিল, তাই তো ওরা বেঁচে আছে। হিমালয় ছাড়া বাকী পৃথিবীতে যারা বাস করে, তারা হিমালয়ের টানে ওদের কাছে আসতে বাধ্য। সুতরাং মোট বহা কর্মটা কে কেড়ে নিচ্ছে!

আমার সহগামীরা টিহরীতে মোট পৌঁছে ঝট্‌পট্ ফিরে আসবেন দেবপ্রয়াগে। আরও এগিয়ে নেমে যাবেন হৃষীকেশে। কারণ যাত্রা শুরু হয়ে যাবে। যাত্রা শুরু হলে আর পায় কে? মোট মানুষ—

বহে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক কিছু মিলবে। কারণ এ কথাটা তো মানতেই হবে যে হিন্দুস্থানে পুণ্য-লোভাতুর নরনারীর অভাব নেই।

দেবপ্রয়াগে দেখে এলাম ডাণ্ডি কাণ্ডি। বড় বড় শেঠ-শেঠানীরা ডাণ্ডিতে যান। চারজন মানুষ লাগে ডাণ্ডি কাঁধে নিতে, আরও চারজন কাঁধ বদলাবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে চলে। কাণ্ডি হল পিঠের বোঝা, মাল বহা ঝুড়ি। তার ভেতর হাত-পা মুড়ে বসে নেহাত অথর্ব বুড়ী তীর্থ করে বেড়ায়। কাণ্ডি-আরোহিতা তীর্থযাত্রিনীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে পরে। আঁতকে উঠে তাকিয়ে থেকেছি। কি দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ! পিঠে বেঁধে সেই মাল নিয়ে পাহাড়ে উঠছে যে তার চেয়ে বোধ হয় সহস্রগুণ কষ্ট ভোগ করছে সেই জীবটি যে কাণ্ডির ভেতর গুঁজড়ে বসে আছে। পাপের শাস্তি ঠিকই, সীমাহীন পাপ করলে তবেই মানুষ ঐভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে তীর্থদর্শন করতে পারে। পাপস্খালন কি সহজে হয়!

টিহরীর পথে প্রথম রজনী একটা দরজা জানলা বিহীন চটির দাওয়ায় কাটল। চটিওয়ালা তখনও আসে নি। তাই দোকানও সাজায় নি। সহযাত্রীরা নিজেদের পিঠের মোট নামিয়ে রামছাগলদেরও মুক্তি দিলেন। ছাগলরা নিজেদের খাবারও নিয়ে চলেছিল পিঠে করে, খোলা সুদ্ধ ছোলা ভাঙা আর ভুট্টার দানা। একটা সমতল জায়গায় ওদের জড় করে দানাগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হল। মালের বস্তাগুলোকে সাজিয়ে রাখা হল চটির ভেতরে। বাইরে রাখলে তেরপল ঢাকা দিতে হত। কারণ ঐ রাজ্যে কখন যে বৃষ্টি পড়বে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই।

তারপর খাওয়া দাওয়ার পালা। ও পাট চুকতে আধ ঘণ্টাও লাগল না। ওঁদের কাছে ছিল রুটি আর গুড়ের ডেলা। রুটিগুলো কতদিন আগে বানানো হয়েছিল তার হিসেব ওঁরাও দিতে পারলেন না। এক-একখানির ওজন প্রায় আধ সের টাক হবে। পাটালির মত ব্যাপার অনেকটা, নুন মেশানো আটার পাটালি। প্রত্যেকে

খানিকটা করে ভেঙে নিয়ে বাকীগুলো ন্যাকড়ায় জড়িয়ে ঝোলায় পুরে ফেললেন। তারপর কামড়ে কামড়ে খেতে লাগলেন। জলের ব্যবস্থা রয়েছে চটির পাশেই, অনেক দূরের ঝর্ণা থেকে বাঁশ ফাটানো নলে করে জল আনা হয়েছে। এগুলোর নাম 'পিও,' সারা বছর এগুলোকে চালু রাখার চেষ্টা করা হয়। নয়ত মানুষে খারাপ জল খেয়ে রক্তআমাশায় ভুগে মরবে। কলেরা আর রক্ত-আমাশার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে 'পিও' থেকেই জল খাওয়া উচিত। যেখানে সেখানে ঝর্ণা দেখলেই তেড়ে জল খেতে যাওয়াটা মারাত্মক ফল দিতে পারে।

আমার খাবার সঙ্গে ছিল। ঘি দিয়ে গম ভেজে মস্ত বড় কাঠের হামানদিস্তায় ফেলে কুটতে কুটতে ছাতু বানিয়ে শর্করা মরিচাদি সহযোগে লাড্ডু বানানো হয়েছে। সেই লাড্ডু কয়েকটা ঝোলার ভেতর পুরে দিয়েছিল অমরনাথ। গোটা দুই গলাধঃকরণ করলেই কম্ম ফতে। যত জল খাবে পেটের ভেতর জিনিসটা তত ফুলবে। যা রসদ সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে তাতে টিহরী পর্যন্ত অনায়াসে পৌঁছনো যাবে।

তবু পাঁচটা লাড্ডুর মায়া ছাড়তেই হয়। যে খাদ্য ওরা খেল, তারপর ওদের সামনে বসে লাড্ডু খাই কেমন করে! বললাম—"নাও, তোমরা একটা করে প্রসাদ নাও।"

হাত গুটিয়ে ওরা পিছিয়ে বসল। যার বয়েস বেশী সে খুবই বিনীত ভাবে বলল—"মাফ করুন মহারাজ, ঐ খেতে খেতে আপনাকে টিহরী পৌঁছতে হবে। রাস্তায় কিছুই মিলবে না। এখনও কোনও চটি খোলে নি।"

আশ্চর্য হলাম না। বোকা কুলি, শুধু মোট টানতেই জানে পিঠে করে, ভাল-মন্দ জিনিসের কদর বুঝবে কেমন করে! আসন্ন সন্ধ্যায় সেই নির্জন স্থানে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। নির্লোভ নিরহংকার আরও যেন কতকগুলো শক্ত শক্ত কথা মুখস্থ ছিল। সাধনা করতে

এসেছি হিমালয়ে, নির্লোভ নিরহংকার নির্দ্বন্দ্ব হবার বাসনায়। গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছি।

হায় অন্ধ!

বাঘ নেই, বাঘেড়া আছে। খুবই পাজী জানোয়ার বাঘেড়া, খামকা গোটকতক ছাগলকে জখম করে পালাবে। তাই ওদের সজাগ থাকতে হয়।

"তার মানে দিনে রাত্রে তোমরা ঘুমোতে পার না!"

"না না তা কেন, না ঘুমিয়ে বাঁচে মানুষে? ঐ ফাঁকে ফাঁকে আমরা ঘুমিয়ে নি।"

"স্নানটান কর না তোমরা? না ঘুমিয়ে স্নান না করে আর ঐ খাওয়া খেয়ে পিঠে করে মোট বইছ? এভাবে চললে কত দিন বাঁচবে?"

"আরে এ তো বড় জোর তিন-চার মাসের কাজ। তারপর ঘরে ফিরে যাব, স্নান করে নতুন জামা-কাপড় পরে আরাম করব ঘরে বসে। ঘরে যখন বসে থাকব তখন তো আর গতর নাড়তে হবে না। মা আছে বহিন আছে বেটা বেটী ঘরওয়ালী সবাই আছে।"

"এই তিন-চার মাসের রোজগারে সারা বছর কেটে যাবে?"

"তা কি কাটে কখনও। খেতি আছে, বকরা-বকরি আছে, গরুও আছে অনেকের।"

ভাঙবে তবু মচকাবে না। সর্বহারা প্রোলিটেরিয়েট্ ইত্যাদি রসালো বাক্যগুলো বোধহয় কানেও যায় নি কখনও। উৎপীড়িত নিপীড়িত শোষিত ইত্যাদি চোখা চোখা বাক্য ফোড়ং দিয়ে বেশ একটি ঝাঁজালো বক্তৃতা ঝাড়লে কেমন হয়!

আচ্ছা, ঐ যে শেঠ-শেঠানীদের কাঁধে করে এরা বইছে, ওদের ধনদৌলত তো দেখছে। জানতে তো পারছে কি ভাবে মানুষে টাকা

পয়সা ছড়াতে পারে। এত টাকা এত ঐশ্বর্য রয়েছে তুনিয়ায়, এধারে এরা মুখ দিয়ে রক্ত তুলেও পেট ভরে খেতে পারছে না। সমস্ত দেখে শুনে জেনে বুঝেও এদের মনে হিংসের আগুন জ্বলে ওঠে না কেন!

ভাগ্য ভবিতব্য নিয়তি কর্মফল ইত্যাদি সব মসলা দেওয়া ভাঙ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে হয়তো!

অন্ধকার আকাশপানে তাকিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। ওধারে ওরা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় আলাপ শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে শুনতে শুনতে শেষ পর্যন্ত সবই বুঝতে পারলাম।

নির্জলা অনুকম্পা যাকে বলে তাই। অনুকম্পাও ঠিক নয়, আবদেরে অবুঝ নেয়েআঁকড়া আত্নরে ছেলেকে যে দৃষ্টিতে দেখে মানুষে, কতকটা যেন সেই জাতের দৃষ্টিতে দেখে ওরা বড়মানুষদের। ভয়ঙ্কর রকমের হ্যাংলা তুর্দান্ত লোভী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য একদল মানুষ লুটেপুটে খাচ্ছে তুনিয়াটাকে। তা আর কি করা যাবে। বরদাস্ত করা ছাড়া উপায় কি। ঐ বেহদ্দ বেহায়াগুলোর সঙ্গে খেয়োখেয়ি করতে হবে নাকি!

তার চেয়ে ওদের সংস্রব এড়িয়ে চললেই আপদ চুকে যায়। মোট বহে ডাণ্ডি বহে বোকা ভালমানুষ কুলি সেজে ওদের সন্তুষ্ট করে যা পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট। ঐসব জলজ্যান্ত পাপগুলোর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে আছে! জাত যাবে যে। উন্নত শির হিমালয়ের ধবল তুষারমণ্ডিত চূড়ায় কি কালি লেপতে আছে!

অভিজাত, ভারতের শ্রেষ্ঠতম অভিজাতদের চিনতে পারলাম। শত সহস্র অপরাধ ওরা অবহেলায় ক্ষমা করতে পারে। নিজেদের ওরা ছোট ভাবতে শেখে নি। ওরা হাসতে জানে, হিমালয়ের মত তুষারশীতল ওদের হাসি। মানুষের লোভ হ্যাংলাপনা, সবাইকে বঞ্চিত করে বিশ্বসংসারে আগুন জ্বেলে সর্বস্ব দখল করে বসবার

প্রবৃত্তি দেখলে ওদের ঘৃণার উদ্রেক হয় না, রাগ হয় না, হাসি পায়। পাবেই, পেতে বাধ্য। কারণ সেই সব রাক্ষুসে জীবকেই ওরা কাঁধে করে বয়ে বদরীনারায়ণ কেদারনাথের দরজায় পৌঁছে দেয় কি না। কিছুই যে ওদের কাছে লুকোনো থাকে না। লোভ হিংসা দ্বারা অর্জিত ধনদৌলত ঘুষ দিয়ে যারা পুণ্যার্জন করতে আসে তাদের আসল পরিচয়টা যে ওরা জানতে পারে। হিমালয়ের তুল্য সহ্যগুণ ওদের, পাষাণে যেমন কথা বলে না, ওরাও বলে না। ওরা যে পাষাণ-বাচ্চা, ওদের বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না।

শুনতে লাগলাম অবিশ্বাস্য সব উপাখ্যান।

"সেই লোকটা এবারও এসেছে। হরিদ্বারে ভাটিয়া ধর্মশালায় তিনখানা ঘর দখল করে বসে আছে দলবল নিয়ে আর দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছে।"

"কে? সেই এক চোখ কানা ভাটিয়া, যার নাকি দুটো হাড্ডি গুঁড়ো করবার কারখানা আছে?

"আরে না, সেই হাড্ডিওয়ালা নয়। সেই যে সেই চেপ্টা মতন ভুঁড়ো মাদ্রাজী, সোনা বাঁধানো ইয়া বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে আসে!"

"ও হো হো, বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি। তাহলে এবার তো জংলী সাহেবলোগ্‌দের পোয়া বারো। নিশ্চয়ই অনেক মাল এনেছে সঙ্গে?"

"নিশ্চয়ই। ঐ যে বললুম না ভাটিয়া ধর্মশালার তিনখানা ঘর দখল করে বসে আছে?"

"ওর পায়ে রোজ ফুল জল দিয়ে তবে ওরা জল খায়। আর ঐ শয়তান টাকার জন্যে কি কারবারই না করে!"

"সেবার সেই ছুকরীর মা কি কান্নাই না কাঁদল। ঐ একটাই মেয়ে ছিল কি না, আর ছেলেমেয়ে নেই। কান্না শুনতে শুনতে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল আমার। একবার মনে করেছিলাম, বলে

দোব। তার মেয়ে কোথা থেকে কেমন ভাবে পাচার হয়ে গেছে বলে দোব। তারপর মনে হল, বলেই বা কি লাভ হবে। মেয়েকে তো আর ফেরত পাবে না।"

"ফেরত পেলেও ফিরিয়ে নিয়ে যাবে নাকি? জাত যাবার ভয়ে মেয়ে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে।"

"তখন মেয়েটা পড়বে মহাত্মাদের খপ্পরে। চুলে আঠা মাখিয়ে জট পাকাবে। মুখে ভস্ম মাখবে। আর গৃহস্থঘরের সোমত্ত ছোকরাদের মাথা খাবে। তার চেয়ে ঐ ভাল হল। জংলী সাহেব-লোগ্‌রা ওকে ভাল ভাবে রাখবে, ওর পেটে ছেলেমেয়ে হলে সেই দেরাদুন মুসৌরির স্কুলে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাবে।"

"কিন্তু ঐ শয়তানটা বছর বছর এসে ঐভাবে দু-একটা ছুকরীকে যে বেচে যাচ্ছে, ধরা পড়ছে না তো!"

"কি করে ধরা পড়বে। যেসব গৃহস্থ ওর সঙ্গে তীর্থ করতে আসে এখানে তারা কি রকম মানুষ তাই আগে দেখ। টাকার জন্যে তারাও লোকের গলায় চাকু চালায়। চাকু চালিয়ে যে টাকা কামায়, সেই টাকা খরচা করে যায় এখানে। মনে করে, টাকা খরচা করলেই আর বদরীবিশাল কেদারনাথ দর্শন করলেই সব পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে। নিজেদের পাপ অন্যায়ের জ্বালায় যারা মরছে তারা অপরের পাপ অন্যায় দেখবে কেমন করে? তাছাড়া ঐ শয়তানটা হচ্ছে ওদের গুরুদেব। গুরুদেবকে সন্দেহ করলে যে পাপে ডুববে আরও।"

"আরে শুনেছিস, এবার নাকি সেই সর্দারজীও এসেছে পাহাড়ে?"

"তবে যে শুনেছিলাম লাহোর জেলে মাটির নিচের ঘরে তাকে আটকে রেখেছে?"

"সব ফাঁক, গাঙ্গু সর্দারকে আটকে রাখবে এমন জেলখানা এখনও তৈরী হয় নি।"

"যমুনোত্রীতে সর্দারের গুরুজী আছে। তাঁর বয়েস নাকি এক

হাজার বছর। গুরুজী ইচ্ছে করলেই সর্দার জেল ভেঙে বেরিয়ে আসে। তাহলে এবার নিশ্চয়ই নরবলি পড়বে চন্দ্রাদেবীর মন্দিরে।"

"মাঈকী হুকুম, জয় হো মাঈকী।"

থেমে গেল সবাই। মাঈকী হুকুম নরবলি হবে এবার। সুতরাং তার ওপর তো আর কথা চলতে পারে না।

অনেক দূরে খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ হাসি জুড়ে দিলে কারা। অতি বীভৎস হাসি, নরবলি খাবার লোভে সেই রাক্ষসী মা ঐভাবে হাসছে কি না কে জানে! হাসি শুনে এরা সবাই রামছাগলদের কাছে চলে গেল।

অমরনাথের কম্বল সত্যিই কুটকুটে নয়, টেনে মুখ মাথা ঢাকা দিয়ে ফেললাম। কম্বলে মশারির কাজও করে। ঘুম কোথায়? চন্দ্রাদেবী, গাঙ্গু সর্দার, সর্দারের গুরু সেই হাজার বছর বয়েসের মহাত্মা যিনি যমুনোত্রীতে থাকেন, সবাই ভিড় করে এসে হাজির হল মগজের মধ্যে। এই তো চাইছিলাম, রহস্য রোমাঞ্চ উত্তেজনার খিদেয় উন্মত্ত হয়ে চলে এসেছি হিমালয়ে। যা শুনলাম যতটুকু জানতে পারলাম তাই যথেষ্ট। চলেছি টিহরী, তারপর যাব উত্তরকাশী। উত্তরকাশীতে গুহার ভেতর বসে সাধু মহাত্মারা তপস্যা করছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শত শত বছর বেঁচে আছেন, সর্বাঙ্গ দিয়ে অনেকের জট বেরিয়েছে। যদি কেউ কৃপা করেন তাহলে—

কি না হতে পারে তাহলে? গণ্ডা কতক পুরশ্চরণ করেছি কাশীতে, শাক্তাভিষেক পূর্ণাভিষেক কি না হয়েছে। গলগল করে মদ গিলতে পারি আর গ্যাঁট হয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্র আওড়াতে পারি। তোতাপাখীর মত অর্থ না বুঝে সংস্কৃত কপচাই। কি হয়েছে তাতে? কি পেয়েছি? রাত পোহালে কি ঘটবে তাও জানতে পারি না।* স্রেফ একটি চালকলা বাঁধা বিচ্ছু পুরুতঠাকুর বনে গেছি। এমন পুরুত যার তন্ত্রধারকও লাগে না। বিলকুল মুখস্থ হয়ে গেছে,

ছোটবেলায় ধরণীধর পণ্ডিত মশায়ের বেত ঐ মুখস্থ করার শক্তিটুকুই দিয়েছে, সেই শক্তিটুকুই শেষ পর্যন্ত এক বিচ্ছু পুরুত বানিয়ে ছাড়ল। কিন্তু হল কি তাতে ? পেলাম কতটুকু ? কিছুই নয়। নেহাত বোকা যারা কিংবা বেহদ্দ ভীতু, ভূত-প্রেতের ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদনটুকু বাগানো যায়, তার বেশী আর কিছুই নয়। কিন্তু উত্তরকাশীতে শতশত বছর ধরে গুহার মধ্যে বসে যাঁরা তপস্যা করছেন তাঁদের মধ্যে কেউ যদি কৃপা করেন তাহলে কি না হতে পারে! বরানগরের সেই মহাপুরুষ যা বলে দিয়েছেন সবই ফলছে। হিমালয় এসে গেছি, এবার মৌনব্রত নিয়ে তপস্যা। তারপর যখন ফিরে যাব তখন—

দূর ছাই, ফিরে যাবার কথাটা বার বার মনে পড়ছে কেন ?

স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, মস্ত বড় এক আশ্রম বানিয়ে বসেছি। এন্তার শিষ্য-শিষ্যাণী, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই জাঁদরেল বপু, বপুগুলি ঢাউস ঢাউস মোটরগাড়ি থেকে নামছে, পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে। অনবরত শুনছি—বাবা কৃপা কর, বাবা কৃপা কর। আর সোনার খাটে বসে হীরে বসানো আলবলায় তামাক টানছি।

একটা করুণ কান্না স্পষ্ট শুনলাম যেন। স্বপ্ন ভেঙে গেল। মাদ্রাজী সেই মা বোধ হয় কাঁদছে। তার একমাত্র মেয়েকে জংলী সাহেবলোগ্‌দের কাছে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে। কোথায় থাকে সেই সাহেবলোগ্‌গুলো ? তারা কারা ?

৩

রামছাগলরা মাল পিঠে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। কম্বলের ভেতর থেকে মুখ বার করে দেখলাম তখনও ভাল করে আঁধার ঘোচে নি। রামছাগলদের অনুগামীরা আমায় ডাকল না। আমি লোকটা ওদের সঙ্গে সারা দিন হেঁটেছি, একটা রাত কাটালাম ওদের সঙ্গে, কিন্তু তাতে কি! আমি তো ওদের মাল নই যে আমার কথাও স্মরণে রাখতে হবে।

একদম মিলে গেল। শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলিদেব বলেছেন—

মৈত্রী করুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখ-দুঃখ পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং

ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্॥

মানেটা হল—মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা, মৈত্রী করতে হবে সুখীর সঙ্গে, দুঃখীকে করতে হবে করুণা, পুণ্যবানকে দেখে আনন্দিত হতে হবে আর পাপীকে স্রেফ উপেক্ষা করাই উচিত। চিত্ত যদি শান্ত করতে হয় তাহলে ঐ চাররকম ব্যবহার আঁকড়ে জীবন যাপন করা চাই।

ওরাও তাই করলে। সেই উপেক্ষা, আমার মত অপুণ্যবানকে উপেক্ষা করার বিধি স্বয়ং পতঞ্জলিদেব দিয়ে গিয়েছেন। চিত্তপ্রসাদ যে ওদের আছে সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ রইল না।

পতঞ্জলি স্মরণ করে আমিও রামছাগলদের উপেক্ষা করলাম। তাড়া নেই, দশ দিন পরে টিহরী পৌঁছলেই বা ক্ষতি কি হবে। এমন কি মাল নিয়ে চলেছি সঙ্গে যা ঠিক সময় বাজারে না পৌঁছলে বেনিয়াদের লোকসান হয়ে যাবে! মাল বলতে আছে গমের ছাতু দিয়ে বানানো লাড্ডুগুলো, ও মাল নষ্ট হবার নয়। চটিও খালি পড়ে আছে, বসে থাকা যাক দু-চার দিন। নির্জনতা ভোগ করবার জন্যেই না হিমালয়ে আসা। নির্জনে শম দম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা

সমাধান এই শমাদিষট্-সাধন করতে হবে। এখানেই শুরু করে দিলে ক্ষতি কি!

হায় পরমেশ্বর! ঘণ্টাখানেকের ভেতর বুঝতে পারলাম মায়াময় সংসারের আসল রূপ। নির্জনতায় বখরা বসাবার জন্যে লাখ লাখ মাছি যে অবস্থান করছে আমার সঙ্গে। মুখের ঢাকা খোলবার উপায় নেই। সাধে কি আর মানুষে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করবার কায়দাটা আগে রপ্ত করে নেয়?

সর্বসাধারণের উপকারার্থে একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা এখানে বলে রাখি। সাধনা করার বাসনায় হিমালয়ে যদি যেতে চান কেউ, তাহলে যত বড় বৈরাগ্যের উদয় হোক না কেন চিত্তে, খবরদার মশারির মায়া ত্যাগ করে রওয়ানা হবেন না। নেটের সৌখীন মশারি নয়, থাপী কাপড় দিয়ে বানানো মশারি একটি অতি অবশ্য সঙ্গে নেবেন। হিমালয়ের মাছিদের প্রবল জেদের কাছে নেটের মশারি দু দিনেই ইলিশ মাছ ধরা জাল হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য তাতেও কিছু যাবে আসবে না, পিসুরা আছে। আরও খানিক ওপরে উঠে তাদের সঙ্গে পরিচয় হল। ব্রহ্মোপলব্ধির প্রথম ধাপ পিসু উপলব্ধি, ব্রহ্ম যেমন সর্বত্র আছেন তেমন ওঁরাও আছেন। সংসার-জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় লোকে হিমালয়ে যায়, সেখানে সংসার-জ্বালার চেয়ে সহস্রগুণ জ্বালা দেবার জন্যে সর্বব্যাপী ব্রহ্মবৎ পিসুরা রয়েছেন। ওঁদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে টিন টিন কেরোসিন তেল সঙ্গে নিতে হবে। দিবারাত্র আপাদমস্তক ভিজিয়ে রাখতে হবে কেরোসিনে। নয়ত জলে ডুবে বসে থাকতে হবে। দীর্ঘদিন ওঁদের সঙ্গে সহবাস করে বুঝতে পেরেছি যে জলকে ওঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না। তাই উৎকট বৃষ্টি পড়তে থাকলে তখনকার মত ক্ষেমা দেন।

আর একটি উপায় অবশ্য আছে। সেটি অবলম্বন করে সুখে বিচরণ করেন নাগা বাবারা। আপাদমস্তক ভস্ম লেপে মশা মাছি পিসুর জ্বালা থেকে রক্ষা পান। কিন্তু সত্যই কি তাই? ভস্ম

আমিও মেখে দেখেছি, খাঁটি নাগা বাবার ধুনি থেকে ভস্ম নিয়ে জল দিয়ে গুলে সর্বাঙ্গে রগড়ে বসে থেকেছি, কিছুই হয় নি। যে কামড় সেই কামড়, পিসুরা তাদের কর্তব্য-কর্ম যথাযথ সম্পন্ন করেছে। অবশেষে বুঝেছি, শুধু ভস্ম মাখলে কিছুই হয় না, ঐ সঙ্গে বড় কলকে চাই। এ লাইনে টিকতে হলে কলকেটি চাই-ই চাই। অতএব সর্বাগ্রে কলকের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা প্রয়োজন।

মুখ ঢাকা দিয়ে শুয়ে কলকের কথা চিন্তা করছি, কম্বলের ওপর মাছিরা কথাকলি নৃত্য অভ্যাস করে চলেছে। হঠাৎ কানে গেল—"নারায়ণ নারায়ণ", সঙ্গে সঙ্গে কাশি। ওরে বাপ্‌রে, সে কি কাশির দমক! যেন আস্ত হৃৎপিণ্ডটাই ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে মুখ দিয়ে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। সাধু সমুপস্থিত, একদম মার্কামারা সাধু। পরনে হাত তিনেক লম্বা হাত খানেক চওড়া একটুকরো টেনা, তার নিচে যে কৌপিন আছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এক হাতে একখানি চিমটে আর সের পাঁচেক জল ধরে এমন এক পেল্লায় পেতলের ঘটি। আর এক হাতে বুক চেপে ধরে সামনে নুয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে কাশছেন। উর্ধ্বাঙ্গে কোনও আবরণ নেই। বগলে রয়েছে দড়ি দিয়ে বাঁধা চটে মোড়া একখানা তুলোর কম্বল, তার ভেতর আরও এক-আধ টুকরো টেনাও বোধ হয় আছে। গলায় রয়েছে সুতোয় বাঁধা একটা রাক্ষুসে রুদ্রাক্ষ, কপালে সুপ্রচুর ভস্ম। ভাল করে লক্ষ্য করেও মহাত্মার মুখদর্শন হল না, জটপাকানো রাশীকৃত পাঁশুটে চুলে মুখটা প্রায় ঢেকে আছে। তবে থুতনিতে খানিক চুল আছে দেখা গেল, যার নাম ছাগলদাড়ি। শরীরের প্রত্যেকখানি হাড় গোণা যায়। সেই হাড়ের পাঁজা ঢাকা চামড়াখানির রঙ এমন যে মাছিগুলো বসলে চেনা যাবে না। অনেকক্ষণ কাশবার ফলে বুকের ভেতরটা সাফ হল। অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে খাদের মধ্যে থুতু ফেলে এলেন। তখনও হাঁপাচ্ছেন, হাঁপাতে হাঁপাতেই কোনও রকমে আর একবার বলে ফেললেন—"নমো নারায়ণ!"

শিষ্টাচার হচ্ছে 'নমো নারায়ণ' বলে অভিবাদনের জবাব দিতে হবে। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলিদেব তখনও ঘাড়ে চেপে রয়েছেন। সেই উপেক্ষা, লোকটা পুণ্যবান না অপুণ্যবান যতক্ষণ না জানতে পারছি ততক্ষণ উপেক্ষা করতে দোষ নেই।

সত্যিকারের সাধু উপেক্ষাকেও উপেক্ষা করতে জানেন। পাছে আবার সেই সর্বনেশে কাশি উঠে পড়ে এই ভয়েই বোধ হয় মহাত্মাজী তাড়াতাড়ি দাওয়ায় উঠে উবু হয়ে হাঁটু দিয়ে বুক চেপে বসে পড়লেন। বগল থেকে চট জড়ানো আসন খুলে ভেতর থেকে ছোট একটু লাল রঙের ঝুলি বার করলেন। ঝুলি থেকে বেরুল একটি বাচ্চা কলকে, অল্প একটু জটার মত তামাকও বেরুল। তামাকটুকু বাঁ হাতের তলায় রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের পেষায় জব্দ করে কলকেয় পুরলেন। একটা দেশলাইও বেরুল, কিন্তু তাতে কাঠি নেই। অগত্যা আবার আমার সঙ্গে কথা বলবার দরকার হয়ে পড়ল।

দেশলাইটা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন অবস্থাটা। জিজ্ঞাসা করলেন—"তেরা রামকো পাশ আগ্ হোগা ?" দেশলাইটা বার করে সামনে ফেলে দিলাম। বাধল ফেসাদ, খইনির দোক্তাকে ঐভাবে কলকেয় পুরে টানতে হলে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে একজনকে কলকের মাথায় ধরতে হয়, আর একজন তখন কলকেয় টান দিতে থাকে। অথবা কাঠকয়লার আগুন হলে কাজ চলে। কাঠিটা জ্বেলে ওঁর কলকের মাথায় ধরবার কথাটা আমাকে বলেন কেমন করে। করুণ ভাবে দেশলাইটার পানে তাকিয়ে রইলেন। ওধারে আর একবার কাশি উঠল বলে। বুঝতে পারছি, কোনও রকমে দম আটকে আছেন।

পতঞ্জলিদেব মাথায় থাকুন। আর একবার কাশি উঠলে রক্ষে নেই। তাড়াতাড়ি দেশলাইটা তুলে নিয়ে কাঠি ধরিয়ে যথাকর্ম সম্পাদন করলাম। হাপরের মত সাধুজীর বুকখানা ওঠানামা করতে লাগল, দমের পর দম দিয়ে ধোঁয়াটা গিলে ফেলতে লাগলেন তিনি।

মিনিটখানেক ধোঁয়াটাকে ভেতরে রেখে গলগল করে নাক মুখ দিয়ে বের করে দিলেন। তখন সুস্থ, চকচকে সাদা অনেকগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ল। কৃতজ্ঞতার হাসি, সত্যিকারের অনাবিল উপহার, বাক্যের ভেজাল দিলে ও বস্তু গেঁজিয়ে যায়।

তখন আলাপ জমে উঠতে আটকাল না। যথোচিত সম্ভ্রম সহকারে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি রাম এই অসময়ে চলেছেন কোথায়? এখনও তো পথ খোলে নি।"

পথ খোলে নি তো বড় বয়েই গেল। গাঁয়ে ঘরে ভিক্ষে করে দিব্যি চলে যাবেন উনি গঙ্গোত্রী। আগেও চার-পাঁচ বার এসেছেন, কোনও মুশকিল নেই, সীয়ারামের কৃপায় কোথাও কিছু অভাব হয় না।

মনে মনে বললাম, তা হয় না। তার কারণটি হচ্ছে সীয়ারামের কৃপায় স্বভাবকে তুমি ধ্বংস করে ছেড়েছ। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ধ্বংস হয়ে গেছ। সসাগরা ধরণীর কোনও বস্তুর প্রয়োজন নেই তোমার, অভাব তোমার নাগাল পাবে কেমন করে।

তবু সেই বড় প্রশ্নটাই থেকে যায়। জানতে ইচ্ছে করে কি নিয়ে ভুলে আছে এই জীবটি! সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের কি ধার ধারে এই লোকটি! আরা সমস্তিপুর দ্বারভাঙা জেলার গাঁয়ের ছেলে, অতি বীভৎস দারিদ্র্য সঙ্গে নিয়ে জন্মেছে। পোড়া পেট কিছুতেই ভরল না, সমাজ সংসার জীবনধারণ করবার সংস্থানটুকুও দিলে না। মেয়ে হলে অন্ততঃ যৌবনকালটা একটু সুখের মুখ দেখতে পেত। পুরুষমানুষ, খাটুনি বেচতে পারে, দেহ বেচতে পারে না। অগত্যা সমাজের মুখে লাথি মেরে বেরিয়ে পড়েছে। ঘৃণা নেই লজ্জা নেই, মান অপমান সুখদুঃখ সব সমান। বেঁচে আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্ষুধা বা উপবাস ওর করবে কি! তবে ঐ যে একটা নচ্ছার যন্ত্র বসে আছে বুকের মধ্যে, ওটা আর হাওয়া টানতে পারছে না। কড়া তামাকের ধোঁয়া খানিক গিলতে পারলে কিছুক্ষণ যন্ত্রটা সজোরে

চলে, যতটা হাওয়া টানা উচিত টানতে পারে ফেলতে পারে। হাড়গুলো আর খোলসটা যতক্ষণ না ছাড়তে পারা যাচ্ছে, ততক্ষণ বুকের ভেতরের হাপর যন্ত্রটাকে চালু রাখা চাই।

সাধুটির পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন বুদ্ধি চৈতন্য যেন পঙ্গু হয়ে গেল। এইভাবে বেঁচে থাকতে হবে! এই জাতের একটা জানোয়ার হতে চলেছি নাকি!

বার বার আওড়াতে লাগলাম মনে মনে—

তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর॥

গুরু বলে দিয়েছেন—"মহাপ্রাজ্ঞ, তুমিই সেই ব্রহ্ম। চিন্তা করবে যে তুমিই হংস, তুমিই সোঽহং। স্বভাবে যার নাম আত্মভাবে বা ব্রহ্মভাবে ডুবে গিয়ে সুখে বিচরণ করতে থাক।

উঃ, সুখের কি বীভৎস চেহারা!

উমাশশীর চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম যেন। সুবাসীদিদির ঝি উমাশশীর সঙ্গে সামনে বসা জীবটির কোথায় যেন একটা মিল আছে। ঐভাবে উবু হয়ে হাঁটুর ওপর থুতনি ঠেকিয়ে বসে থাকত উমাশশী আর ঢুলত। ঐ রকম হাড়ের পাঁজা, তবে হাড় ঢাকা চামড়াখানা অস্বাভাবিক রকম সাদা ছিল। সাঁচ্চা জরির কাজ করা উলুরিঝুলুরি একখানা কাপড় মাত্র পরে থাকত উমাশশী, তা দিয়ে কিছুই ঢাকা পড়ত না। ঢাকবার গরজও ছিল না, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল কি না। খুবই ভাল করে বুঝতে পেরেছিল যে সেই হাড়ের পাঁজা আর এক কানা কপর্দকও রোজগার করতে পারবে না।

সুবাসীদিদির কাছে গল্প শুনেছিলাম। উমাশশীর নাকি এত চুল ছিল মাথায় যে চুল বেচে পাঁচ-ছ মাস ঘরের ভাড়া চালিয়েছিল। একগুছি চুলের জন্যে অন্য মেয়েরা ওকে এক টাকা হিসেবে দিত।

বেচতে বেচতে চুলগুলোও যখন শেষ হয়ে গেল তখন ভাড়ার ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে সুবাসীদিদির বারান্দায় আশ্রয় নিলে। নিজেই লোকের কাছে পরিচয় দেয় ঝি বলে। "বাড়িউলির ঝি আমি" এই কথাটা নিজেই সবাইকে শোনায়। তারপর একটু একটু করে ঐভাবে ঘুমিয়ে পড়ছে। কারও সঙ্গে কথা বলে না, কেউ কিছু বললে শুনতে পায় না, খেতে দিলে খায় না, শুতে বললে শোয় না। ঠায় ঐভাবে বসে আছে আর ঢুলছে। যেন অপেক্ষা করছে কারও জন্যে, তৈরী হয়ে বসে আছে যেন। সে আসবে, এসে তাকে ঐ হাড়ের পাঁজার ভেতর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কে সে!

উমাশশী কিন্তু নেশা করত না। সুবাসীদিদির কাছেই শুনেছিলাম যে মদের গেলাস হাতে তোলে নি বলেই নাকি ঐ দুর্দশা হল ছুঁড়ীর। যে পুজোর যে মন্ত্র, নাচতে নেমে ঘোমটা টানার মানে কি। রূপ যৌবন থাকতে থাকতে গুছিয়ে নিতে না পারলে হাঁড়ির হাল হবেই। সুবাসীদিদির বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়েছিল বলেই ফুটপাতে বসতে হয় নি উমাশশীকে। নয়ত—

নয়ত আর বেশী কি হতে পারত? ফুটপাথে গিয়ে বসলে আর কত বেশী ইজ্জত নষ্ট হত উমাশশীর? আমার সামনে যে মানুষটি বসে বসে ঘুমোচ্ছে, ওর ইজ্জত নষ্ট হতে পারে এমন কি কাণ্ড ঘটতে পারে পৃথিবীতে? মানুষের মগজ থেকে জন্মলাভ করেছে ধর্ম সমাজ আইনকানুন, মানুষের কল্যাণের জন্যে মানুষ বেদম মগজ খাটিয়ে ঐ সমস্ত ভাল ভাল ব্যবস্থাগুলোকে চালু করেছে। এই পুরুষমানুষটি সেই ব্যবস্থাগুলোর ইজ্জতের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে চলে এসেছে। সুবাসীদিদির ভাড়াটে উমাশশীও ঠিক তাই করেছিল। ইজ্জতটা নষ্ট হল কার! এদের না সেই সমাজ ব্যবস্থার, যে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষকে এইভাবে বেইজ্জত হয়ে মরতে হয়!

সান্ত্বনা কোথায়? কি দিয়ে মনকে ভোলাই? সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ আছে আমার, উমাশশীও নাকি খুব ভাল কীর্তন গাইতে পারত।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে মুখস্থ শ্লোকটাকে প্রাণপণে জপতে শুরু করে দিলাম—

ন শত্রুঃ র্ন মিত্রং গুরু র্নৈব শিষ্য
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

সাধুজীর সমাধি ভঙ্গ হল। খইনির তামাক পোড়ানো ধোঁয়া কতক্ষণ আর মানুষকে বেহুঁশ করে রাখতে পারে। হুঁশ ফিরে পাবার পরে আর এক ছিলিম সেবন করলেন তিনি। চটে জড়ানো কম্বলখানা আমার জিম্মায় রেখে বিরাট ঘটিটা হাতে নিয়ে রওয়ানা হলেন। বলে গেলেন, ভিক্ষে করতে যাচ্ছেন। কাছেই নাকি কয়েক ঘর গৃহস্থ বাস করে, জয় নারায়ণ হাঁক দিয়ে তাদের কাছ থেকে কিছু আটা আর রামরস আদায় করে আনবেন। এইবেলা গেলে দুধও জুটতে পারে। যাত্রা শুরু হয় নি, চটি খোলে নি, বেচবে কোথায় দুধ ? এ সময় সাধু মহাত্মারা দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে গৃহস্থরা দুধও ভিক্ষে দেয়।

কোথায় কত দূরে চললেন তিনি, ফিরতে দেরি হবে কি না, জিজ্ঞাসা করাও হল না। ওঁর অস্থাবর সম্পত্তি সেই চটে জড়ানো তুলোর কম্বল আগলে কতক্ষণ আমাকে বসে থাকতে হবে, তাও জানতে পারলাম না। চটে গেলাম নিজের ওপর, কেন যে চটে গেলাম তাও ছাই বুঝতে পারলাম না।

অতঃপর খেয়াল হল যে স্নানটান করা দরকার। "পিণ্ড" থেকে কমণ্ডলু ভরে জল নিয়ে নিয়ে স্নানাদি সম্পন্ন হল। লাড্ডু খেতে গিয়ে কেমন যেন গা বমি বমি করতে লাগল। সেটা লাড্ডুর দোষ নয়, জায়গাটার দোষ।

হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললাম যে জায়গাটা সাক্ষাৎ নরক। ঐ নরকে কিছুতেই আর এক রাত কাটানো চলে না। রাতের তখনও বিস্তর বিলম্ব রয়েছে, হাঁটতে শুরু করলে নিশ্চয়ই সন্ধ্যার আগে

একটা ভাল জায়গায় পৌঁছনো যাবে। কিন্তু হাঁটা শুরু করি কেমন করে ? সেই ব্যাটার চট আর কম্বলখানার তাহলে গতি কি হবে ?

বসে বসে ফুলতে লাগলাম রাগে। আচ্ছা বেকুফ তো আমি ! হতভাগা লোকটা আমাকে ওর চট কম্বল পাহারা দেবার জন্যে বসিয়ে রেখে গেল। আমি কি ওর বাপের কেনা গোলাম নাকি ?

ফেলে চলে গেলেই বা হবে কি ! ঐ মড়ার চোপড়া ছোঁবে কে !

সত্যিই কিন্তু ফেলে চলে যেতে পারলাম না। ঐ চট আর কম্বলখানাই সম্বল বেচারার, ও দুটো গেলে বাঁচবে কেমন করে এই শীতে ! শরীরের যা হাল হয়েছে ওর !

আর একটি চড় খাওয়া সেদিন লেখা ছিল অদৃষ্টে। ঘণ্টা তিনেক পরে আস্ত অগ্নিশর্মা মূর্তি ধারণ করে ফিরে এলেন মহারাজ। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন লাকড়ী জুটিয়ে রাখি নি কেন আমি। বেকুফ গিদধড় পহেলা নম্বর কা বুড়্‌বাক্‌ কাঁহাকা, স্রেফ নবাব কা মাফিক গোদ পর গোদ চড়ায়কে বসে আছে, দুখানা লাকৃড়ী জুটিয়ে রাখলে অত বড় গতরখানা কি ক্ষয়ে যেত ?

সহ্যের সীমা আছে একটা, চট আর কম্বল পাহারা দিতে দিতে সে সীমা অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছিলাম। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। কিন্তু সভ্য মানুষ যে আমি, চেঁচামেচি গালমন্দ করতে পারি না সেই হতভাগাটার মত। নিঃশব্দে নিজের কম্বল দুটো, গুছিয়ে নিয়ে লাঠি কমণ্ডলু হাতে করে রওয়ানা দিলাম। লাকড়ীর জন্যে তখনও গজগজ করছিল লোকটা, ব্যাপার দেখে একেবারে আঁতকে উঠল।

"এ কি ! চললে কোথায় ? ভোগ লাগাবে না ?"

জবাব দেবার দরকার আছে বলেও মনে করলাম না। লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলাম।

দৌড়ে এসে পথ আগলে দাঁড়াল তখন, হাতে সেই মস্ত বড় পেতলের ঘটি নিয়ে।

"এই দেখ কতটা দুধ পেয়েছি। চাল পেয়েছি, শক্কর পেয়েছি। চল, ভোগ লাগাবে চল। কাঠ আমি যোগাড় করে আনছি। কোনও তকলিফ হবে না তোমার, চল।"

একটি কথা না বলে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল—"ভোগ লাগাবে না তুমি? তাহলে এসব নিয়ে করব কি আমি? বস্তীতে বলেছি, আর এক মহাত্মা আছেন, খুব বড় মহাত্মা। তাই তারা এত জিনিস দিলে। শুনবে না আমার কথা? শুনবে না?"

দড়াম করে একটা আওয়াজ হল। চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকালাম। গড়গড় করে সেই ঘটিটা রাস্তার পাশের খাদের ভেতর নেমে যাচ্ছে, ঝলকে ঝলকে দুধ বেরুচ্ছে ঘটির মুখ দিয়ে। আর সেই হতচ্ছাড়াটা পেছন ফিরে দৌড়চ্ছে।

বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। করলে কি হতভাগা? করলে কি? অতবড় পেতলের ঘটিটাকে খামকা বিসর্জন দিলে? দুনিয়ায় ঐ ঘটিটা ছাড়া আর যে কিছুই নেই ওর, নিদারুণ প্রয়োজনে ঘটিটা বিক্রী করলেও যে—

বিক্রী করলে কি পেত! যা পেত তাতে ওর কটা দিন চলত! সেই কটা দিনের পরের দিনগুলো চলত কি বিক্রী করে!

কে সাধু! আমি না ঐ হতচ্ছাড়া হাড়ের পাঁজা বাউণ্ডুলেটা! কাকে এতক্ষণ করুণা করছিলাম আমি! কার বন্ধন ছিন্ন হয়েছে!

"পাশবদ্ধোভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ ভবেচ্ছিবঃ।"

পাশগুলোর নামও মনে পড়ে গেল—

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ঘৃণা লজ্জা ভয় শোক নিন্দা করার প্রবৃত্তি বংশের অভিমান স্বভাব চরিত্র নিয়ে বড়াই করা আর শেষটা হচ্ছে জাতের বড়াই, এই হচ্ছে অষ্ট পাশ। ওর একটাও কি খসেছে আমার?

অন্তরের অন্তস্থল থেকে কে যেন বার বার বলতে লাগল— "ফের ফের ফিরে যা।"

ছোট বেলায় পড়া কবিতার একটা লাইন ককিয়ে কেঁদে উঠল— "মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।"

কে শোনে, পালাতে পারলে তখন বাঁচি। চড়ের মত চড় পড়েছে গালে। জ্বলছে, সাংঘাতিক রকম জ্বলছে। জ্বালার চোটে প্রায় ছুটতে শুরু করলাম। ফিরবে কে তখন? ফেরবার মত বুকের পাটা থাকলে তো ফিরব।

টিহরীর পথে তৃতীয় কি চতুর্থ দিন। সকাল থেকে সমানে হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম গিয়ে একটা গর্তের মুখে। কালী-কম্বলীর পুঁথিতে লেখা ছিল এক চটির কথা। চটি কোথায়? একটা বাঁক ঘুরেই একদম থ বনে গেলাম। সামনেই এক বিশাল হাঁ, রাস্তাটুকু চেঁচেপুঁছে বাঁ পাশের খাদের মধ্যে নেমে গেছে।

কি করা যায়?

আবার ফিরে যাব পেছনের চটিতে? দূর! তাও কি সম্ভব নাকি? পুঁথি খুলে দেখলাম পেছনের চটি পাঁচ মাইল পেছনে রয়ে গেছে। মনের আনন্দে পেছনের পাঁচ মাইল সোজা ওতরাই নেমে এসেছি। তার মানে ফিরতে হলে পাঁচ মাইল চড়াই ভাঙতে হবে। কমসে কম ঘণ্টা তিনেকের ধাক্কা। অন্ধকার প্রায় হয়ে এসেছে তখন। অন্ধকারে চড়াই ভেঙে ফিরে যাব কোথায়? কি আছে সেখানে? একটা ভাঙা ঘর ছাড়া কিছুই নেই।

ঠিক করে ফেললাম ঐখানেই রাত কাটাব। একটা ধুনি জ্বালাতে পারলে আর ভাবনা নেই। ধুনি জ্বালিয়ে খোলা আকাশের তলায় রাত কাটাবার জন্যেই তো এসেছি হিমালয়ে। কালিঝুলি মাখা দরজা-জানলাহীন ভাঙা চটিতে চটিতে রাত কাটাব বলে এসেছি নাকি? জয় মা ভবানী বলে তৎক্ষণাৎ ধুনি জ্বালাবার যোগাড় করতে লেগে

গেলাম। কাঠের অভাব নেই, ধ্বসটা নেমেছে যেখানে তার আশে-পাশে বিস্তর ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। ডান দিকে অনেক ওপরে তাকিয়ে বুকটা একটু কেঁপে উঠল। যতদূর নজর পৌঁছল সব সাফ, হিমালয়ের দাড়ি কামানো হয়েছে যেন, খামখেয়ালী নাপিত মাত্র একটা জায়গায় এক টান দিয়ে থেমে গেছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে যদি আর এক টান দেয়!

ভাঙা ডালপালাগুলো জড় করে বহুকষ্টে আগুন ধরালাম। ধোঁয়ার চোটে দশদিক অন্ধকার হয়ে গেল। প্রাণপণে ফুঁ দিচ্ছি উপুড় হয়ে, কি যেন পড়ল পিঠের ওপর। ঠিক যেন এক কিল বসাল কেউ সজোরে। আড়ষ্ট পিঠ সোজা করে চারিদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। তাহলে? টনটন করছে পিঠ, সোজা হয়ে দাঁড়িয়েও আড়ামোড়া খাচ্ছি। কি পড়ল পিঠে? কিছু যে পড়েছে সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই।

আগুনটার পানে তাকিয়ে দেখি একটু একটু জ্বলছে। একবার ধরলে আর চিন্তা নেই, সারা রাত গনগন করবে আগুন, আলোও যথেষ্ট হবে। কাঠের অভাব নেই।

একটুও হাওয়া নেই, আরও কয়েকটা ফুঁ দিলে হত। উবুড় হতে আর সাহসে কুলোচ্ছে না তখন। আবার যদি কিছু পড়ে পিঠে!

পিঠে নয়, পড়ল সেই ধুনির ওপর। গোটা পাঁচ সাত ছোট বড় পাথর চোখের সামনে খসে পড়ল ওপর থেকে। ব্যাপারটা মগজে সেঁধুতে কয়েক মুহূর্ত লাগল, আর একবার ওপর দিকে মুখ তুলে তাকালাম। অন্ধকার হয়ে গেছে, কিছুই দেখা গেল না। হাত-পায়ের খিলগুলো আটকে গেল যেন হঠাৎ। আস্ত পাহাড়টা হুড়মুড় করে নেমে আসছে ঘাড়ের ওপর, নড়বার উপায় নেই, পালাবার উপায় নেই। পালাব কোথায়?

গুড় গুড় গুড়ুম্ গুম্ গুম্ গুম্ গুম্—

অনেকক্ষণ ধরে শোনা গেল প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে

যাবার আগেই অন্য জাতের আওয়াজ শুরু হল। হড়হড় ছড়ছড় করে অনেকগুলো ছ্যাক্‌রা গাড়ি যেন ছুটে আসছে। আবছা অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সামনে ভাঙা জায়গাটা দিয়ে রাশি রাশি পাথর গড়িয়ে নামছে।

আবার এক ঘা খেলাম। কিল নয়, সপাং করে এক ঘা চাবুক কষাল যেন কেউ। চমকে উঠে দেখি সত্যিই এক গাছা দড়ি, আঙুলের মত মোটা শক্ত দড়ি এক গাছা কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এসে পড়েছে। তখন শুনতে পেলাম, হাঁ, ওটা মানুষের চিৎকারই তো বটে! কোথা থেকে কারা যেন প্রাণপণে চিৎকার করে ডাকছে। মুহূর্তের মধ্যে হাত-পায়ের শক্তি ফিরে এল। লাঠি গাছা আর কমণ্ডলুটা তুলে নিয়ে দড়িটা শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরে টানতে লাগলাম। খানিকটা টানবার পরেই ওধার থেকে টান পড়ল। তখন সেই দড়ি ধরে চললাম ফিরে। বাঁকটা ঘুরতেই মাথা ঘুরে গেল। ষোল আনা বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম কিনা বলতে পারব না। এইটুকু মনে আছে যে সেইখানেই বসে পড়েছিলাম। বসে পড়বার পর কি ঘটেছিল কিছুই টের পাই নি।

সাহেবের নামটি আজও মনে আছে। বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ ভরদ্বাজ, রাস্তা মেরামত করার হাকিম সাহেব। হাকিম তো নিশ্চয়ই, যারা রাস্তা মেরামত করতে লেগেছে তাদের কাছে বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ হাকিমের চেয়ে অনেক বড়। ওঁর হুকুমেই না মানুষে এন্তার সরকারী টাকা পায়।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সাহেব সেখানে ছিলেন না। কোদাল গাঁইতি বেলচা শাবলের জঙ্গলে চোখ মেলে উঠে বসলাম। কোথায় আছি, কি করে পৌঁছলাম সেখানে, ঠাওরাতে পারলাম না। দূর থেকে চেঁচামেচি কোদাল গাঁইতি চালাবার আওয়াজ কানে এল। তখন মনে পড়ে গেল সব, দস্তুরমত কেঁপে উঠলাম। ওপর দিকে তাকাতেই হিমালয়ের সেই একখাবলা দাড়িগোঁফ মুখের খানিকটা

নজরে পড়ল। তখন মনে পড়ে গেল সম্পত্তিগুলির কথা। লাঠি কমণ্ডলু কম্বল দুখানা আর—

চাদরখানা গেল কোথায় ?

গেছে। যেটা যাবার সেটা ঠিক গেছে। কত যে বেঁধে দিয়েছিল অমরনাথ চাদরের খুঁটে তাও গুণে দেখি নি। যথেষ্টই দিয়েছিল, এক গোছা নোট ছিল, এক টাকার দু টাকার নোট হলেও কম হবে না। যাক, ভালই হল, এবারে একদম আইনসঙ্গতভাবে নিঃসম্বল হলাম। এখন ওঠা যাক। গাঁইতি কোদালের মাঝখানে বসে তো আর তপস্যা করা চলে না। যেতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। কালীকম্বলীর সেই পুঁথিখানা পেলেও বাঁচতাম। পুঁথিখানাও ছিল চাদরের খুঁটে বাঁধা। নোটগুলো গেছে দুঃখ নেই, পুঁথিখানা পেলেও হত। যাক গে, আরও ভাল হল পুঁথিখানা খুইয়ে। এবার আর মাইল-পোস্ট দেখে দেখে কোথায় চলেছি তার হিসেব রাখতে হবে না। অন্ধের মত চলতে থাকব, যেখানে সন্ধ্যা হবে রাত কাটাব। টিহরী উত্তরকাশী গঙ্গোত্রী, ছকবাঁধা পথে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছি। গঙ্গোত্রী যাওয়াটাই মূল উদ্দেশ্য। কেন ? গঙ্গোত্রী গিয়ে পৌঁছলে কি এমন চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে !

কম্বল দুখানা গুটিয়ে নিয়ে কাঁধে ফেললাম। লাঠি কমণ্ডলু হাতে করে উঠে দাঁড়ালাম। আর একবার মনে পড়ল চাদরখানার কথা, চাদরখানার এক খুঁটে বাঁধা আছে বিড়ি দেশলাই আর সেই ছোট্ট পুঁথিখানা, আর এক খুঁটে অমরনাথ বেঁধে দিয়েছে এক গোছা নোট। সবই ফেরত পেলাম, চাদরখানাই শুধু নেই। যাক, বাঁচা গেল। এতদিনে ঝাড়া হাত-পা হওয়া গেল।

একটা গর্তের মত জায়গায় গাঁইতি কোদাল শাবল বেলচার মধ্যে পড়েছিলাম। বেশ কসরত করতে হল ওপরে উঠতে। পৌঁছে গেলাম রাস্তার ওপর, সেই পথ যে পথের খানিকটা চেঁচেপুঁছে সাফ হয়ে যাওয়ার দরুণ—

পথে পা দিয়ে আর একবার বুকের ভেতরটা একটু কেঁপে উঠল যেন। তখন খেয়াল হল, যারা আমায় বাঁচিয়েছে, তুলে এনেছে সেই যমের মুখ থেকে, তাদের সঙ্গে একটিবার দেখা না করে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে! কিন্তু কোথায় তারা ? লোকজনের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে যেদিকে সেদিকে পা বাড়ালাম। একটিবার ওদের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া যাক।

পেছনে যেন বজ্রপাত হল। বিকট এক হুংকার ছাড়লে কে—"এ মহারাজ, কাঁহা চল রহা ?"

ফিরে তাকাতেই চারিচক্ষে মিলন হল। ইয়া, একেই বলে চক্ষু! অত বড় বড় দুটো চোখ যে মানুষের কপালে থাকতে পারে তা ধারণাতেও ছিল না। চোখ দুটির মালিক চার মণ ওজনের হালকা বপুখানি নিয়ে অনায়াসে অবলীলাক্রমে এ পাথর থেকে ও পাথরে টপকে পড়ে ডান পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এলেন। সামনে পৌঁছে ঘোষণা করলেন—"আমার নাম বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ ভরদ্বাজ, আমি হচ্ছি রাস্তা বানাবার হাকিম, আমার হুকুম না নিয়ে কেউ এখান থেকে চলে যেতে পারে না।"

সবিনয়ে বললাম—"আজ্ঞে হুজুর, চলে তো যাচ্ছি না আমি। ঐ গর্তটার ভেতর থেকে উঠে এলাম আপনাকে খোঁজবার জন্যে। আপনাকে খুঁজে বার করে তবে তো হুকুম নোব।"

হাকিম সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন—"আচ্ছা বেকুফ তো তুমি। কে তোমাকে হুকুম দিয়েছে ওখান থেকে উঠে আসতে ? ওখানে তোমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল যে। কিন্তু সেই হারামজাদা গেল কোথায় ? একজনকে যে তোমার পাহারায় রেখে গিয়েছিলাম।" বলেই পাহাড় কাঁপিয়ে চেঁচাতে লাগলেন কার নাম ধরে। সঙ্গে সঙ্গে অশ্রাব্য সম্বোধনগুলোও বোমার মত ফেটে পড়তে লাগল।

গাঁইতি কোদাল হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এল অনেকে। একেবারে কাছাকাছি এল না, অনেকটা তফাতে দাঁড়িয়ে হাকিম

সাহেবের পানে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসতে লাগল। কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়তে লাগলেন সাহেব, পাথর কটা লোকগুলোর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। হাত খালি হবার পর তিনি হুকুম দিলেন চা বানাবার জন্যে। যে ভাষায় হুকুম দিলেন সেটাও যতটা মনে পড়ছে তুলে দিচ্ছি।

"গিদ্‌ধড় বদমাশ্ বেয়াকুফ ভঁয়্‌সাগুলো বিলকুল ফাঁকিবাজ, সেই ভোর থেকে স্রেফ গাঁইতি কোদাল চালাচ্ছে। সরকার যেন ওদের শ্বশুর। কতবার বলেছি, হরদম চা বানাবি আর খাবি। দু দিনের কাজ দশ দিনে করবি। ওরে বাপু, পাহাড় তো আর হররোজ ধ্বসে পড়ছে না। দু দিনে এটুকু করে ঘরে ফিরে কি সেই অমুকের তমুক চুষবি?"

ঐভাবে যে মুখখিস্তি করতে পারে কেউ জানা ছিল না। প্রতি কথায় খিস্তি, চার মণ ওজনের বপুখানি যেন আগাগোড়া খিস্তিতে বোঝাই হয়ে আছে। রাস্তা বানাবার মহামান্য হাকিম বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ ভরদ্বাজ সাহেব খিস্তি না করে কথা বলেন না। আগুন হয়ে আছেন অষ্টপ্রহর, মুখ দিয়ে তাই আগুন ছুটছে। কিন্তু সে আগুনে এতটুকু আঁচ নেই। গরীব গাড়োয়ালীরা তাই হাকিম সাহেবকে নিতান্ত আপনজন মনে করে। ক্ষার। ঘন দুধে কিছু চা

পি ডাবেল্‌ইউ ডি ওয়ার্ক সরকার হয়েছে। চায়ের গন্ধও নেই, গোরখ্‌পুর জেলার কোন্ এক গাঁয়ে। বছে সেই ক্ষীরে। সত্যিকারের চরিত্র করে চাকরি পেয়েছেন। াণ এল। আর এক গেলাস ঢেলে পাহাড়ে জঙ্গলে, সেজন্যে ওঁর স্ফূর্তিরু হল।

কেন ঐরকম অদ্ভুত শখ?

ভরদ্বাজ সাহেব সেই কারণদছেন কেন?"

কাছে। কিন্তু সে অনেক প্‌কে বলে নিবিড় প্রেম, সেই নিবিড় মৌনী বাবা বলে পরিচিত হয়ো প্রশ্নটি। পাল্টে আমি একটি প্রশ্ন

ত্র পরিবার ছেড়ে পড়ে আছেন কেন

হাকিম সাহেবের খাস ক

"স্ত্রী পুত্র পরিবার !" ভরদ্বাজ বেশ ভয় পেয়ে গেল্লেন যেন।

"বিয়ে করেন নি বুঝি ?"

"বিয়ে ! কে আমাকে বিয়ে করবে ? আমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে আমার উপযুক্ত মেয়েমানুষ আছে ?"

বুঝলাম প্রশ্নটা করাই অন্যায় হয়ে গেছে। অন্যায় নয় বোকামি। বোকামিটা ঢাকা দেবার জন্যে বললাম—"ভাল করেছেন, সাধু-সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করছেন। স্বয়ং শঙ্কর বলেছেন নারী নরকের দ্বার।"

অতবড় দেহটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল যেন। অস্বাভাবিক ফরসা রঙের ওপর এক পোঁচ কালি ঢেলে দিলে যেন কে। ভরদ্বাজ শ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলেন—"সত্যিই আপনি বিশ্বাস করেন ? যিনিই বলে থাকুন ঐ কথাটা তাঁর মা ছিল না নিশ্চয়ই। খুব সম্ভব তিনি আকাশ থেকে পড়েছিলেন বা মাঠি ফুঁড়ে উঠেছিলেন। আমার মা আছেন মহারাজ, মায়ের কাছে যখন যাই আমি তখন এতটুকু ছেলে। আমার মা আমার মাথায় তেল দিয়ে দেয়, আমাকে খাইয়ে দেয়, খেতে পারছি না বললে পিঠে কিল মারে।"

চাপা দেবার জন্যে যা মুখে এল বলে ফেললাম—"না না, মায়ের কথা হচ্ছে না, মায়ের কথা হচ্ছে না। মা হলেন দেবী, সাক্ষাৎ দেবী। তাই তো বলেছে যে মাতৃভক্ত সন্তান সব চেয়ে বড় পুণ্যবান।"

আমার বক্তব্য বোধ হয় কানেই গেল না, অন্যমনস্ক ভাবে সামনে থেকে পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগলেন ভরদ্বাজ। অন্যমনস্ক অবস্থাতেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"এই সময় একলা এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন ? বেঘোরে মারা পড়বেন যে। বাঙালীর ছেলে, বোমা বানাতেন বুঝি ?"

"বোমা !"

"কটাকে সাবাড় করেছেন এ পর্যন্ত ?"

"সাবাড় করেছি ! এসব কি বলছেন আপনি ? কাকে সাবাড় করব ?"

ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করে আমার পানে তাকিয়ে কতকটা যেন স্বগতোক্তির মত বলতে লাগলেন ভরদ্বাজ—"পুণ্য কামাতে বেরিয়েছে এই মানুষ! উঁহুঁ, অত সহজে আমাকে ভোলানো যাবে না। সাধু হবার জন্যে মরতে এসেছে এখানে? দূর, তাও কি হয়। সাধু হতে চাইলে সাধুদের দলে ভিড়ে যেত, শেঠ-শেঠানীদের নজরে পড়বার জন্যে যাত্রার সময় আসত। হয় খুন নয় মেয়েমানুষ নয়—"

হেসে ফেললাম। একদম ছেলেমানুষ, অতবড় দেহটার ভেতর সত্যিকারের একটা শিশু বেঁচে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম- "কত দিন এই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছেন ভরদ্বাজজী?"

"তা পাঁচ সাত দশ বছর তো হলই, বেশীও হতে পারে।"

"এ তল্লাটে রয়েছেন এতদিন, একজনও সাধু মহাত্মার সঙ্গে দেখা হয় নি?"

"এন্তার এন্তার, ভেড়া বকরী সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া আর কি পাবেন এখানে। খুনে ডাকু চোর বদমাশ মাঝে মাঝে দু-একজন আসে, সাধুদের জ্বালায় টিকতে পারে না। হয় পালায় নয়ত ধরা পড়ে যায়।"

"খুব উঁচুদরের কোনও মহাত্মার সঙ্গে দেখা হয় নি আপনার? যাকে দেখে ভক্তি হয়, মনে শান্তি পাওয়া যায়?"

"হবে না কেন, তাও হয়েছে। তবে উঁচুদরের মহাত্মাদের ধারে কাছে যাওয়া যায় না। বড় বড় শেঠ-শেঠানীরা ঘিরে থাকে কিনা তাঁদের। রাস্তা বানাবার হাকিম ভরদ্বাজ বেটা সেখানে ঘেঁষতে পারবে কেন?"

"না না ভরদ্বাজজী, তাঁদের কথা বলছি না। সে সমস্ত মোটরে চড়া বড়মানুষ মহাত্মারা দিল্লী বম্বাই কলকাতাতেও ঘুরে বেড়ান। আমি জানতে চাচ্ছি তাঁদের কথা। নির্জনে বসে যাঁরা তপস্যা করছেন, কোনও রকম ভড়ং নেই যাঁদের। গাছের পাতা খেয়ে যাঁরা জীবন ধারণ করেন বা কিছুই খান না। আমি এসেছি তাঁদের খোঁজ করতে যাঁরা হচ্ছেন—"

হঠাৎ আমার হাঁটুর ওপর প্রচণ্ড এক থাপ্পড় কষিয়ে ভরদ্বাজ বললেন—"কি লাভ হবে আপনার তাঁদের খুঁজে বার করে? গাছ পাথর হয়ে গেছেন তাঁরা, সাড়াই দেবেন না। চেলা বানাবার গরজ নেই তাঁদের, কাউকে ধার্মিক বানাবারও গরজ নেই। আর গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী কেদার-বদরীর যাত্রাপথের ধারে কাছেও তাঁরা থাকেন না। তাঁদের দর্শন পেতে হলে—"

ভরদ্বাজের বিশাল থাবাটা দু হাতে জাপটে ধরে বললাম—"বলুন না ভরদ্বাজজী, কোথায় দেখা পাব তাঁদের। কিছুই চাইব না আমি, শুধু একটিবার দেখব। একটি কথাও বলতে চাই না, চেলা বনতেও চাই না। কিচ্ছু চাই না, শুধু—"

যে মানুষটা ইতরামি মুখখিস্তি ছাড়া কথা বলছিল না, সে মানুষটা নয় যেন। আলাদা একজন, যার ওপর ভেতর সদর মফস্বল বলতে কিচ্ছু নেই, এমন একজন মানুষ নীরবে শুধুমাত্র চোখের চাউনি দিয়ে মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দিলে—"হবে হবে, যা খুঁজতে এসেছ তা দেখতে পাবে।"

দিন দুয়েকের ভেতর পথ তৈরী হয়ে গেল। খুবই সোজা ব্যাপার, যেখানটা দিয়ে ধ্বস নেমেছে সেখানেই খানিকটা কেটে পায়ে চলার মত ব্যবস্থা করে দেওয়া। আপাততঃ ঐটুকুই যথেষ্ট। আর যদি না ভাঙে ঐ জায়গাটা, তাহলে দিন পনের পরে আবার চওড়া করে কাটা হবে। তার আগে ওভারসিয়ার এঞ্জিনিয়ার সাহেবরা জায়গাটা দেখবেন। দেখে যদি বলেন ঐখানেই রাস্তা বানানো যাবে তাহলে কাজ হবে। নয়ত ঐ পর্যন্তই হল। নতুন রাস্তা কোথা দিয়ে তৈরী হবে তা খুঁজে বার করে সাহেবরা অন্য লোক পাঠাবেন। ভরদ্বাজ সাহেবের কাজ হচ্ছে মেন্‌টেন্যান্‌স্‌, সরকারী লোকজন সঙ্গে নিয়ে হরদম উনি পথ পাহারা দিচ্ছেন। ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু ব্যবস্থা করা চাই, যাতে লোকজন কোনও রকমে পারাপার

হতে পারে। নতুন রাস্তা বানায় ঠিকাদার, সেটা মেনটেন্যান্স্ ডিপার্টমেন্টের কাজ নয়।

অতঃপর লটবহর গুটিয়ে নিয়ে ভরদ্বাজ সাহেবের সৈন্যসামন্তরা টিহরীর দিকে চলে গেল। আমাকে নিয়ে ভরদ্বাজ অন্য পথ ধরলেন। একটি মাত্র মানুষ চলল আমাদের সঙ্গে। মস্ত এক পোঁটলা রুটি হালুয়া আর একটা ক্যাম্বিসের থলে ভরতি জল নিয়ে লোকটি আগে আগে চলল। সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

একটা শুকনো ঝর্ণা অবলম্বন করে ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রায় খাড়া চড়াই ভেঙে জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। চারিদিকে বহু দুর পর্যন্ত নজর পৌঁছল। সেখানেই রাত কাটাতে হবে। ভোরে উঠে সমানে নেমে যেতে হবে। দুপুরবেলা পৌঁছব ভৃগু গঙ্গার ধারে। ভৃগু গঙ্গার ওপারে মহাত্মাজীর আসন। পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

আর একটু হলেই মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ছিল—"ফিরব কেমন করে?" সর্বনাশটা হবার আগেই সামলে গেলাম। ঐ প্রশ্নটা করবার সঙ্গে সঙ্গে ভরদ্বাজ যদি জিজ্ঞাসা করত—"আবার ফিরতে চাইছ কেন?"—তাহলে কি জবাব দিতাম! ফেরবার প্রশ্নটা মনের ভেতর উঠছে কেন? যাঁর কাছে চলেছি, তিনি যদি কৃপা করেন তাহলে ফিরছে কে! কৃপালাভ করবার জন্যেই না চলেছি।

জিভটা কামড়ে মনে মনে বলতে লাগলাম—

অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো, বিভুর্ব্যাপী সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বাবন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্॥

আমি নির্বিকল্প আমি নিরাকার, সকল ইন্দ্রিয়ের বিভু আমি, আমিই সর্বব্যাপী সেই ঈশ্বর। আমার বন্ধন নেই মুক্তি নেই ভয় নেই, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমি, আমিই শিব-সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম।

আসুরিক ভোজন যাকে বলে। রুটি হালুয়া মিলিয়ে সের তিনেক

মাল উদরগর্ভে প্রেরণ করে ভরদ্বাজ শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল নাসিকা-গর্জন। কিসের সঙ্গে তুলনা করি সেই গর্জনের! মেঘ ডাকার মত নয়, পুরীতে গভীর রাত্রে একলা সমুদ্রের ধারে বসে যে গর্জন শুনেছি সেরকম ব্যাপারও নয়। একেবারে আলাদা ব্যাপার। মাদারিপুরের কাছে চর্মগুড়িয়া বলে একটা মস্ত বড় গঞ্জ ছিল, এখন আছে কি না জানি না। সেইখানে বড় বড় টিনের গুদোম ছিল। একবার সেই চর্মগুড়িয়া বাজারে কয়েক রাত কাটাতে হয়। দুটো নদীর সঙ্গমস্থল বলে প্রায়ই ঝড় হয় ওখানে। ঝড় মানেই ঘূর্ণি, বহু নৌকো ডোবে, বহু গুদোমের চাল উড়ে যায়। এক দিন রাত্রে সেই ঘূর্ণি ঝড় উঠল। টিনের গুদোমগুলোর ওপর দমকে দমকে আছড়ে পড়তে লাগল যেন কিছু। সঙ্গে সঙ্গে উঠল একটা আওয়াজ। একটা গোঁ গোঁ শব্দ, হাজার হাজার প্রাণী মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে যেন। সারারাত কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে সেই আর্তনাদ শুনেছিলাম আর কেঁপেছিলাম। সেই বীভৎস আর্তনাদের সঙ্গে খানিকটা মেলে ভরদ্বাজের নাসিকা-গর্জন। তফাৎ অবশ্য আছে একটু; চর্মগুড়িয়া বন্দরের ঘূর্ণিঝড়ের আর্তনাদ মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে আবার শুরু হচ্ছিল, ভরদ্বাজের নাসিকার আর্তনাদ সমানে চলতে লাগল। ছেদহীন ছন্দহীন সেই প্রলয় সঙ্গীত শুনতে শুনতে রাত কাবার হল। ভোর হবার আগেই ভরদ্বাজ খাড়া হয়ে বসলেন, ঠাণ্ডা হল বিশ্বচরাচর। তৎক্ষণাৎ আমরা রওয়ানা হলাম।

তারপর নামার পালা। নামতে নামতে পৌঁছলাম যখন ভৃগু গঙ্গার কূলে তখন সূর্যদেব মাথার ওপর এসে পৌঁছেছেন। ভৃগু গঙ্গায় ঘটি ডোবে না, আঁজলা আঁজলা জল তুলে গায়ে মাথায় থাবড়ে স্নান সমাপন করা গেল। ভাবলাম, আর একবার বুঝি সেই রুটি হালুয়ার পোঁটলা খোলা হবে। না, সে দুর্ঘটনাটা আর ঘটল না। এক এক ডেলা গুড় চিবিয়ে ওঁরা জলপান করে নিলেন।

আবার হাঁটুনি, ভৃগু গঙ্গার কূলে কূলে চলতে লাগলাম। উঠছি

উজানে, এ পাথর থেকে ও পাথরে লাফিয়ে পড়ে, কখনও বা পায়ের গোছ সমান জলের ভেতর দিয়ে এগোতে হচ্ছে! শরীর আর তখন বইতে চাইছে না, মাথা ঘুরছে, পা দুখানা পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। রুটির পোঁটলা পিঠে নিয়ে সঙ্গের সাথীটি অনেক আগে আগে চলেছে। ভরদ্বাজ আমার সামনেই রয়েছেন, তেমন তেমন জায়গায় হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। সেই হাত ধরে আমি পার হচ্ছি।

হঠাৎ এক চিৎকার শোনা গেল। পেছন ফিরে ভরদ্বাজ বললেন—"এসে পড়েছি। মহাত্মাজী আছেন, তাই ঐ লোকটা চেঁচিয়ে উঠল।"

বুকে বল পেলাম। শরীরের কথা তখনকার মত ভুলে গেলাম যেন। আরও খানিক এগিয়ে যাবার পর ভরদ্বাজ থেমে পড়লেন। ওপর দিকে মুখ তুলে সামনের পাথরে কি যেন দেখতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ দেখে বললেন—"ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। তাহলে আছেন তিনি। আমাদের বরাত ভাল।"

"কোথায়, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না আমি।"

"ঐ যে, ঐ ওপরে, দেখতে পাচ্ছেন না ধোঁয়া ?"

দেখলাম, খুবই ভালভাবে দেখতে পেলাম। নিশ্চয়ই উচিত ছিল উল্লসিত হয়ে ওঠা, অত কষ্টের পর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে চলেছে বলে আনন্দে চিৎকার করে ওঠাই উচিত ছিল। কোথায় কি! এবার সত্যি সত্যিই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। আবার ঐ ওখানে এখন উঠতে হবে ?

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আর এক পা বাড়াবার সামর্থ্য নেই।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ভরদ্বাজ ডাক দিলেন—"আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?"

কে যাবে!

ফিরে এলেন ভরদ্বাজ। মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—"এ কি! কাঁদছেন যে ?"

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধভাবে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর

একখানা হাত ধরে বললেন—"আসুন, আজকে এখানেই বিশ্রাম। আর কয়েক পা গেলেই একটা গুহা পাব। চমৎকার জায়গা, রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোরে উঠে ঐ পাহাড়ে চড়ব। বড় জোর ঘণ্টাখানেক লাগবে, মহাত্মার সামনে পৌঁছলেই সব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে। আসুন—"

সেদিন রাত্রে ভৃগু গঙ্গার কূলে শুয়ে ভরদ্বাজের নাসিকা-গর্জন শুনতে শুনতে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করলাম—"কে বলেছিল তোমায় এই সংকল্পটা করতে? মহাপুরুষ দর্শন করবার সংকল্পটা করে মরতে গেলে কেন?" গুরুবাক্য মনে পড়ল—সংকল্প ক্ষয়ের নাম মুক্তি।

নিত্যানিত্যবস্তুবিচারাদনিত্যসংসারসমস্তসংকল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ।

হায় মুক্তি!

৪

"মহাত্মাজী বাহার হো গিয়া !"

একদম খতম। কথাটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলাম, ভরদ্বাজ ধরে ফেললেন। বসে পড়লাম সেখানেই, আর সামর্থ্য নেই। সবটুকু শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ করে ভোর থেকে খাড়া পাহাড় বেয়ে চার হাতে পায়ে উঠেছি। যে আশায় করেছি ঐ অসম্ভব কাণ্ড, সে আশায় ছাই পড়ল। আর কত সহ্য হয় !

আমাকে বসিয়ে রেখে কয়েক লাফে গুহাটার মুখে পৌঁছলেন ভরদ্বাজ, মিনিট খানেক বা মিনিট দুয়েক পরে নেমে এলেন আবার। আমার নড়া ধরে হেঁচকা মেরে তুলে বললেন—"চল, দর্শন পাবে, মহাত্মা আছেন।"

"তবে যে ঐ লোকটা বললে—"

"ঠিকই বলেছে। শরীর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন এখন, শরীর রয়েছে, ঠিকই ফিরে আসবেন।"

বলে কি !

আবার উঠলাম খানিকটা, নিজের শক্তিতে উঠলাম বললে ভুল বলা হবে, ভরদ্বাজ ওপর থেকে টেনে টেনে তুললেন। যেখানে উঠলাম সেখানে দুটো গুঁড়ি ধোঁয়াচ্ছে। ঠিক তার পেছনেই গুহা, ভেতরটা অন্ধকার। ভরদ্বাজ বললেন—"যাও ভেতরে, দুজনে গেলে জায়গা হবে না। সাবধানে গিয়ে দেখে এস।"

গুড়ি মেরে ঢুকলাম। হাত পাঁচেক যাবার পরে অন্ধকারেই নজরে পড়ল। তৎক্ষণাৎ ফিরে এলাম বাইরে। যা দেখলাম, তা যেন বিশ্বাস করতেই পারলাম না।

ভরদ্বাজ তখন বসে পড়েছেন। ইশারা করলেন তাঁর পাশে বসবার জন্যে। বসবে কে, তখন পালাতে পারলে বাঁচি। ভূত

প্রেত পিশাচ না সত্যিই একটা মানুষের দেহ দেখলাম গুহার মধ্যে।

কানের কাছে মুখ এনে ভরদ্বাজ অভয় দিলেন- "ঘাবড়াও মৎ, বাবা যখন দেহ ছেড়ে বাইরে যান তখন দেহটা ঐভাবে খাড়া হয়ে থাকে। যখন ফিরে আসবেন দেহে তখন আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

"হেঁটমুণ্ডে শূন্যে ঝুলছেন কি ভাবে? পা দুটো কি ওপরে কিছুর সঙ্গে বাঁধা আছে?"

"একটু ঠাণ্ডা হও। জিরিয়ে নিয়ে আবার দেখে এস ভেতরে গিয়ে, দেখলেই সব বুঝতে পারবে।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ধাতস্থ হল। আবার গেলাম গুহার ভেতরে। আলো আছে ভেতরটায়, গুহামুখ দিয়ে যেটুকু আলো যাচ্ছে ভেতরে তাইতেই সবটুকু স্পষ্ট দেখা গেল। গুহার মুখটাই ছোট, ভেতরটা অনেক উঁচু। অনেক উঁচুতে ছাত, ছাত থেকে কিছুই ঝুলছে না। পা দুখানা কোনও কিছুর সঙ্গে বাঁধা নেই। নিচে মাথাটা ঝুলছে মেঝে থেকে অন্ততঃ তিন হাত ওপরে। হাত দুখানা ঝুলছে না, বুকের ওপর মোড়া রয়েছে। একটা মানুষ, হাঁ মানুষ নিশ্চয়ই, বাদুড় নয়।

চুপচাপ বেরিয়ে এলাম।

যা কিছু জেনেছি শিখেছি বুঝেছি সমস্তই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

শরীর কি? স্থূল শরীরে আছে সাতটি ধাতু—

শুক্রশোণিতমজ্জা চ মেদোমাংসঞ্চ পঞ্চমং।
অস্থি ত্বক্ চৈব সপ্তৈতে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ॥

অন্নময়কোষ হচ্ছে শরীর। শুক্র শোণিত মজ্জা মেদ মাংস অস্থি ত্বক্ এই সাতটি পদার্থ আছে শরীরে। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম পঞ্চভূত থেকে তৈরী হয়েছে ঐ সাতটি ধাতু। যেমন মাটি থেকে

জন্মেছে অস্থি মাংস নখ ত্বক লোম, জল থেকে জন্মেছে শুক্র শোণিত মজ্জা মল মূত্র, তেজ থেকে জন্মেছে ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি আলস্য নিদ্রা, বায়ু থেকে জন্মেছে ধারণ চালন ক্ষেপন সঙ্কোচ প্রসারণ, আর আকাশ থেকে জন্মেছে কাম ক্রোধ লোভ মোহ লজ্জা। এই এতগুলো জিনিস আছে শরীরে তাই আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ ভোগ করছি। সেই শরীর শূন্যে ঝুলছে! মাটির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এই অবস্থায় আকাশে ভাসছে শরীরটা!

আগাগোড়া যা কিছু শিখেছিলাম সমস্ত মিলাতে বসলাম। স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীর কারণ শরীর।

অন্নময়কোষ স্থূল শরীর। ঐ স্থূল শরীরেই রয়েছে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, শব্দের জন্যে রয়েছে কর্ণ, স্পর্শের জন্যে ত্বক, রূপের জন্য চক্ষু, রসের জন্য রসনা, আর ঘ্রাণের জন্য নাক। আর ঐ পঞ্চতত্ত্ব থেকেই মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার জন্মেছে। শাস্ত্র বলছে—

বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈ র্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

পঞ্চপ্রাণ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় আর মন বুদ্ধি এই সতেরোটি জিনিস হচ্ছে সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর। এই সূক্ষ্মশরীরকে স্থূলশরীর থেকে আলাদা করা যায় প্রাণায়ামের দ্বারা। যোগদর্শনে বলা হয়েছে—তস্মিন সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ছেদ করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়াম আট প্রকার।

সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা।
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভিকাঃ॥

সহিত সূর্যভেদ উজ্জায়ী শীতলী ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্ছা কেবলী এই হচ্ছে আট রকমের কুম্ভক বা প্রাণায়াম। কেবলী প্রাণায়াম সিদ্ধ যোগী তাঁর শরীরকে শূন্যে স্থির রাখতে পারেন।

খুবই বাসনা হল মুখস্থ শ্লোক কয়েকটা শুনিয়ে ভরদ্বাজ বেচারাকে তাজ্জব বানিয়ে ছাড়বার। বলতে পারতাম—“বাপু হে, তোমার ঐ

মহাত্মা যা দেখাচ্ছেন সেটা শাস্ত্রেই আছে।" বলতে সাহস হল না। শাস্ত্রে তো আরও অনেক কিছুই লেখা আছে। পড়েছি, মুখস্থ করেছি, ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু এ কি দেখলাম! কখনও কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম যে ঐভাবে একটা পঞ্চভৌতিক দেহকে সত্যিই আকাশে ভাসতে দেখব!

ভরদ্বাজ সঙ্গীটিকে নিয়ে নেমে গেলেন, স্নান আহার করতে হবে। আমি শুয়ে পড়লাম ধুনির পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে। সেই রুটি আর হালুয়া গেলবার জন্যে নামব আবার উঠব? অমন খাওয়া মাথায় থাকুক। ঐ যে মানুষটি হেঁটমুণ্ডে নিরালম্ব হয়ে রয়েছেন কি খান উনি? অনেকবার শোনা শ্লোকটি মনে পড়ে গেল—

তালুমূলগতাং যত্নাৎ জিহ্বয়াক্রম্য ঘন্টিকাং
ঊর্দ্ধরন্ধ্রগতে প্রাণে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥

জিভকে উল্টে আলজিভটাকে চেপে আরও ভেতরে পাঠাতে পারলে প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়। প্রাণবায়ু রুদ্ধ হলে ক্ষুধা তৃষ্ণা আলস্য মূর্ছা কিছুই থাকে না।

আরও কত শ্লোক কত শাস্ত্রবাক্যই না মনে পড়ল। রাশি রাশি পুঁথিপত্র ঘাঁটকেছি, পণ্ডিতদের সঙ্গে কলহ কচকচি করে শ্লোকগুলোর আসল অর্থ জানবার জন্যে চেষ্টা করেছি। তারপর সমস্তই স্রেফ গাঁজাখুরি বলে নিজেকে বুঝিয়ে শান্ত করেছি। গাঁজাখুরি ব্যাপার-গুলোর সঠিক অর্থ এত দিন পরে সশরীরে চোখের সামনে সমুপস্থিত হয়েছে। ঐ মানুষটি কি খায়! ঐ পঞ্চভৌতিক দেহটা ঐ অন্নময়-কোষটা কি খেয়ে টিকে আছে!

অতএব মেরে দিয়েছি, এত দিন পরে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে গেছি, আর আমায় পায় কে। বাবা তারকনাথের দরজায় হাঁপানি অম্বলশূল সারাবার জন্যে লোকে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। জ্যান্ত তারকনাথের কাছে পৌঁছে ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি ছুটোকে জন্মের শোধ দূর করবার

জন্যে হত্যে দোব না আমি! পড়ে রইলাম হত্যে দিয়ে, যবে খুশি, যতদিন পরে খুশি ফিরে আসুন মহাপুরুষ। যতদিন না ফিরছেন ততদিন এক পা নড়ছি না। এবং জলস্পর্শও করছি না। ওঁর ঐ অন্নময়কোষ যেভাবে টিকে আছে, ওঁর যদি কৃপা হয় তাহলে আমার শরীরও সেইভাবে টিকবে। নয়ত শরীর যাবে। স্বয়ং শিব বলেছেন—

মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে।
শোরতেহ্এ শবীভূত্বা শ্মশানস্তু ততোভবেৎ॥

সমস্তই শব, এই বিশ্বটাই আস্ত একখানা মহাশ্মশান, আর এই মহাশ্মশানে আমি একলা অষ্টপাশ থেকে মুক্তি পাবার আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম।

শরীর আর মন নিয়ে যে আমি, সেই আমি হয় জেগে থাকি, নয় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি। আর একটা অবস্থাও হয় নাকি আমার, সেটার নাম সুষুপ্তি। তখন আমি জেগেও থাকি না, ঘুমিয়েও থাকি না, কি অবস্থায় যে থাকি তা জানতেও পারি না। বিজ্ঞানীরা বলেন, মন তখন ঘুমিয়ে পড়ে, মন কোনও কাজ করে না। হয়তো তাই, মন ঘুমিয়ে থাকে বলেই সুষুপ্তি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। শাস্ত্রে হয়তো একেই মনলয়যোগ বলেছে। আমি কিন্তু হলফ করে বলতে পারি সেদিন আমি ঐ সুষুপ্তি অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। উপোস আর পরিশ্রম, এমন পরিশ্রম যে হাড়মাংসের বোঝাটাকেই আপদ বলে মনে হচ্ছিল, সেই আপদ শরীরটাকে কোনও রকমে মহাপুরুষের গুহার সামনে টেনে তোলবার পর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম যখন, তখন মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার যাবতীয় ব্যাধি আমাকে ত্যাগ করে দূর হয়ে গেল। আমি ঘুমিয়ে রইলাম। সে ঘুমে স্বপ্নের ছিটেফোঁটা ভেজাল ছিল না। জানি না, এটাকেই সুষুপ্তি বলা যায় কি না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সর্বপ্রথম যা মালুম হল তা হচ্ছে শীত।

নিদারুণ শীতে বুকের ভেতর কাঁপছে। কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিলাম, হাত-পা সোজা করতে গেলাম। ওরে বাব্বা! শীতটা হাজার গুণ বেড়ে গেল। তখন প্রকৃত ব্যাপারটা সেঁধুলো মগজে। ঝমাঝম্ বৃষ্টি পড়ছে, ওপরের কম্বল তার তলার চাদর ভিজে এমন ভারী হয়েছে যে সেগুলোর নিচে থেকে বেরুবারও শক্তি নেই। আর এক মুশকিল, দম আটকে আসছে। ভিজে চাদর কম্বলের তলায় শ্বাসপ্রশ্বাস নোব কেমন করে ?

যেন ডুবে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি যেন জলের তলায়, এই ধরনের একটা সাংঘাতিক অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ কাটল। সেই প্রচণ্ড শীত আর টের পাচ্ছি না তখন, শীতের বদলে আগুন, শরীরের ভেতর যেন আগুন জ্বলে উঠল। তখন অন্তিম চেষ্টায় উঠে বসলাম, ভিজে চাদর কম্বলগুলোর খপ্পর থেকে মুক্তি পেয়ে খুব জোরে জোরে দম টানতে লাগলাম। পড়তে লাগল বৃষ্টি মুখে মাথায়, পড়ুক। হাঁ করে খানিকটা বৃষ্টি মুখের ভেতর নিয়ে গিলে ফেললাম। ধড়ে প্রাণ এল।

নিদারুণ অন্ধকার, চোখ মেলে আছি, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়ে গেলাম না তো !

পড়ছে বৃষ্টি মাথার ওপর, সর্বাঙ্গ দিয়ে হুড় হুড় করে জল নামছে। শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিকভাবে চালু হবার পর আবার শীত আরম্ভ হল। ভরদ্বাজের কথা মনে পড়ল, ভরদ্বাজের সঙ্গীটির কথা মনে পড়ল। কোথায় গেল তারা ? এই অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে—

সেই মুহূর্তে কাঠ হয়ে গেলাম। মনে পড়ে গেল গুহার ভেতর যা দেখেছি। আবার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হল। তখন খুব সাবধানে আন্দাজ করে নিলাম ধুনির সেই গুঁড়ি দুটো কোন্‌দিকে কোথায় আছে। দু হাত বাড়িয়ে একটু একটু করে বসে বসে এগিয়ে গিয়ে গুঁড়ি দুটোকে ছুঁতে পারলাম। আগুন নিভে গেছে।

সেই অবস্থায় বসে বসেই গুঁড়ি দুটোকে ঘুরে ওধারে গিয়ে পৌঁছলাম। তারপর হামাগুড়ি, আর ভুল হবার ভয় নেই, গুহাটার

মুখে পৌঁছে গেছি। আর একটু এগোবার পর ওপর থেকে জল পড়াটা বন্ধ হল।

তারপর কি করব!

আর একবার সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা চোখ বুঁজে দেখে নিলাম। একটা আস্ত মানুষ ঝুলছে, হেঁটমুণ্ডে মাটি থেকে তিন হাত ওপরে ঝুলছে। এবং কোনও কিছুর সঙ্গে বাঁধা নেই পা দুখানা।

শীতে নয়, অন্য কোনও কারণে বুকের ভেতরটা আর একবার কেঁপে উঠল। মনে মনে বললাম—"তুমি মানুষ, আমিও মানুষ, তোমার কাছে আশ্রয় নিচ্ছি, অপরাধ ক্ষমা কর।"

তারপর হামাগুড়ি দিয়েই আরও খানিক এগিয়ে গেলাম ভেতরে। কি করব তখন! মানুষ মানুষের কাছেই তো আশ্রয় নেবে। অন্ধকার বৃষ্টি শীত, সব চেয়ে বড় শত্রু ভয়, সবাই বাইরে রইল। বেঁচে গেলাম।

হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছি। মনে হল কে যেন মাথার ওপর হাত রাখল। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, ভয় পেলাম না বা চমকে উঠলাম না। মন বুদ্ধি তখন বোধ হয় অচল হয়ে পড়েছিল, কে চমকাবে। একটু পরে শুনতে পেলাম—"লেও, খা লেও।"

মুখ তুলে দু হাত জোড় করে পাতলাম। কি যেন একটা পড়ল হাতের ওপর। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, হাত তুলে জিনিসটা মুখে পুরে ফেললাম। বেশী বড় নয়, একটা বড় গোছের সুপুরির মত গোল পদার্থ, মুখের ভেতর কয়েকবার নাড়াচাড়া করতেই স্বাদটা টের পেলাম। ঝাল নয় টক নয় নোনতা নয় মিষ্টি নয়, কিন্তু একটা স্বাদ আছে। অদ্ভুত স্বাদ, কোনও কিছুর সঙ্গে তুলনা করে স্বাদটা বোঝাতে পারব না। একটু পরে বুঝতে পারলাম জিনিসটা মুখের মধ্যে গলে যাচ্ছে। তখন একটা অদ্ভুত গন্ধ পেলাম। গলতে গলতে জিনিসটা পেটে চলে গেল, গন্ধটা কিন্তু রইল। গন্ধটা বুঝতে পারলাম, সদ্য তোলা পদ্মফুলে ঐরকম গন্ধ পাওয়া যায়। তারপর বহুদিন

গন্ধটা আমার দেহের ভেতর ছিল। শ্বাসপ্রশ্বাসের ওপর নজর রাখলেই সেই মৃদু গন্ধটা পেতাম। আর গন্ধটা পেলেই মনে পড়ত তাঁর কথা। সত্যিকারের মানুষ, পঞ্চভৌতিক দেহধারী মানুষ একজন শূন্যে দেহটাকে ভাসিয়ে রেখেছেন, রেখে নিজে দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই তাজ্জব কাণ্ডটা মনে পড়ে যেত। সেই রাতে সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে বসে ওসব কিছুই উদয় হয় নি মনে। খুবই নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছিলাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা ভয়-ভাবনা বিলকুল দূর হয়ে গিয়েছিল। তার বদলে এক জাতের বিচিত্র তৃপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। পরম আত্মীয়কে কাছে পেলে যে রকম শান্তি পায় মানুষ অনেকটা সেই রকম একভাবে পেয়ে বসেছিল যেন আমাকে। যা পাবার তা তো পেয়েই গেছি, আর ভাবনা কি !

ভোর হয়ে এল। গুহার মুখে আবছা আলো পড়ল। বৃষ্টি থেমে গেছে। শরীরে এতটুকু কষ্ট ক্লান্তি নেই। এত হালকা লাগছে শরীর যে ইচ্ছে করলে উড়তেও পারি যেন। হঠাৎ একটা নতুন ভাবনা উদয় হল মনে। চলে যেতে হবে নাকি ?

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক মুষড়ে পড়লাম, হাত-পাগুলো আবার অসাড় হয়ে উঠল। উৎকণ্ঠা ভয় ভাবনা সমস্ত ফিরে এসে ঘাড়ে চাপল। এমন কি শীতটাও, যে শীতকে গুহার বাইরে রেখে প্রায় সারাটা রাত কাটালাম, সেই শীত হঠাৎ গুহার ভেতর ঢুকে আমাকে মুখের ভেতর পুরে ফেললে। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে ঐ একই কথা ভাবতে লাগলাম—আবার চলে যেতে হবে না তো ?

আবার মাথার ওপর হাত পড়ল। এবার দেখতে পেলাম। শুধু হাত দেখলাম না, যাঁর হাত তাঁকেও দেখলাম। হেঁটমুণ্ডে শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় নয়, পায়ের ওপর খাড়া রয়েছেন। ডান হাতখানি আমার মাথার ওপর, বাঁ হাতখানি নিজের বুকে ভাঁজ করা রয়েছে। তাকিয়ে-ছিলাম শুধু চক্ষু দুটির পানে, অন্য কিছুই দেখতে পারি নি। চক্ষু

দুটিতে কি ছিল বলতে পারব না, শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে সেই চোখ দুটির পানে তাকিয়েই আমার যাবতীয় ভয় ভাবনা উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেল।

আর একবার সেই আদেশ হল—"লেও, খা লেও।"

হাত পেতে নিলাম, মুখে ফেললাম। জিনিসটা মুখের মধ্যে মিলিয়ে যাবার আগেই শেষ কথাটি শুনলাম।

"আবার দেখা হবে, নিশ্চিন্ত হও।"

বাইরে ভরদ্বাজের চিৎকার শোনা গেল। যাচ্ছেতাই খিস্তি করতে করতে উঠে আসছেন। গাল দিচ্ছেন নিজেকেই, তাঁর মত ইয়ের ইয়ে আর একটাও নেই দুনিয়ায়। তোর ঘুমের ইয়ের ইয়ে করেছে, এমন ঘুমের ইয়ের ইয়ে করতে হয়। বেচারা ভালমানুষ বাঙালীটা তাঁর ওপর বিশ্বাস করে এসেছে, মরেই গেল হয়তো বেচারা। হায় হায়, এরপর তিনি কি করে মুখ দেখাবেন। ইয়ের ইয়ে করে দিতে হয় মুখে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেলাম। আর একবার ইয়ের ইয়ে ভরদ্বাজের মুখে ইয়ের ইয়ে করে শেষটুকু উঠে সামনের দিকে তাকালেন ভরদ্বাজ। মুহূর্ত-মধ্যে তাঁর বিশাল মুখখানা আলোয় আলো হয়ে উঠল। একলাফে আমার সামনে পড়ে দু হাতে আমাকে জাপটে ধরে প্রচণ্ড বিক্রমে মাথার ওপর মুখ ঘষতে লাগলেন। সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরুতে লাগল তাঁর ভেতর থেকে, যেন গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। উচ্ছ্বাসটা নিঃশেষ হবার পরে আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবার সেই ইয়ের ইয়ে বিশেষণে নিজেকে বিশেষিত করে যা বললেন, তার মোদ্দা অর্থটা হল ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রুটি হালুয়া খেয়ে একটু শুয়ে পড়েছিলেন, আর অমনি ঘুম। ঘুম ভাঙতেই ছুটে আসছেন। কিন্তু এ কি! খালি গায়ে রয়েছ যে? চাদর কম্বল গেল কোথায়? শীত করছে না?

ধুনির ওপাশে চাদর-কম্বলগুলোর ওপর নজর পড়ল। তেড়ে গিয়ে তুলে নিলেন হাতে করে। আরে এ কি। সব ভিজে কেন? জল এল কোথা থেকে?

গলা খাটো করে বললাম—"খুব বৃষ্টি হয়েছে যে রাত্রে।"

"বৃষ্টি! টের পাই নি তো?" ভরদ্বাজের ছানাবড়া চোখ দুটো কতবেলের মত হয়ে গেল।

"কোথায় শুয়েছিলেন আপনি? নিশ্চয়ই এমন জায়গায় শুয়েছিলেন যে—"

"হ্যাঁ জায়গাটা গুহার মতই বটে। কিন্তু শীত করছে না তোমার? সারারাত বৃষ্টিতে ভিজলে?"

"না, ঐ ওখানে ঢুকে বসেছিলাম।"

"ওখানে? ঐ ওর ভেতরে? তার মানে—"

বাক্‌রোধ হয়ে গেল বেচারার। সত্যিই যেন বেচারা বেচারা মনে হল তখন ভরদ্বাজকে। এমনভাবে তাকিয়ে রইল আমার পানে যেন সেই প্রথম দেখল। অনেকক্ষণ পরে একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বলল—"কপালে নেই তা আর কি হবে। খিদে আর ঘুমের জ্বালাতেই সব কিছু পণ্ড হয়ে গেল। প্রথম বার এসেই তুমি বাবার দয়া পেলে। এবার নিয়ে আমার এই সাত বার আসা হল এখানে। হয় বাবা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যান, নয়ত ঐ ধুনির সামনে পাথরের মত বসে থাকেন। একটিবারের জন্যে চোখ মেলেও তাকালেন না আমার পানে—"

স্পষ্ট দেখতে পেলাম, অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল যেন অতবড় দেহটা। মুখ নিচু করে ভরদ্বাজ দাঁড়িয়ে রইলেন। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম টপটপ করে জল পড়ছে ওঁর চোখ দিয়ে।

বলব কি। সব সময় মুখ দিয়ে কি কথা বেরোয়?

ফেরারি পালা।

অনবরত জপছি সেই শেষ কথা দুটি—"আবার দেখা হবে,

নিশ্চিন্ত হও।" অতএব, হ্যাঁ নিশ্চিন্ত হয়েই সেখান থেকে নামবার জন্যে তৈরী হলাম। কিন্তু—

সেই আসক্তি। মনে মনে বলতে লাগলাম—

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রাণশ্যতি ॥

কামনা জন্মায় আসক্তি থেকে, কামনা পূর্ণ না হলে ক্রোধ জন্মায়। ক্রোধ থেকে জন্মায় মোহ, মোহগ্রস্থ হলেই আত্মবিস্মৃতি ঘটে। আত্মবিস্মৃতি থেকে বুদ্ধিনাশ আর বুদ্ধিনাশ মানেই সর্বনাশ।

চরম শত্রু আসক্তি। কেন মন কাঁদছে? ঐ চরম শত্রু আসক্তির জন্যে। এর মানে নিশ্চিন্ত হওয়া? আদেশ পেয়েছি নিশ্চিন্ত হবার জন্যে। নিশ্চিন্ত হতেই হবে। নিশ্চিন্ত হলেই না আবার দেখা পাব।

হায় নিশ্চিন্ত হওয়া!

ভরদ্বাজের মত চিৎকার করে নয়, মনে মনে নিজের ইয়ের ইয়ে করতে করতে নেমে পড়লাম। দেখলাম, ওঁদের পোঁটলাটা অনেক ছোট হয়ে গেছে। আন্দাজ করলাম, বড়জোর আর দুবার ভরদ্বাজ এবং তাঁর সঙ্গীর ভোজন চলতে পারবে এতটা মাল তখনও রয়েছে। পোঁটলা নিয়ে লোকটি আগে আগে চলল। কোনও কষ্ট নেই, হালকা শরীর যেন হাওয়ায় উড়ে চলল। চড়াই ওতরাই মোটে টের পেলাম না। যেসব জায়গা ডিঙোতে বা পার হতে স্বয়ং ভরদ্বাজকেই যথেষ্ট সাবধান হতে হল সেসব জায়গাও বিনা সাহায্যে টপকাতে লাগলাম। কতক্ষণ হাঁটলাম, কোথা দিয়ে যাচ্ছি, খেয়াল নেই। দিনটা শেষ হল।

হাঁপিয়ে পড়েছেন ভরদ্বাজ, পেটের ভেতর আগুনও জ্বলে উঠেছে। বললেন—"সামনেই একটা বস্তী আছে, সেখানে রাতটা কাটাব।"

শুনলাম। আমার কিন্তু থামবার গরজ নেই। অবিশ্রান্ত পা চালালেই বা ক্ষতি কি!

অনেক দূরে জঙ্গলের ভেতর আলো দেখা গেল। ধোঁয়া নয়, সত্যিকারের আগুন। আগুন দেখে ভরদ্বাজের বুকে বল হল।

"যাক, বেটা গিদ্‌ধড় ঠিক জায়গাতেই এনেছে আমাদের। ঐ যে আগুন জ্বলছে ঐটে হল বস্তী। ওখানে রাত কাটিয়ে আর এক বেলা হাঁটলেই টিহরী পৌঁছে যাব।" বলে ভরদ্বাজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

শুনলাম। আমার কিন্তু জানবার গরজ নেই। টিহরী না পৌঁছলেই বা আমার ক্ষতি কি?

রাস্তা বানাবার হাকিম ভরদ্বাজ সাহেব আসছেন, এ সংবাদটি আগেই পৌঁছে দিয়েছিল ভরদ্বাজের সঙ্গী। তাই বস্তীসুদ্ধ মানুষ আগেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। আগুনটা জ্বালানো হয়েছিল হাকিম সাহেবকে অভ্যর্থনা করার জন্যে। যখন আমরা পৌঁছলাম তখন আগুনের ওপর হাঁড়ি চেপে গেছে। বস্তীর সব কটা সংসার থেকে বিলকুল দুধ এনে সেই হাঁড়িতে ঢালা হয়েছে। দুধ ফুটছে, দুধের ভেতর শক্কর তেজপাতা এলাচ দারুচিনি সিদ্ধ হচ্ছে। বাকী শুধু চা-পাতাগুলো ফেলা।

সর্বাগ্রে প্রয়োজন কিন্তু ডলাইমলাই করা। আগুনের সামনে কতকগুলো খড় বিছিয়ে তার ওপর কম্বল পেতে রাখা হয়েছিল। হাকিম তার ওপর আসীন হলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারজন জোয়ান ওঁর চারখানা হাত পা নিয়ে লেগে গেল। ওরে বাপ্‌রে, সে কি আওয়াজ! চটাপট্‌ ধপাধপ্‌ শব্দে নির্জন অরণ্য কাঁপতে লাগল। সভয়ে তাকিয়ে রইলাম, হাত-পাগুলো আস্ত থাকবে তো! থেঁতলাচ্ছে মোচড়াচ্ছে পাকাচ্ছে খামচাচ্ছে, হেঁচকা টান দিচ্ছে মাঝে মাঝে। তারপর থাপ্পড় আর রদ্দা, সে এক তুমুল কাণ্ড! চলতে লাগল সেই সংগ্রাম। অনেকটা তফাতে নিজের কম্বলখানি পেতে বসে রইলাম। বস্তীর মানুষরা হাকিম নিয়ে ব্যস্ত. আমার পানে নজর দেবার আর সময় পেল না।

তারপর এল সেই খাঁটি দুধে ফোটানো চা পাতার নির্যাস। একটা লম্বা সাদা গেলাসে আমার সামনে এক গেলাস রেখে গেল। হাকিমের জন্যে জামবাটি, প্রায় সেরখানেক মাল ধরে সেই বাটিতে। তিন-চার বাটি পর পর সাবাড় করে ধাতস্থ হলেন সাহেব। আমার পানে তাকাবার ফুরসৎ হল। আমার সামনের গেলাসটার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করলেন— "খাচ্ছ না কেন?"

তটস্থ হয়ে বললাম—"এই যে খাই, একটু জুড়লেই খাব।"

শুনে নিশ্চিন্ত হলেন হাকিম, চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। আবার শুরু হল সেই চড়-থাপ্পড়ের শব্দ। এবার ওদের সুবিধে হয়েছে, হাত-পাগুলোকে দেহ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে তবে রেহাই দেবে।

অবশেষে উঠল আর এক জাতের আওয়াজ, সেই আওয়াজের তলায় চড়-থাপ্পড়ের শব্দ তলিয়ে গেল। হাকিম ঘুমিয়ে পড়লেন। লোকগুলো তাঁকে রেহাই দিলে। আমিও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

একটা লোক আমার সামনে থেকে গেলাসটা তুলে নিতে এল।

ফিসফিস করে বললাম—"নিয়ে যাও, দুধ আমি খাই না।"

অবুঝ গাড়োয়ালী খুবই বিনীত ভাবে জানতে চাইলে ফিকা চা খাব কি না। বললে, ওরাও দুধ খায় না। দুধ বাচ্চারা খায়। যদি ফিকা চা খেতে ইচ্ছে করি তাহলে বানিয়ে এনে দেবে।

দরকার ছিল না। ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি দুটো তখনও পাকড়াতে পারে নি। তবু বলতে হল—আন। বেচারাকে নিরাশ করে কি লাভ হবে আমার!

শুধু ক্ষুধা তৃষ্ণা নয় ঘুমও বিদেয় নিয়েছে। সারাটা রাত জেগে বসে রইলাম। অনেকটা রাত হবে তখন, ভরদ্বাজ ঘুম থেকে উঠে প্রায় চক্ষু বুজে গরম রুটি আর আলুর তরকারি মোট সের চারেক মাল পেটে পাঠিয়ে আবার নাক ডাকাতে শুলেন। ফিকা চা খাবার সময় ওদের জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমার জন্যে কিছুই বানাবার

দরকার নেই। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় গিললেন ভরদ্বাজ, আমার কথাটা তখন খেয়ালে এল না। রক্ষা পেলাম।

ভয় পেয়ে গেলাম কিন্তু। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রার দাপট দেখে সত্যিই খুব ঘাবড়ে গেলাম। কি সর্বনেশে ব্যাপার! অতবড় মানুষটাকে একেবারে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য করে ছাড়ে? ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রার ঐ বীভৎস উলঙ্গ রূপের সঙ্গে অমনভাবে চাক্ষুষ পরিচয় কখনও ঘটে নি। ভাবনার কথা, ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাধি তিনটে আমার দেহেও রয়েছে। দাপট অবশ্য অনেক কম, কিন্তু হঠাৎ যদি বেড়ে ওঠে? ভরদ্বাজের মত বেহুঁশ করে ফেলে যদি আমায়? ব্যাধি যখন রয়েছে তখন সেটা বাড়তে কতক্ষণ! ঐ ব্যাধিগুলোর কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি!

আর এক ব্যাধি পেয়ে বসল, ক্ষুধা তৃষ্ণা থেকে জন্মের শোধ নিষ্কৃতি পেতে হবে। এই নিষ্কৃতি পাওয়ার জের মেটাতে গিয়ে শ্রাদ্ধটা কোথায় গিয়ে পেঁ ৗছেছিল এইবেলা সেটুকু বলে নি।

প্রায় দু বছর মৌনব্রত পালন হয়ে গেছে তখন। তার সঙ্গে আরও দুটি ব্রত ফাউ হিসেবে রয়েছে; অজগর ব্রত আর পক্ষী ব্রত। অজগর সাপ নাকি চেষ্টা করে খাবার জিনিস জোটায় না। যদি কখনও কোনও জীব-জন্তু অজগরের মুখের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয় তবে তাকে ধরে উদরস্থ করে। তেমনি আমিও কিছু জোটাবার জন্যে চেষ্টা করব না, এই ব্রত পালন করার নাম হল অজগর ব্রত পালন। আর পক্ষী ব্রতটা হচ্ছে পাখীর ধর্ম পালন করা। সূর্য অস্তের সঙ্গে সঙ্গে পাখীরা নিশ্চিন্ত হয়ে গাছের ডালে আশ্রয় নেয়। তার পরদিন কি খেয়ে চলবে এ ভাবনা পাখীদের নেই। তাই তারা পরদিনের জন্যে কোনও কিছু সংগ্রহ করে না। তেমনি আমিও পরদিনের জন্যে এক দানা খাদ্যবস্তু সঙ্গে রাখতে পারব না, এই ব্রতটির নাম পক্ষী ব্রত। ঐ সাংঘাতিক জাতের ব্রত তিনটি স্কন্ধে নিয়ে প্রায় দু বছর হিমালয়ে বাস হয়ে গেছে তখন। খুবই উৎকট রকম কষ্ট করতে হয়েছে এ কথা

বললে নির্জলা মিথ্যে কথা বলা হবে। সমস্ত শরীর হাতের চেটো পায়ের তলা জিভ ঠোঁট ফেটে ফুলে রস গড়াচ্ছে, পিস্সুর কামড়ে চোখের পাতায় ঘা হয়ে গেছে। যেন কুষ্ঠব্যাধি হয়েছে সর্বাঙ্গে। শুনেছি, কুষ্ঠ রোগীদের নাকি জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না। আমারও ছিল না। নুন মিষ্টি জিভে ঠেকালে রক্ষে ছিল না। এমন জ্বলন জ্বলত যে পাগল করে ছাড়ত। জলে ভিজিয়ে রুটি খেতাম। কিংবা আটা জলে গুলে নিতাম। তাও কি জুটত রোজ? ভিক্ষা চাওয়া নিষেধ, ভিক্ষা চাইলে চেষ্টা করা হয়। অজগর সাপ চেষ্টা করে পেট ভরায় না। কথা বলা নিষেধ, ইশারা করাও নিষেধ। কারণ কাষ্ঠ-মৌন পালন করছি। সুতরাং কে বুঝবে যে কি আমার চাই। ভক্তিমতী শেঠানী পেঁড়ার ঠোঙা নামিয়ে দিয়েছেন সামনে, চুপচাপ উঠে চলে গেছি। মুখে দোব কেমন করে, জিভ যে ফেটে আট-ফাটা হয়ে আছে। চিনি বা নুন দুই-ই অচল আমার কাছে এ কথাটা বোঝাই কেমন করে তাঁকে। সুতরাং একটিমাত্র বস্তু অযথা ভক্ষণ করেছি। বস্তুটির নাম উপবাস। ঐ উপবাস ভোজন করতে করতে ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে প্রায় জয় করে ফেলেছিলাম, এ কথা বললে খুবই বাড়িয়ে বলা হবে। সোজা ব্যাপারটা হল শরীরটা যে আমার এটা যেন সবসময় খেয়াল হত না। শরীরের কোনখানটায় মন দোব? পায়ের তলা এমন ভাবে ফেটেছে যে ফাটাগুলোর ভেতর সের খানেক কাঁকর নিয়ে হাঁটছি। হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো ফুলে কলাগাছ। সেই হাত তুলে ফাটা ঠোঁট বা চোখের ওপর থেকে মাছি পিস্সু খেদাব তারও উপায় নেই। উৎকট কুটকুটে একখানা কালো কম্বল দিয়ে মুখ বাদে সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখছি। সেই অবস্থাতেই পা টেনে টেনে পাথর আর কাঁকরের ওপর দিয়ে হাঁটছি। মাথার তালুতে জট পাকানো চুলের ভেতরে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে উকুন আর পিস্সুরা মৌরুসী পাট্টা গেড়েছে। চুলকোবার পর্যন্ত উপায় নেই হাতের আঙ্গুল-গুলোর এমনই অবস্থা। শরীরের কোনখানকার জ্বালা যন্ত্রণায় নজর

দোব ? সুতরাং শরীরটা আমার নয়, এই জাতের একটা উদ্ভট নেশায় পেয়ে বসেছিল তখন এ কথাটা বললে অন্যায় বলা হবে না। তাই শরীরের কষ্ট যে ভয়ঙ্কর রকম জ্বালিয়েছে এ কথা বললেও মিথ্যে কথা বলা হবে।

কিন্তু মন ?

মনের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে জয় করতে পারি নি বটে তবে ও দুটোকে অবজ্ঞা করার মত শক্তি অর্জন করতে পেরেছিলাম। মনের ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে অবজ্ঞা করা দূরের কথা অনবরত নাই দিয়ে মাথায় তুলেছিলাম। হরদম ঐ এক চিন্তা, ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে জয় করার কায়দাটা কি করে রপ্ত করা যায়।

অবশেষে এক মহাত্মার দর্শন পেলাম। যমুনোত্রী থেকে মাইল পাঁচেক নিচে খরসালি। ধর্মশালা আছে, অনেকগুলো দোকান আছে, বেশ জমজমাট স্থান। মহাত্মাজী সেই খরসালিতে অবস্থান করছিলেন। হ্যাঁ, একেই বলে সত্যিকারের সাধু। দর্শন মাত্র মন জুড়িয়ে গেল। খরসালিতে তখন বরফ পড়ছে, রাস্তা-বাড়ির চাল বরফে ঢাকা। মহাত্মা সেই বরফের মধ্যে স্রেফ একটি কৌপিন পরে গড়াগড়ি খাচ্ছেন।

শুধু কি তাই ? ওখানকার লোকেরা বলল, মহাত্মাজী কিছুই খান না। একদম কিচ্ছু নয়, সদাসর্বক্ষণ ওরা পাহারা দিয়ে দেখেছে জলস্পর্শ করেন না সাধু। কভি কভি মর্জি হোনেসে এক দো ছিলিম তামুক পিতা হায়।

ব্যাস, আর কি ছাড়ি ? লেগে রইলাম মহাত্মার সঙ্গে। যেন তেন প্রকারেণ কিছুই না খাবার সিদ্ধাইটা আদায় করে নিতেই হবে।

সত্যিই ওঁকে পাহারা দেওয়া সোজা। কোনও সময় লুকিয়ে থাকেন না। হয় বরফের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছেন, নয়ত দোকানদাররা তুলে নিয়ে গিয়ে একটা চালের তলায় বসিয়ে রেখেছে। বেশী বয়সও হয় নি তাঁর, চল্লিশের ওপরে নয় নিশ্চয়ই। খোঁচা খোঁচা দাড়ি

গোঁফ চুল, খুব সম্ভব মাথা মুখ কামানো। মাসতিনেক কামানো হয় নি। মহাত্মার সঙ্গে কোনও চেলা নেই, পরনের কৌপিনটা ছাড়া একগাছা চিমটে মাত্র সম্বল। চিমটেটা আছে সবচেয়ে বড়লোক যে দোকানদার তার জিম্মায়। দু-তিন দিন অন্তর চিমটেটার কথা মনে পড়ে মহাত্মাজীর, তখন হুংকার ছাড়তে থাকেন। চিমটেটা হাতে পেলেই শান্ত, ঘণ্টা কতক সেটাকে হাতছাড়া করেন না। তারপর আবার যে কে সেই, বরফের ওপর গড়াগড়ি। ওখানকার লোকেরা তখন সেই মহাপবিত্র চিমটেটাকে অতি সাবধানে তুলে নিয়ে গিয়ে সামলে রাখে। চিমটেটার ওপরেই লোকের অযথা ভক্তি, চিমটে বাবাকেই পুজো দিতে লেগে গেছে। যাঁর হাতের চিমটে তাঁর যে নাগাল পাওয়া যায় না।

জেদ, আমার সেই সনাতন ব্যাধিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। নাগাল ওঁর পেতেই হবে এবং ঐভাবে বরফের ওপর গড়াগড়ি খাওয়ার উপায়টা শিখতেই হবে। চুলোয় যাক বরফের ওপর গড়াগড়ি খাওয়ার শক্তি, দুনিয়ার সর্বত্র বরফ নেই যে ঐ সাংঘাতিক শক্তিটা দেখিয়ে মানুষের মগজ ঘুলিয়ে দোব। তার চেয়ে কিছুই না খাবার কায়দাটা—হায় ভগবান, ঐটে যদি হাতাতে পারি তাহলে আর আমায় পায় কে!

প্রায় মাসখানেক লেগে রইলাম মহাত্মার সঙ্গে। খরসালির দোকানদারদের কাছে আমি অচেনা মানুষ নই, তার আগেও বারকয়েক খরসালিতে গিয়ে থেকেছি। ওঁরা ভক্তি না করলেও বরদাস্ত করতেন আমাকে। মৌনীবাবা কাউকে তঙ করেন না, দিনান্তে কেউ খানিকটা কাঁচা আটা বা একটু দুধ দিলেই মহাসন্তুষ্ট, অমন সাধুকে কে না সমীহ করবে! তারপর তারা দেখল যে তাদের সেই ভয়াবহ ক্ষমতাসম্পন্ন সাধুটির ভক্ত হয়ে পড়েছি আমি। দেখে আমাকেও একটু আধটু ভক্তি শ্রদ্ধা করতে লাগল। ক্রমে মহাত্মারও

নজর পড়ল আমার ওপর। একদিন সেধে কথা বললেন। জানতে চাইলেন, কি মতলবে আমি তাঁর সঙ্গে লেগে আছি।

জবাব দিলাম না, ইশারাও করতে পারলাম না। অতবড় মহাত্মা যখন তখন নিশ্চয়ই আমার মনের কামনাটা টের পেয়ে যাবেন। কি আশ্চর্য! কয়েক দিন পরে সত্যিই জিজ্ঞাসা করে বসলেন যে তাঁর মত শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণাকে আমি জয় করতে চাই কি না। জোড় হাত করলাম, চোখের চাউনিতে যে আকুতি ফুটে উঠল তা দেখেই উনি যা বোঝার বুঝে নিলেন। বললেন—"ঠিক আছে, যা চাইছ তা পাবে। কোনও সময় আমার কাছছাড়া হবে না।"

সেদিন সন্ধ্যার সময় তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেল। মহাত্মাজী চিমটা চিমটা করে হুংকার ছাড়তে লাগলেন।

কে একজন চিমটেখানা এনে ওঁর হাতে দিলে। তারপর উনি বসলেন গিয়ে ওঁর আসনে, সামনে ভক্তরা একটা ধুনি লাগিয়ে দিলে। নিশ্চিন্ত, ঘণ্টা কতক চিমটে নিয়ে বসে থাকবেন ধুনির সামনে, চিমটে দিয়ে ধুনি খোঁচাবেন। নিশ্চিন্ত হয়ে ভক্তরা যে যার আস্তানায় চলে গেল। আমি ঠিক বসে আছি।

অনেক রাতে দেখি চিমটের আংটাগুলো ধরে কি যেন করছেন তিনি। চিমটের মাথায় একটা বড় আংটা আর সেই বড় আংটার সঙ্গে গোটাকতক ছোট ছোট আংটা লাগানো ছিল। একটা ছোট আংটা কিভাবে যে খুলে ফেললেন বুঝতে পারলাম না। তারপর সেই আংটাটা বাঁ হাতের তালুর ওপর ঠুকতে লাগলেন। কয়েকবার ঠুকে ইশারা করে কাছে ডাকলেন আমাকে। পোস্তদানার মত একটি ছোট্ট দানা আমাকে দিয়ে বললেন—"জিভের ডগায় রাখ, রেখে দশ বার রাম রাম জপ কর, তারপর থুকে ফেলে দাও। খবরদার, দশ বার রাম রাম বলবার পরে ওটা যেন আর মুখের ভেতর না থাকে।"

তাই করলাম। আড়ষ্ট জিভটা যেন আরও অসাড় হয়ে গেল।

বোকার মত মহাত্মার পানে তাকিয়ে রইলাম। তারপর কখন যে কম্বলখানাকে সেখানে ফেলে রেখে বাইরে গিয়ে বরফের ওপর পায়চারি করতে শুরু করেছি তা জানতেও পারি নি। পরদিন সকালে বিস্তর লোকজনের ভিড় দেখে হুঁশ হল। সবাই বুঝে ফেলল ব্যাপারটা, মহাপুরুষ আমার ওপর কৃপা করেছেন। তখন আমার কদরও বহুগুণ বেড়ে গেল।

সেইদিনই কিন্তু মহাত্মা খরসালি ছাড়লেন। সঙ্গ নিলাম। অমন মহাত্মাকে ছাড়তে পারি কখনও ?

লক্ষ্মীছাড়া কুটকুটে কম্বলখানা লক্ষ কোটি পিস্সু সুদ্ধ সেখানেই পড়ে রইল।

এখন কেমন হয়েছে জানি না, তখনকার দিনে খরসালি থেকে যমুনোত্রী সত্যিই সাংঘাতিক পথ ছিল। মাঝখানে একটা জায়গা ছিল, জায়গাটার নাম ভৈরোঁ পাক। ঐ পাক পার হতে গিয়ে অনেকেই সশরীরে স্বর্গে চলে যেতেন। পাকটি পার হতে বেশী সময় লাগত না, খুব বেশী হলেও আধ ঘণ্টা, আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাক পার হয়ে দম ফেলা যেত। ব্যাপারটা হল একটা চড়াই, একটা পাহাড়ের গা কেটে মাত্র এক হাত বা দু হাত চওড়া পথ, সেই পথে পাহাড়কে বাঁ পাশে রেখে উঠতে হবে। ডান পাশে কি আছে তা যদি দেখবার বাসনা হয় তাহলে আর রক্ষে নেই। বাঁ পাশের পাহাড়ের গায়ে বরফ, পায়ের নিচে বরফ, সেই হাতখানেক বা হাত দুয়েক চওড়া পথটুকুও বরফে ঢেকে আছে। তারপর সেই বরফই সোজা নেমে গেছে ডান পাশের খাদে। খাদটা কত নিচু, পা পিছলালে কোথায় কত নিচে গিয়ে আটকাবে দেহটা, এই সমস্ত চিন্তা মাথায় ঢুকলেও ভৈরোঁ পাক পার হওয়া যাবে না। ডান হাতে লোহার খোঁচা দেওয়া লাঠি নিয়ে ডান দিকে সেটা গিঁথতে গিঁথতে একজনের পেছনে একজন চলতে হবে মুখ বুজে। সামনে থেকে যদি কেউ পিছলে নেমে যায়

তাহলেও তার পানে তাকানো চলবে না। যে গেছে সে যাক, নির্বিকার চিত্তে এগিয়ে যাও। যমুনা মাঈকী কৃপা হলে অবশ্যই ভৈরোঁ পাক পার হতে পারবে।

সকালবেলা যাত্রীরা ভৈরোঁ পাক দিয়ে উঠে যেত, বিকেলে নেমে আসত। কাণ্ডি ডাণ্ডি ভৈরোঁ পাক পার হত না। যত বড়মানুষই হোন, যত বড় ঘরের শেঠ-শেঠানীই হোন, ভৈরোঁ পাক পায়ে হেঁটে পার হতে হবেই। অবশ্য যারা ডাণ্ডি কাণ্ডি বয় তারাই হাত ধরে পার করে নিয়ে যেত। ঐ ভৈরোঁ পাকের জন্যেই সেকালে মানে সেই ত্রিশ বছর আগে বেশী লোক যমুনোত্রী যেত না।

মহাত্মাজী অসময়ে যমুনোত্রী চললেন। অসময়ে বলছি এইজন্যে যে তখনও একজন যাত্রাও ভৈরোঁ পাক পার হয়ে যমুনোত্রী যায় নি। ভৈরোঁ পাক যে কি অবস্থায় আছে তাও কেউ জানে না। খরসালির লোকে একটু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কার কথা কে শোনে!

ঘণ্টা দুয়েক মুখ টিপে চলবার পর ভৈরোঁ পাক শুরু হল। পথটা ঠিকই রয়েছে, কিন্তু বরফ পড়তে পড়তে এমন ঢালু হয়েছে যে পা দেবার কথা চিন্তা করাও যায় না। মহাত্মা চললেন, ডান হাতে রয়েছে সেই চিমটে, চিমটের মুখ ডান পাশে চেপে গিঁথে দিয়ে এক পা বাড়িয়ে বরফের ওপর রাখলেন। একটু পরে আর এক পা তুলে সেখানে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হেঁচকা মেরে চিমটে তুলে নিয়ে হাতখানেক বা হাত-দেড়েক সামনে আবার গিঁথলেন। আমাকে বললেন, কোনও ভয় নেই, যেখান থেকে তিনি পা তুলে নেবেন সেখানে একটা খাঁজ পড়বে, আমি যেন সাবধানে সেই খাঁজে পা দিয়ে উঠে দাঁড়াই। পা পিছলাবে না কিছুতেই, কারণ বরফ গলছে না। অতঃপর নির্বিঘ্নে ওঠা চলতে লাগল। দেখতে দেখতে আমরা ভৈরোঁ পাক পার হলাম। যমুনোত্রীর তপ্ত কুণ্ডের ধারে গিয়ে পৌঁছলাম যখন তখন আবার ছায়া পড়ছে। মানে দিনটা শেষ হয়েছিল ভৈরোঁ পাক পার হতে, এটা এখনও বেশ মনে আছে।

আর মনে আছে যে সেবার সেই মহাত্মার সঙ্গে জান কবুল করে যমুনোত্রীতে উঠেছিলাম বলেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়ের সঙ্গে মুখোমুখি হতে পেরেছিলাম।

চারিদিকে বরফ, শুধু তপ্ত কুণ্ডের আশেপাশে পাথর দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে একখানা কাঠের ঘর, প্রায় ঢেকে আছে বরফে। বরফ গলবে বা কেটে সরাতে হবে তবে সেই কাঠের ঘরে প্রবেশ করা চলবে। ঐ একখানি মাত্র ঘর ছিল তখন যমুনোত্রীতে, ওটাকেই বলা হত ধর্মশালা। যাত্রার সময়তেও কেউ থাকত না সেই ঘরে, সব যাত্রীই সকালে যেত যমুনোত্রীতে বিকেলে নেমে আসত। যেটুকু সময় থাকত ওখানে তপ্ত কুণ্ডের পাশে বসে থাকত। গামছায় চাল আলু বেঁধে ফেলে দিত কুণ্ডে, অনেকে আটা মেখে ডেলা পাকিয়েও ফেলত। কিছুক্ষণ পরে সেগুলো ভেসে উঠত জলের ওপর। তার মানে সিদ্ধ হয়ে গেছে। তখন চিমটে দিয়ে ধরে ওপরে তুলত। তৈরী হয়ে গেল যমুনামাঈর প্রসাদ, তাই খেয়ে যাত্রীরা দিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যার আগেই খরসালিতে ফিরে আসত। যমুনোত্রী জায়গাটা রাত্রে কেমন হয় দেখবার বাসনা ছিল আমার। কোনও বারই কিন্তু রাত্রে থাকার কথাটা মাথায় ঢোকে নি। কে থাকবে সেই সাক্ষাৎ যমালয়ে! যাত্রীদের সঙ্গে গেছি যাত্রীদের সঙ্গেই ফিরে এসেছি।

সেই রাতটা যমুনোত্রীতে কাটবে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এ সময় নিশ্চয়ই মহাত্মাজী ফিরে যাবার সাহস করবেন না। বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। মনটা ভাল আছে, শরীরে কোনও জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো নেই-ই। বরফ পড়ছে পেঁজা তুলোর মত, হাওয়াও বইছে বেশ জোরে। তাতে বড় বয়েই গেছে আমাদের। বেপরোয়া বসে আছি তপ্ত কুণ্ডের পাড়ে। চিমটের মাথার আংটাগুলো বাজিয়ে মিঠে গলায় মহাত্মা রাম নাম গাইছেন। আঃ, একেই বলে স্বর্গ! সশরীরে স্বর্গ যাওয়া কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়! তবে পোস্তদানার

মত ঐ জিনিসটা দরকার। খেতেও হবে না, কয়েক সেকেণ্ড জিভের ডগায় রেখে থু করে ফেলে দিলেই হল। সাক্ষাৎ অমৃত কি না, খাঁটি অমৃত কি আর তাড়ির মত ভাঁড় ভাঁড় গিলতে হয়?

সন্ধ্যা হয়ে গেল। খুব বেশী অন্ধকার কিন্তু হল না। ওপরে পরিষ্কার আকাশ, দশ হাজার ফুট উঠে আকাশপানে তাকালে আকাশকে আয়নার মত মনে হয় যদি অবশ্য মেঘ না থাকে। যমুনোত্রীতে যখন বরফ পড়ে তখন আকাশে একটুও মেঘ থাকে না। মেঘ থাকলেই বৃষ্টি আর অন্ধকার। অন্য অন্য বার যমুনোত্রীতে গিয়ে দেখেছি দুপুরবেলাও অন্ধকার। মেঘে ঢাকা যমুনোত্রী দেখে ধারণা হয়েছিল অমন হতচ্ছাড়া বিষণ্ণ স্থান দুনিয়ায় দুটি নেই। সেই প্রথম যমুনামাঈর রূপ দেখে মজে গেলাম। মাঝে মাঝে ধাঁধা লাগতে লাগল। সামনে অনেকটা উঁচুতে যেখান থেকে তপ্ত জলটা নেমে আসছে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বার বার ভুল হতে লাগল—ঐ যেন দেখতে পেলাম কাকে! কে যেন ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে না!

একবার সত্যিই চেঁচিয়ে উঠলাম। মহাত্মাজী আমার কাঁধটা খামচে ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। চটকা ভেঙ্গে গেল। আমার চোখের ওপর নজর ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হয়েছে?"

খুবই অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। আমতা আমতা করে বললাম—"না, হয় নি কিছুই, বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

হেসে উঠলেন মহাত্মাজী, আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। চিমটের মাথা থেকে আংটা খুলে হাতের ওপর ঠুকে একদানা অমৃত বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—"বিশ বার বা ত্রিশ বার রাম রাম বল জিভের ডগায় নিয়ে তারপর থুকে ফেলে দাও। এখানে ঘুমিয়ে পড়লে ঘুম আর ভাঙবে না। এস আমরা তফাতে গিয়ে বসি। গরম জলের ভাপ লেগে ঐ রকম গোলমাল করছে।"

তাই তাই সই। দানাটা জিভের ডগায় রেখে ত্রিশ বার রাম রাম

বললাম। তারপর থু করে ফেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শরীর গরম, বরফের ভেতর গিয়ে বসতে পারলে যেন বাঁচি। অনেকটা সরে গিয়ে বরফের ওপর হাঁটতে লাগলাম। কাঁধে মাথায় বুকে পিঠে বরফ পড়ছে। আঃ কি আরাম! চৈত্র মাসের দুপুরবেলা পানাপুকুরে গা ডুবিয়ে বসে আছি যেন, জল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

এতটুকু নেশা হয় নি, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ষোল আনা সজাগ হয়ে উঠেছে। বিলকুল স্পষ্ট দেখতে পাছি, সামান্য মাত্র শব্দও কানে আসছে। বরফের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে পায়চারি করছি। মহাত্মাজী টান টান হয়ে শুয়ে আছেন। দেখতে পাচ্ছি ওঁর মুখের ওপর বুকের ওপর বরফ জমছে। একদম নির্বিকার, সত্যিকারের সুখ দুঃখ শীত তাপ জয় করা কাকে বলে দেখছি। আর ভাবছি, ঐ শক্তি আমারও হয়েছে। ঐ দানাগুলো কোথা থেকে কিভাবে জুটবে সেইটুকু জানতে পারলেই লেঠা চুকে যায়। কিন্তু সেই হদিসটা কবে পর্যন্ত ওঁর কাছ থেকে বাগাতে পারব!

হঠাৎ যেন বজ্রপাত হল। থরথর করে কেঁপে উঠল যমুনোত্রী, সমস্ত জাগয়াগাটা গমগম করতে লাগল।

"কিস্‌কো লে আয়া সাথ মে ভেইয়া?"

ভয়ঙ্কর চমকে উঠে কাঠের ঘরটার পানে তাকিয়ে রইলাম। ঐ ঘরটার ভেতর থেকেই কেউ নিশ্চয়ই ঐ কথাগুলো বললে।

আজ ত্রিশ বছর পরে এই কাহিনী শোনাতে বসে আমার নিজেরই যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকছে। এই কাহিনীর এক বর্ণও কেউ বিশ্বাস করবেন না এ আমি জানি। আমি নিজেই কি বিশ্বাস করতাম অপর কেউ যদি এই কাহিনীটা আমাকে শোনাত?

দেশ স্বাধীন হয়েছে। নিজের দেশকে স্বাধীন দেখতে চায় এই ভয়ঙ্কর অপরাধের দরুন নিশ্চয়ই আজ এ দেশের কোনও সন্তানকে ফাঁসির দড়ি এড়াবার গরজে যমুনোত্রীর সেই ধর্মশালায় লুকিয়ে বসে

থাকতে হয় না। এখন আমাদের ছেলেরা এবং মেয়েরাও হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় ছুটোছুটি করে বেড়ায়। লক্ষ টাকার সাজ-সরঞ্জাম খাদ্য পানীয় ওষুধ কাঁধে নিয়ে শত শত মালবাহক সঙ্গে সঙ্গে চলে। সংবাদপত্র পাঠ করে আমরা জানতে পারি কোন্ কোন্ চূড়া জয় করা হল, কোন্ কোন্ চূড়ার মাথায় আমাদের জাতীয় পতাকা উড়ল। তারপর অভিনন্দন, বক্তৃতা এবং সর্বশেষে একখানি অতি সুদৃশ্য হিমালয়ান উপন্যাস। সভ্য স্বাধীন দেশে যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। সরকার এবং দেশের বড়লোকেরা হিমালয়ের ওপর কৃপাদৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন এটা জেনে আমাদের বুক দশ হাত হচ্ছে।

আমি ভাবছি আজ তাঁর কথা, এই দেশকে স্বাধীন করতে চেষ্টা করেছিলেন বলে যাঁকে যমুনোত্রীতে একলা লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। তিনি সাধু-মহাত্মা নন, আমার মত সহজ মানুষ। কোনও সরঞ্জাম তাঁর সঙ্গে ছিল না, কয়েক সের আলু আর খানিকটা লবণ মাত্র ছিল। আর ছিল ঐ অমৃতদানা, ঐ সাংঘাতিক বিষ, যার একটি দানা জিভের ডগায় কয়েক সেকেণ্ড রাখলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বেমালুম দূর হয়ে যায়। তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন ঐ বিষ, এক জাতের সবুজ মাকড়সা পাওয়া যায় পাহাড়ে, সেই মাকড়সার লালা যা দিয়ে মাকড়সা জাল বানায়, সেই জাল হল ঐ সর্বনেশে বিষ। ঐ অমৃতদানা যদি কয়েকটি উদরস্থ করা যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলাভ। রক্তের জলীয় অংশটা শরীর থেকে মাত্র গোটা তিনেক ভেদবমির সঙ্গে নিঃশেষে বেরিয়ে যাবে।

এইখানেই এ প্রসঙ্গ শেষ করব। তার কারণ ঐ বিষ খাওয়াও আমার ঐ যমুনোত্রীতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমাকে তিনি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঐ বিষের আদ্যোপান্ত পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—"তুমি তো ঠিক গাড়ল নও। খিদে তেষ্টা জয় করে ভেলকি দেখাবে এইজন্যে অনর্থক নষ্ট করছ জীবনটাকে, ছিঃ!" তারপর তাঁর সেই শাগরেদটিকে বলেছিলেন—"কাল সকালেই ওকে ভৈরোঁ পাক পার করে দিয়ে এস।"

কি যেন বলতে গিয়েছিল শাগরেদটি। তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—"এর মত মানুষকেও যদি ভয় করে চলি তাহলে বাঁচব কেমন করে। যাও, ওকে নামিয়ে দিয়ে এস। ওপারের পথ চলবার মত হয়ে এসেছে, তাড়াতাড়ি যদি চলতে পারি আমরা তাহলে বরফ গলবার আগেই তিব্বতে ঢুকতে পারব।"

ঐ পর্যন্তই আমার জানা হয়েছিল। পরদিন যথাসময়ে খরসালিতে পৌঁছেছিলাম। একখানি নতুন কম্বল জুটেছিল তার পরদিনই। শীতে কাঁপতে দেখে খরসালির বেনিয়ারা একখানা নতুন কম্বল গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল। কোথায় গেলেন তাদের মহাত্মাজী সে প্রশ্নও তারা আমায় করতে পারল না। আমি যে মৌনীবাবা।

যাক, এখন আমার বিন্দেশ্বরীপ্রসাদ ভরদ্বাজের কাহিনীটা শোনাই।

পরদিন একবেলা হেঁটে টিহরী পৌঁছে গেলাম। ভরদ্বাজ ওখানে আর একবেলাও তিষ্ঠোতে পারলেন না। আবার কোথায় পাহাড় ধ্বসেছে, তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটতে হবে।

ছুটলেন ভরদ্বাজ, ওঁর সাঙ্গপাঙ্গরা আগেই রওয়ানা হয়ে গেছে। যাবার আগে আমার হাতে আমার হারানো চাদরখানি দিয়ে বললেন—"কত টাকা বাঁধা ছিল গুনে নাও।"

কথা বলার মত শক্তি নেই তখন। ভরদ্বাজের হাত একখানা আঁকড়ে ধরে থরথর করে কাঁপছি। হাকিমসাহেব বিকট শব্দে হেসে উঠে বললেন—"বাচ্চা, বিলকুল বাচ্চা হায়।" তারপর দু হাতে আমাকে জাপটে ধরে আমার মাথার ওপর নিজের মুখখানা চেপে রাখলেন। অনেকক্ষণ পরে আমাকে ছেড়ে দিয়েই পেছন ফিরে দৌড়, তিন লাফে একদম উধাও।

মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম চুলগুলো ভিজে গেছে।

টিহরীতে একবেলা থাকবার প্রবৃত্তি হল না। সোজা পা চালালাম উত্তরকাশীর পথে। যাত্রীরা এসে পড়বার আগে কোনও রকমে উত্তরকাশী পৌঁছতে পারলে বাঁচি। একা থাকতে চাই, একলা চলতে চাই। কিছুতেই কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা উচিত নয়। ঐ ভরদ্বাজ লোকটার জন্যে মন খারাপ হচ্ছে। বিপুলায়তন একটা শিশু, রাক্ষসের মত গিলতে পারে আর ভূতের মত ঘুমোতে পারে। কোথায় কোন দিন বেঘোরে মারা পড়বে। পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুমিয়ে পড়লে খাবে হয়তো বাঘে বা সাপে। কিংবা হয়তো খিদের জ্বালায় এমন কিছু গিলবে চোখ বুজে যে—।

কেন ওকে ওর মা ঐভাবে ছেড়ে দিয়েছেন একলা? আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ কি এমন নেই যে ওকে ঘরে আটকে রাখতে পারে? কি এমন রোজগার করে ঐ রাস্তা বানাবার হাকিম? যা রোজগার করে তাতে হয়ত বেচারার পেটই ভরে না। নচ্ছার স্বার্থপর সমাজ, কে কার মুখ চাইবে। ঝাড়ু মার অমন সমাজের মুখে!

রাগে জ্বলতে লাগল ব্রহ্মরন্ধ্র, হনহন করে হাঁটতে শুরু করলাম। সন্ধ্যার আগে কোথায় গিয়ে পৌঁছব, যেখানে পৌঁছব সেখানে রাতের মত মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাব কি না, এ সমস্ত চিন্তা তখন কে করে? কালীকম্বলীর সেই পুঁথি আবার ফেরত এসেছে চাদরের সঙ্গে, সেটা খুলে পথের বিবরণ পড়বার কথাটাও মনে উঠল না। হাঁটছি, খুব জোরে পা চালাচ্ছি। যাঁহা চড়াই তাঁহা ওতরাই, একদম বেপরোয়া। শরীরটা সোলার মত হালকা মনে হচ্ছে। খিদে তেষ্টার কথা ভুলেই গেছি, ক্লান্তি আলস্য কিচ্ছু নেই। সেই অদ্ভুত গন্ধটায় ভরে আছে শরীরের ভেতরটা, যখনই খেয়াল হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা তখনই গন্ধটা পাচ্ছি। বেচারা ভরদ্বাজ, ওকেও যদি ঐ জিনিস খাওয়ানো

যেত! সাত সাত বার গেছে বেচারা মহাপুরুষের কাছে, একটি বার ওর দিকে চোখ মেলে তাকান নি। আহা বেচারা!

মুক্তি কোথায়? ভরদ্বাজ নয়, ভরদ্বাজের ভাবনা জ্বালাতে লাগল। সাংঘাতিক শত্রু মন, সেই শত্রু আমার সঙ্গে রয়েছে। অনেকক্ষণ পা চালাবার পরে মনকে ধরতে পারলাম। অমনি কপচাতে শুরু করলাম মুখস্থ শ্লোক—

তদামুক্তি র্যদা চিত্তং না বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি॥

যে মন বুদ্ধি কিছুই বাঞ্ছা করে না, কারও জন্যে শোক করে না, কিছুই ত্যাগ করে না, কিছুই গ্রহণ করে না, আনন্দিত হয় না বা ক্রুদ্ধ হয় না।

ঝাড়ু মার আমার মন বুদ্ধির মুখে। কোথাকার কে ব্যাটা ভরদ্বাজ, তার জন্যেই হতচ্ছাড়া মন জ্বালিয়ে খেল।

মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈর্নির্বিবষয়ং স্মৃতং॥

মন কিন্তু মুক্তিরও কারণ। মন বন্ধন মুক্তি দুই-ই দিতে পারে। মনটাকে যদি পাকড়াতে পারা যেত!

কোথায় চলেছি? কেন যাচ্ছি উত্তরকাশীতে? মন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে। কিন্তু কেন?

একটা কবিতা না গান শুনেছিলাম কোথায় যেন, তার প্রথম দু লাইন মনে পড়ে গেল। কবি বলছেন—"ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিককে, দেখব সে উপাধি-বলে কটা কেন'র জবাব শিখে।" সত্যিই যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে উত্তরকাশীতে যাচ্ছি কেন, তাহলে সেই কেন'র জবাব কি দোব? কি জবাব দোব তা অবশ্য গুরুদেব শুনিয়ে দিয়েছেন—

ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মানিগৃহমেধিনাম্।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ॥

সদাত্মভাব সন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যাৎ নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ॥

তুরীয় অবস্থায় স্বজাতি-চিহ্ন ত্যাগ করতে হয়, গৃহস্থ-কর্ম বাদ দিতে হয়, সংকল্পশূন্য এবং উদ্যমশূন্য হওয়া চাই। আত্মভাবে সন্তুষ্ট থাকা চাই। শোক মোহ ঘোচানো অতি অবশ্য প্রয়োজন। সব চেয়ে বড় কথা এক জায়গায় বাস করলে চলবে না। ক্ষমাশীল হতে হবে, শঙ্কাবিহীন হতে হবে, নিরুপদ্রব হতে হবে।

অতএব জবাবটি হচ্ছে, তুরীয় অবস্থায় পৌঁছবার বাসনায় উত্তরকাশী চলেছি। এক জায়গায় বাস করা নিষেধ, কোথাও না কোথাও অনবরত যেতেই হবে। অতএব উত্তরকাশীই বা কি দোষ করল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, তুরীয় অবস্থাটা যে ঠিক কি ব্যাপার তাও তখনও জানি না।

অচিরাৎ জানলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন একেই বলে। টিহরী থেকে বেরিয়ে প্রথম রাত যেখানে আশ্রয় নিতে হল সেখানে অবস্থান করছিলেন "আমাগো লাঙ্গুলবারিয়ার জিতেন সাধু"। যাত্রা শুরু হবার আগেই বিস্তর চেলা-চেলী সঙ্গে নিয়ে সাধুজী চলে এসেছেন। ধীরে সুস্থে অগ্রসর হচ্ছেন গঙ্গোত্রীর পথে। তাড়া নেই কারণ বিস্তর রসদপত্র সঙ্গে রয়েছে।

লাঙ্গুলবারিয়ার জিতেন সাধুর নাম কখনও শুনি নি আমি। সুতরাং আমার মত অভাজন দুনিয়ায় দুটি নেই। সাধুর এক চেলা বলেই বসলেন—"অ! কন্ কি কর্‌তা? আমাগো জিতেন সাধুর নামডাও শোনেন নাই কানে—পোড়াকপাল—"

পোড়াকপাল তো বটেই। কপালের ভেতর ছাই ভস্ম গোবর পোরা না থাকলে "আমাগো জিতেন সাধুর নামডা" আগেই কপালের ভেতর স্থান পেত। থাকুক ছাই ভস্ম গোবর পোরা কপালে, এক দল বাঙালীর সঙ্গ তো পেলাম। সুতরাং কপাল ঠুকে কপালকে একটা সেলাম জানাতেই বা দোষ কি!

অতঃপর যথাকালে বাবার দর্শন পাওয়া গেল। রাত তখন প্রথম প্রহর পার হয়েছে, আমাকে নিয়ে গেলেন সাধুবাবার চেলারা পাশের চটিতে। দর্শন পেলাম সাধুবাবার, এবং সঙ্গে সঙ্গে পিলে চমকে গেল একদম। বাপ্ স্! একদম বিকারবিহীন না হলে ঐ অবস্থায় ঐ পরিবেশে কেউ কারও সঙ্গে দেখা করতে পারে ?

আমি জানি, আমার এই লেখাটা হয়ত অনেক পাঠিকার নজরেও পড়বে। তাঁদের কাছে আগে থাকতে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। এখন যে শ্লোকটি আওড়াব, সেটি স্বয়ং শঙ্করাচার্যের সৃষ্টি, আমার নয়। অতএব আমার ওপর যেন কেউ ক্ষেপে উঠবেন না।

শঙ্কর বলছেন—

ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীনাং ন তিষ্ঠেত্তৎ সমীপতঃ।
দারবীমপি যোষাঞ্চ ন স্পৃশেদ্ যঃ স ভিক্ষুকঃ॥

ভিক্ষুক অর্থে সন্ন্যাসী মেয়েমানুষের মুখ পর্যন্ত দেখেন না, তাদের ধারে কাছে থাকেন না, এমন কি নজের পত্নীকে পর্যন্ত স্পর্শ করেন না।

তবে লাঙ্গুলবারিয়ার জিতেন সাধু ভিক্ষুক নন। একটি আধটি যোষা নিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে খরচের ঠেলায় মানুষ অন্ধকার দেখছে চোখে, লাঙ্গুলবারিয়ার জিতেন সাধু আধ কুড়িরও বেশী যোষা দ্বারা অঙ্গসেবা করাচ্ছেন। ভিক্ষালব্ধ অর্থে ঐ রাজকীয় আরাম উপভোগ করা হচ্ছে, এ কথা কি জানা যায়!

ভিক্ষুক হোন চাই না হোন কিন্তু সাধু বটে। ষোল থেকে পঞ্চাশ সব রকম বয়সের যোষা, সধবা বিধবা অথবা সব জাতের যোষা ছেঁকে ধরেছেন সাধুকে। একসঙ্গে সব যোষাগুলি হাত লাগিয়েছেন সাধুর শ্রীঅঙ্গে, হাত পা মুখ মাথা বুক পিঠ নাভি কোমর তলপেট মায় দুই উরুতেও তৈলমর্দন হচ্ছে। খাঁটি সরষের তেল, সোজা চলে এসেছে সেই লাঙ্গুলবারিয়া থেকে হরিদ্বার দেবপ্রয়াগ টিহরী পার হয়ে। এসব কি চাট্টিখানি কথা! ভাবতে গেলেই মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়

আমার ভেবাচাকা লাগা দশা দেখে বোধ হয় সাধুবাবার কৃপা হল। এক চেলাকে কাছে যেতে ইশারা করলেন। চেলাটি তাঁর মুখের কাছে নিজের কান বাড়িয়ে দিল। কি যে আদেশ হল চেলাকে বুঝতে পারলাম না। চেলাটি ফিরে এল আমার কাছে। বলল—"চলেন কর্‌তা, আপনার খাওনের শোওনের জোগাড় কইর‍্যা দি। থাহেন আমাগো সাথে, খ্যাবার ত্রুটি অইব না।"

চিত্তবৈকল্য পাকড়াও করে ফেলেছে তখন। অর্থাৎ প্রায় বোকা ছাগল বনে গেছি। সুড়সুড় করে চেলাটির পিছু পিছু চলে এলাম। তখনকার মত পালিয়ে প্রাণ বাঁচল।

অত সহজে কি পরিত্রাণ পাওয়া যায়!

খাওনের প্রয়োজন নেই, শোওনের প্রয়োজন আছে। দুটি চটিতে খানচারেক ঘর, সবগুলি ঘরই ওঁরা দখল করে আছেন। ঠিক করলাম, বাইরে কোথাও কম্বল বিছিয়ে পড়ে থাকব। হরি হরি, তাও কি হয় কখনও! স্বয়ং সাধু বলে দিয়েছেন কোথায় কোনখানে আমার শোওনের ব্যবস্থা করতে হবে। চমৎকার ব্যবস্থা, ছোট একটি খুপরি পড়েছিল এক পাশে, সেই রাত্রে সেটিকে পরিষ্কার করা হল। অতিথি নারায়ণের ওপর ওঁদের যত্ন-আত্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আলাদা একটা খোপ পাওয়ায় মাথাটা ঠাণ্ডা হল। রাত তো কাটুক ভালোয় ভালোয়, সকাল হলেই দে চম্পট। লাঙ্গুলবারিয়ার স্বনামধন্য জিতেন সাধুর খানদানী আদবকায়দার সঙ্গে পেরে উঠব কেন আমি। খানিক আগে বাঙালীর সঙ্গ পাওয়া গেল ভেবে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। উত্তেজনা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তখন। রাতটা কাটলে হয়।

শুয়ে পড়লাম কম্বল মুড়ি দিয়ে। ওধারে খোল-কত্তাল সহযোগে কীর্তন শুরু হল।

> শুধু মুখের কথায় হয় না।
> ব্রজগোপীর প্রেম না হলে সে ধন মেলে না॥

সে ধনটি কি ?

শুনতে শুনতে ঐ একটা প্রশ্নই অনবরত উদয় হতে লাগল চিত্তে। সে ধনটি কি, যেটি মেলবার জন্যে ব্রজগোপীর প্রেম হওয়া চাই। ব্রজগোপীর প্রেমটাই বা কেমন জাতের প্রেম তাই বা কে জানে! মোটের ওপর জানা গেল যে জিতেন সাধু হচ্ছেন বৈষ্ণব, ব্রজগোপী নিয়ে বৈষ্ণবরাই মাথা ঘামায়। বৈষ্ণব শাক্ত শৈব কত জাতের সাধুই যে আছেন। হিমালয়ে যখন এসে পড়েছি তখন সব জাতের সাধু-মহাত্মার দর্শন পাওয়া যাবে। সব মতই মত সব পথই পথ, স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন। ভগবানের নাম নিয়ে মেতে থাকতে পারলেই হল, সেইটুকুই হচ্ছে আসল কথা। এই যে এতগুলি নরনারী সেই বাঙলা দেশ থেকে এতদূরে চলে এসেছে ঘর-সংসার ছেড়ে, হিমালয়ের অন্তরে এই যে খোল-কত্তাল বাজছে আজ, এও সেই পরম করুণাময়ের কৃপাতেই সম্ভব হচ্ছে। কাকে যে কি ভাবে টেনে আনেন তিনি! আনলেন টেনে একজনকে, আহা প্রভুর কি করুণা!

"কে ? কে ?"

ভয়ঙ্কর রকম চমকে উঠে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হল না। কিন্তু এটা ঠিকই যে কেউ একজন এসেছে ঘরে। হ্যাঁ, ঐ তো বসে আছে সামনে, ঠিক আমার পায়ের কাছেই বসে আছে। কি মতলব ? খুন করবে নাকি ? টাকাগুলোর সন্ধান পেয়েছে বোধ হয়। চেঁচাব ?

চেঁচালেই বা শুনছে কে তখন। প্রচণ্ড জোরে বাজছে খোল-কত্তাল, সেই সঙ্গে উদ্দাম নৃত্যও চলছে বোধহয়। তখনও সেই 'ব্রজ-গোপীর প্রেম না হলে' পদটুকুই অবিশ্রান্ত গাওয়া হচ্ছে। চেঁচিয়ে কি লাভ, দেখাই যাক কি করে লোকটা। যদি গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে টাকাগুলো দিয়ে দোব। আপদ চুকে যাবে।

বলে না যে কিছু! নড়েও না যে! কি আপদ, কিছু বলবে কইবে তো ? না সারারাত ঐভাবে বসে থাকবে ?

বেশ চেষ্টা করে গলার স্বরটা যাতে না কাঁপে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—"কে তুমি? কি চাও?"

আহেলী মেঘনা পাড়ের টানে খুবই মিনমিনে জবাব হল—"আপনার চরণে ত্যাল্ দিবার তরে—"

"কি বললে?"

মুহূর্ত-মধ্যে চরণের রক্ত মাথায় চড়তে লাগল। সাংঘাতিক এক শখও চাপল সঙ্গে সঙ্গে। চরণ দুটি সজোরে চালিয়ে ঐ আপদটাকে ঘর থেকে একদম বাইরে ফেললে কেমন হয়?

আপদ তখন কাঁপা গলায় বিজবিজ করে কি যেন বলছে। এক বর্ণও বুঝতে পারছি না। ধমক দিলাম—"যা বলছ স্পষ্ট করে বল না, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। কেন এসেছ এখানে? কে তোমাকে এখানে আসতে বললে?"

পাঠিয়েছেন স্বয়ং জিতেন সাধু। এটি নাকি একটি অতি পবিত্র প্রথা। নিশীথে নিরিবিলিতে চরণে ত্যাল্ মালিশ করার নামই নাকি গোপী-ভাব। সাধু-মহাত্মার ভজনা করে উদ্ধার পাবার আশাতেই তো ঘর ছেড়ে আসা। এবং নিতান্ত পাপিষ্ঠা বলেই নাকি আমি সেই বেচারীর ওপর কৃপা করছি না। আরও কত কি বলতে লাগল ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করে। কিছুই শুনতে পেলাম না, শুনলেও সব কথা বোঝবার সাধ্য ছিল না আমার। দ্বিতীয় রিপুটি তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

এরা ভাবল কি আমাকে? সব কটাকে ধরে চাবকাতে পারলে গায়ের জ্বালা জুড়োত। মরতে এসেছে হিমালয়ে ঐ ইতরামি করতে! এদের কি পঙ্গু হবারও ভয় নেই? দেবভূমি হিমালয়, হিমালয়ের সঙ্গে চালাকি? কি স্পর্ধা!

হঠাৎ যেন মনে হল কাঁদছে। হ্যাঁ, সত্যিই তো কাঁদছে আপদটা। খুবই চেষ্টা করছে যেন কান্না চাপবার। কেন? ন্যেকামি করে আবার কাঁদা হচ্ছে কেন?

খিঁচিয়ে উঠলাম—“কি হল ? কেঁদে মরছ কেন ?”

কি বলছে ? বাড়ি যাবে ? ওর মায়ের কাছে যাবে ? তার মানে একে চুরি-চামারি করে এনেছে নাকি ?

“দাঁড়াও দাঁড়াও। শুনছ, কেঁদো না। কি ব্যাপার বল তো ? কোথায় বাড়ি তোমার ? কি করে জুটলে এদের সঙ্গে ? সব বল তো আমাকে। কেঁদো না কেঁদো না। কত বয়েস তোমার ? দূর ছাই, তোমাকে যে দেখতেও পাচ্ছি না।”

চরণে ত্যাল নেওয়াটা আর হল না। তার বদলে ‘আমাগো লাঙ্গুলবারিয়ার” পাশের গাঁয়ের ছিষ্টিধর কপালীর নাতনী সোনামণির কপাল কি ভাবে পুড়ল তাই শুনতে লাগলাম।

চুলোয় যাক সোনামণির কাহিনী। লক্ষ গণ্ডা সোনামণি লক্ষ গণ্ডা অজুহাত দেখাবে ঘর থেকে পথে বার হবার। শুনলেই মনে হবে এমন মর্মান্তিক কাহিনী এর আগে আর একটিও শুনি নি। ঐ জাতের কাহিনী শুনে গলে থসথসে হয়ে যাবে এমন মন নিয়ে আমি ঘর করি না। কিন্তু ঐ যে লোকটা, ঐ জিতেন সাধু, কি পৈশাচিক শক্তি ওর ! এতগুলো নারীকে অনায়াসে বরদাস্ত করছে। কেন করছে ? নারী-বাহিনী ঘাড়ে করে চলে এসেছে হিমালয়ে, দিবারাত্র আধকুড়ি নারী ঘিরে আছে ওকে। কি সুখ পাচ্ছে ও ? স্পষ্ট ভাষায় ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, এই নরক-যন্ত্রণা সহ্য করার হেতুটা কি ?

সোনামণিকে বললাম, “যাও শুয়ে পড় গে। ভালই করেছ এসে। গঙ্গোত্রী কেদার-বদরী দর্শন হবে, জন্ম সার্থক হবে। এ জন্মটা যেমন কেঁদে কাটছে আসছে জন্মটা তেমনি হাসতে হাসতে কাটবে।” বলে তৎক্ষণাৎ তাকে ডিঙিয়ে খুপরি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ওপাশের চটিতে কীর্তন তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

হয়ত এইটুকু পড়ে মুখ বেঁকিয়ে হাসবেন অনেকে। নিজেকে একজন পহেলা নম্বরের জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষ বলে পরিচয় দিতে চাই

ভেবে কেউবা ভুরু কোঁচকাবেন। স্বাভাবিক, আমি মানছি, ঐরকম মনে করাই একান্ত স্বাভাবিক। আসল ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম। আজ এতকাল পরে অনেক ভেবেচিন্তে নিজেকে নিজে নানারকম উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে কয়েকটা জবাব খাড়া করতে পেরেছি। সেদিন রাত্রে সোনা-মণির হাতের ত্যাল্‌কে প্রত্যাখ্যান করার হেতুটা হল লক্ষ্মীছাড়া সর্বনেশে রাগ। লাঙ্গুলবারিয়ার জিতেন সাধু কি ঠাওরেছে আমাকে? ব্যাটার এতবড় আস্পর্ধা যে আমার সঙ্গে ইতরামি করতে আসে?

আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। হয়ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। জিতেন সাধুকে চিনি না জানি না, সোনামণিকে চিনি না জানি না। ফাঁদ পেতে থাকে যদি? এতটুকু দুর্বলতা প্রকাশ পেলে সোনামণি হয়ত চেঁচামেচি করে সবাইকে জমা করবে। তারপর দে মার তো দে মার। সবাই মিলে যদি পিটুনি শুরু করত তাহলে সেখানে বাঁচাত কে আমাকে?

সর্বশেষ কারণটি হচ্ছে বিতৃষ্ণা। ঐ হতভাগী সোনামণির ওপর বিতৃষ্ণা। মাথা ঠাণ্ডা এখন, বিচার বিবেচনা করে দেখছি যে সেই সোনামণিটিকে মানুষ বলেই মনে হয় নি। একটা কৃমি, কৃমি নয় জোঁক, বা ঐ জাতীয় কিছু, কামড়ে ধরতে পারলে আর রক্ষে নেই, রক্ত চুষবে।

মোটের ওপর সেই সময় চিত্তে বহু জাতের ভয়-ভাবনাই উদয় হয়েছিল, শুধু ঐটি বাদে। যেটিকে লোকে বলে আদি রিপু, শাস্ত্রে যাকে বিষধর সদৃশ ইন্দ্রিয় নাম দিয়েছে।

বাকী রাতটুকু হাঁটতে হাঁটতেই কেটে গেল। ঠিক করে ফেললাম ভোর হবার আগেই উত্তরকাশীর দিকে পা চালাব। কম্বল দুখানা কমণ্ডলুটা আর লাঠিগাছা রয়েছে খুপরির ভেতরে। ওগুলো নিতে পারলেই হয়। খুপরির ভেতর যাবার সাহস হল না। আচ্ছা, ভোর তো হোক তখন দেখা যাবে।

কীর্তন বন্ধ হল কখন জানতেই পারি নি। কতবার যে যাওয়া

আসা করেছি চটি দুটোর সামনে দিয়ে তাও খেয়াল করি নি। গোঁ-ভরে হাঁটছি আর ভাবছি, ঐ জিতেন সাধুটাকে যদি কোনও রকমে নাগালের মধ্যে পেতাম! এমন শিক্ষাই দিয়ে যেতাম বেটাকে যে হিমালয়ে এসে আধকুড়ি মেয়েমানুষ নিয়ে ব্রজগোপীর প্রেম করা বেরিয়ে যেত। উপায় নেই, এখানে ঐ অতগুলো চেলা-চেলীর সামনে প্রভুকে একটি কথাও বলা চলবে না। কি আপসোস!

হঠাৎ পা চালানো বন্ধ হল। আর একটু হলেই লেগেছিল ধাক্কা। চমকে উঠে আবার চেঁচিয়ে উঠলাম—"কে? কে?"

সুরেলা কণ্ঠে জবাব হল—"আমি।"

"আমি কে?"

"কেন, খানিক আগেই তো দেখেছ আমাকে বাবাজী, চিনতে পারছ না?"

"জিতেন—মানে—আপনি—সাধু—"

"হ্যাঁ, আমি জিতেন, সাধু কি না তা জানি না।"

গুহ্যাতিগুহ্য ব্যাপার নিয়ে দু-চার কথা বলতে হবে এবার। ভগবান জানেন এর ফল ভাল হবে না মন্দ হবে। আগে থাকতে সাবধান করে দিচ্ছি তাঁদের যাঁরা সেক্স্ কথাটা শুনলেই আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়েন। বহুজাতের সাধন-প্রণালী চালু আছে দেশে, প্রত্যেকটি তন্ত্রের পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। হয়ত সেগুলো ভুল, চিরে চিরে বিচার করলে ধোপে টিকবে না। তা না টিকুক, শুনতে জানতে দোষটা কি। নিজেকে এতটা হীন এতটা দুর্বল ভাবব কেন যে সেক্স্ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা কানে গেলেই একেবারে গোল্লায় যাব! যাক গে, প্রথমেই কচকচি লাগিয়ে লাভ নেই। তবু সাবধান হওয়া ভাল। যাঁরা ছুঁচিবাইগ্রস্ত, শ্লীল-অশ্লীল খুঁজতে খুঁজতে যাঁদের জীবন কাটছে, তাঁরা যেন এখান থেকে এই পরিচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত না পড়েন। এইটুকু জানিয়ে দিয়েই আমার কর্তব্য সমাধা করলাম।

জিতেন সাধুর বয়েস ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। রঙ ফরসা নয়, কালোও নয়। মেদ নেই শরীরে। কোমর অস্বাভাবিক রকম সরু। গলাটাকে একটু লম্বা বলেই মনে হয়। মুখও লম্বাটে ধরনের, নাক যথেষ্ট উঁচু, চোখ দুটি সদা সর্বক্ষণ আধবোজা অবস্থায় থাকে। মুখে গোঁফ-দাড়ি নেই, একদম মাকুন্দ। মাথায় চুল আছে, ভুরুর দু আঙ্গুল ওপর থেকেই শুরু হয়েছে চুল, যথেষ্ট পরিমাণে তেল দিয়ে চুলগুলো চুড়ো করে ব্রহ্মতালুর ওপরে বাঁধা থাকে। উল্লেখ করার মত আর কিছু মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, একটা কথা বলতেই হবে, সেটা হল জিতেন সাধুর গলার স্বর। কথা বললেই মনে হয় সুর করে পদ্য পড়ছেন যেন। সেই সুরে রাগ দ্বেষ বা তর্কাতর্কি করার ছিটেফোঁটা গরজ নেই। সাধু যা বলেছিলেন আমাকে, কিংবা তাঁর বক্তব্য থেকে যা আমি বুঝেছিলাম, অতি সাবধানে সেটুকু উল্লেখ করছি। যাঁরা মনস্তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান তাঁরা জিতেন সাধুর মতামত নিয়ে বিচার করুন। এইটুকুই অনুরোধ যে এই মতামতটা আমার বলে কেউ ধরে বসবেন না। কারণ এইসব রহস্যময় ব্যাপার বোঝবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি আমার ঘটে নেই। তাছাড়া এই সব উটকপালে কাণ্ডকারখানা নিয়ে মগজ উত্তপ্ত করার গরজ কি আমার!

সাধু আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"বলতে পারেন ভগবানের ওপর কোন্ ভাব আরোপ করা সব থেকে সহজ? নিশ্চয়ই বলবেন ভক্তিভাব, কারণ ভক্তির চেয়ে পবিত্র ভাব আর কি আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"সেই ভক্তির আবার জাত দুটো, পরা ভক্তি আর অপরা ভক্তি। ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ঈশ্বরের ওপর খাঁটি ভক্তের যে টান সে টানের তুলনা নেই,। কিন্তু সেই খাঁটি ভক্তিটা জন্মাবে কি করে মানুষের চিত্তে সেটা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামানো হয় নি। নামগান নামকীর্তন এবং মহিমা শ্রবণ এতেই নাকি চিত্তের বিকার নষ্ট হয়, চিত্তে ভক্তির উদ্রেক হয়। অর্থাৎ এ কথাটা মেনে নেওয়া

হয়েছে যে ভক্তিভাব এমনই একটি ভাব যেটিকে অনুশীলন করে নিজের মধ্যে আমদানি করতে হবে। সেটাও হবে করুণাময়ের কৃপা হলে। খুবই গোলমেলে ব্যাপার নয় কি?"

কি জবাব দি আমি শোনার আশায় সাধু তাঁর সেই আধবোঁজা দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে রইলেন। কিছুই বললাম না, বলবার মত কিছু খুঁজেও পেলাম না। আমি শুধু শুনতে চাই। স্পষ্টা-স্পষ্টি জিজ্ঞাসা করেছি সাধুকে আসল কথাটা। একপাল নারী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন তিনি? ঐ নারীগুলো তাঁর কোন্ কাজে লাগছে? শোনালেন সাধু। যেভাবে একটু একটু করে বোঝালেন আমাকে সেই ভাবে ব্যাপারটা আগাগোড়া ব্যক্ত করা সম্ভব নয় এখন। কারণ মাঝখানে ত্রিশটা বছর গড়িয়ে চলে গেছে। তা যাক্, জিতেন সাধুর বক্তব্যটুকু বোধহয় এখনও যথাযথ উগরে দিতে পারি। এইবার সেই চেষ্টাই করছি।

চৈতন্যদেব বললেন, ভক্তির আগে প্রেম। প্রেমে মানুষ পড়েই, প্রেমে পড়লে কি জাতের টান টানতে থাকে সেটা প্রায় সবাই জানে। ভক্তির টানের চেয়ে প্রেমের টানের শক্তিই বেশী। ভক্তির মত প্রেমটাকে অনুশীলন করে নিজের মধ্যে জন্মাতে হয় না। অর্থাৎ কি না প্রেমে পড়া নামক ব্যাধিটা আমাদের ভেতরেই রয়েছে। অতএব প্রেমের টানটুকু দিয়ে ভগবানকে টেনে আন।

আর এক পা এগিয়ে চৈতন্যদেব বললেন, প্রেমের টানের চেয়ে বড় টান হচ্ছে বিরহের টান। যে জ্বলুনি ভুগতে হয় প্রেমে পড়ে, সেই জ্বলুনিটা সহস্রগুণ বাড়ে যদি মিলনের পরে আবার বিচ্ছেদ ঘটে প্রেমাস্পদের সঙ্গে। বিচ্ছেদের জ্বালার তুল্য জ্বালা নেই। বিচ্ছেদের সময় অহরহ শ্বাস-প্রশ্বাসে শুধু তার কথাই মনে পড়ে। অতএব ঐ বিচ্ছেদের সময় যেমন টান হয় সেইরকম টানে তোমার ভগবানকে টান।

তার পরেও আছে।

শ্রীরাধা বলছেন—"বিচ্ছেদের সময় বিরহের আগুনে পুড়ছি বটে, কিন্তু এর মধ্যেও ফাঁকি আছে। কোনও কোনও সময় আমি বিরহের কথা ভুলে যাই। বিরহের আগে যে মিলন হয়েছে বহুবার। সেই মিলনকালের স্মৃতিতে ডুবে থাকি, আমার সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে যায় তখন। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন দিবারাত্র অনুক্ষণ প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে শুধু তার কথাই ভাবতাম। তখন আমি কুলের কুলবধূ, তখন আমি কুল খোয়াই নি, লজ্জা-শরমের মাথা খাই নি। ঘরে শাশুড়ী ননদী ছিল, ধরা পড়বার ভয় ছিল। পাছে ধরা পড়ে যাই এই ভয়ে প্রাণপণে সকলের মন জুগিয়ে চলেছি। আর ওধারে আমার মন পড়ে আছে তার দিকে। অনবরত মনে হচ্ছে ঐ বুঝি তার বাঁশী শুনতে পেলাম। ঐ বুঝি তার নূপুরধ্বনি কানে গেল। তখনও তার সঙ্গে মিলন হয় নি। তার রূপ দেখেছি আর বাঁশী শুনেছি। উঃ, সে কি অবস্থা! যে জ্বালায় জ্বলেছি তখন সে জ্বালার তুলনা হয় না।"

চৈতন্যদেব বললেন, এই হল পরকীয়া তত্ত্ব। এই জাতের টান যদি জন্মায় চিত্তে তাহলে তিনি ধরা না দিয়ে পারেন না। ভক্তির চেয়ে বড় প্রেম, প্রেমের চেয়ে বড় বিরহ, বিরহের চেয়ে বড় হল ঐ পরকীয়া তত্ত্ব। এবং তার চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।

ঐ পর্যন্ত বলে সাধু জানতে চাইলেন আমার মাথায় কিছু ঢুকল কি না। সজোরে মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ কিছুই ঢুকল না। কারণটিও ব্যক্ত করলাম। প্রেম যে কি জাতের ব্যাপার তাও জানি না। প্রেমে পড়ে গেছে কেউ শুনলে হাসি পায়। যে প্রেমে পড়েছে তার ওপর করুণা হয়। আর গা বমিবমি করে। তার কারণ যেখানে প্রেম সেখানেই একটি মেয়েমানুষ আছে। কেউ একটা মেয়েমানুষের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে নাজেহাল হচ্ছে, একথা শুনলে গা বমিবমি করবেই। ওদের জাত আলাদা ধর্ম আলাদা স্বভাব-চরিত্র সবই আলাদা। ওদের দ্বারা বাটনা বাটানো কুটনো কুটানো রান্না করানো

বাসন মাজানো ইত্যাদি কাজগুলো চলতে পারে। যাদের ছেলেপুলে দরকার তারা ওদের পেটে কয়েকটা ছেলেপুলে আমদানি করতে পারে। ব্যাস, ঐ পর্যন্ত। ওর বেশী ঐ জাতের কারও সঙ্গে কেউ ঘনিষ্ঠতা করছে শুনলে গা বমিবমি করবে না তো কি করবে? অর্থাৎ প্রেম ব্যাপারটাই আমার কাছে নেকাপনা এইটুকু সাধুজীকে বেশ করে বুঝিয়ে দিলাম।

জিতেন সাধু শুনলেন। এবং আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে আমার প্রতিটি কথা মেনে নিলেন। তারপর খুবই ভালমানুষের মত জিজ্ঞাসা করলেন— "কিন্তু ঐ যে আর একটা রোগ, মাঝে মাঝে নারীদেহের চিন্তা, ওটাও কি এড়াতে পারেন? সত্যিই তো আর গাছপাথর হয়ে যান নি! গুরুর কৃপায় ইষ্টচিন্তায় বেশীর ভাগ সময় তন্ময় হয়ে থাকেন। কিন্তু মাঝে মধ্যে এক-আধবার নারীদেহের জন্যে কেমন যেন একটা—"

হাঁ, তা হয় বৈকি। নিশ্চয়ই হয়। তবে বিশেষ কাবু করতে পারে না। চাবকাতে চাবকাতে মনকে বাগ মানিয়ে ফেলেছি। বেয়াড়াপনা করলেই চাবুক হাঁকড়াই। অকপটে কবুল করলাম।

"তাহলে মানছেন যে ব্যাধিটা আছে ভেতরে—কেমন কি না?"

"তা তো আছেই। কিন্তু ব্যাধিটা আছে বলেই যে ঐ জাতের একপাল মেয়েমানুষ সঙ্গে নিয়ে দগ্ধে মরতে হবে—"

জিতেন সাধু অল্প একটু হেসে বললেন—"আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি কীটস্য কীট, নরকে পড়ে পচে মরছি। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। ঐ ব্যাধিটা রয়েছে ভেতরে এটা আপনিই মানলেন যখন তখন এটাও কি মানবেন যে ঐ কামই হচ্ছে এই দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় শক্তি? আপনি আমি, মাতৃগর্ভ থেকে যিনিই ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, তিনি কামজ অর্থাৎ কাম থেকে জাত, এটা কি মানবেন? যদি মানেন, তাহলে ঐ ভয়ঙ্করী শক্তি কামের সাধনাই করুন না কেন?"

"অর্থাৎ ?" ভুরু কুঁচকে চোখ পাকিয়ে তেড়ে উঠলাম।

"অর্থাৎ, ঐ কামশক্তিটা তো রয়েছেই আপনার মধ্যে। ঐ শক্তিটাকে তো আর বাইরে থেকে অনুশীলন করে আয়ত্ত করতে হবে না। যতই সাবধানে থাকুন, ন্যায় নীতি ধর্মজ্ঞান সমাজ লোকলজ্জা আইন ইত্যাদি যতগুলো লাগাম লাগিয়েই না ঐ বেয়াড়া ঘোড়াটাকে সামলান, ওটা আপনাকে জ্বালাচ্ছেই। ওটা থেকে আমরা জন্মেছি, ওটা নিয়ে আমরা বেঁচে রয়েছি, ঐটে নিয়েই মরব। এখন করছি কি না, যতবার ঐ ব্যাধিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ততবার চাপা দিচ্ছি। আপনার মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ক্ষণিকের জন্যে হলেও আচ্ছন্ন হয়ে যায় ঐ কামশক্তির অমোঘ প্রভাবে, যদি আপনি নেহাত ভণ্ড না হন তো স্বীকার করতে বাধ্য। ঠিক যতখানি আসক্তি রয়েছে নারীদেহের ওপর, তার অন্ততঃ চারগুণ বিতৃষ্ণা গড়ে তুলেছেন চিত্তে। অর্থাৎ আসক্তি আর ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। যেখানে আসক্তি নেই সেখানে ঘৃণা নেই। যেখানে ঘৃণা নেই সেখানে আসক্তিও নেই। আমি বলতে চাচ্ছি, ঘৃণার দরকার কি আসক্তিরই বা দরকার কি। তার চেয়ে মনকে বললেই হয়—"বাপু, মাঝে মধ্যে যখন ঐ জিনিসটাই তুমি চাও তখন ঐ জিনিসের ওপর রোজ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে অবস্থান কর তো দেখি।" দেখবেন তাও সম্ভব নয়। যে যোনির জন্যে মন আঁকুপাঁকু করে মরে, সেই যোনির পানে তাকিয়ে মাত্র একটা মিনিট মনকে স্থির করুন তো দেখি। অসম্ভব, মন আবার ছুটে বেড়াচ্ছে। আসল কথা মনকে লয় করা চাই। কামশক্তি আপনার ভেতরে রয়েছে। তাই দিয়েই মনকে লয় করুন।"

আরও বহু কথা বলেছিলেন "আমাগো লাঙ্গলবারিয়ার জিতেন সাধু"। কেই বা শোনে কেই বা বোঝে ঐসব রহস্যতত্ত্ব। গোল্লায় যাক, পালাতে পারলে বাঁচি তখন। দরকার নেই বাবা জিতেন সাধুর ষ্টাইলে থুড়ি পদ্ধতিতে মন লয় করে। স্বয়ং সাক্ষাৎ ঈশ্বরও যদি

বলেন—"বাপু হে, একটা মেয়েমানুষ সঙ্গে আন, তাহলে তোমাকে স্বর্গে ঢুকতে দোব", তাহলেও পিছিয়ে যাব। স্বর্গ মাথায় থাকুক, ঐ ঝঞ্ঝাটে মানুষে পড়ে!

প্রায় ছুটে চলেছি উত্তরকাশীর পথে। কোথায় পড়ে থাকছি রাত্রে, সারাদিন কি রকম পথ দিয়ে হাঁটছি, কে সেদিকে খেয়াল করে। সন্ন্যাসব্রত আমার, সমস্ত জাতের ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মেছে আমার চিত্তে, আমাকে আর পায় কে!

সন্ন্যাসীর ধর্ম কি? কমলোদ্ভব বলেছেন—

অয়ং সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্ম ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ।
যদ মনসি সম্পন্নং বৈতৃষ্ণং সর্ব্ববস্তুষু।
তদাসন্ন্যাসমিচ্ছেত্তু পতিতঃ স্যাদ্বিপর্য্যয়ে॥

যতক্ষণ না সর্ববস্তুতে বিতৃষ্ণা জন্মাচ্ছে ততক্ষণ সন্ন্যাস গ্রহণ করবে না। করলে পতিত হবে, বিপর্যয়ে পড়বে, বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

তা সন্ন্যাসী হয়েছি বটে কিন্তু দশনামী সম্প্রদায়ে ঢুকতে পারি নি। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্যদেবের দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত না হতে পারলে নিজেকে সন্ন্যাসী বলে পরিচয় দিতেও পারছি না। উত্তরকাশীতে গিয়ে সর্বাগ্রে এক দশনামী মহাত্মার কাছে সন্ন্যাসটা পাকা করে নিতে হবে তারপর অন্য কথা। স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস নেন। দশনামী না হওয়া পর্যন্ত উদ্ধার আছে!

দশনামীদের দশটা নামও তখনো জানি না। কুম্ভমেলায় এক এক আখড়ার শোভাযাত্রা দেখে মুণ্ড ঘুরে গেছে। হরিদ্বার হৃষীকেশে কালীকম্বলীর ছত্রে ভিক্ষা নিতে গিয়ে দেখেছি, দশনামীদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। যেখানে দশনামীরা ভিক্ষা নেন, সেখানে আমার মত নামগোত্রহীন সাধু ভিক্ষা পাবে না। দশনামীরা আমার মত বেওয়ারিস সন্ন্যাসীর সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে ভোজন করেন না। সাধুসমাজে যে দশনামী নয় সে হল অচ্ছুৎ। ঐ অচ্ছুৎত্ব ঘোচাতে হবে,

জাতে উঠতে হবে। সন্ন্যাসীরও গোত্র আছে জাত আছে বংশ-পরিচয় আছে। ঠিকঠাক পরিচয় দিতে না পারলে ধরা পড়ে মার খেতে হয়। সর্বপ্রথম আমি ঠকেছিলাম হরিদ্বারে। একটা মঠে গিয়েছিলাম আশ্রয় নিতে। জিজ্ঞাসা করল, পরিচয় ?

পরিচয় ! সন্ন্যাসীর আবার পরিচয় কি ?

তুমি কি দশনামী ?

আলবৎ।

আশ্রম কি ?

আশ্রম ! না আমার কোনও আশ্রম নেই।

মঠ ? ক্ষেত্র ? তীর্থ ? দেবতা ? আচার্য ? ব্রহ্মচারী ? সম্প্রদায় ? বেদ ? গোত্র ? মহাবাক্য ? পদ ?

একে একে অতগুলো প্রশ্ন হল। তারপর তারা হাঁকিয়ে দিলে। গায়ে হাতটা আর দিলে না।

সেই থেকে সাবধান হয়েছি। ফস করে নিজেকে দশনামী বলে পরিচয় দিচ্ছি না। দশনামী কিন্তু হতেই হবে। দশনামী হয়ে ঐ পরিচয়-গুলো মুখস্থ করে জাতে উঠতে হবে। সুতরাং চল মন উত্তরকাশী। উড়ে চল। আগে পাকাপোক্ত সন্ন্যাসী হয়ে নিয়ে তবে অন্য কথা।

মজার কথা হল দশনামী সম্প্রদায়ের নাম গোত্র পরিচয় যেদিন জানতে পারলাম সেদিন ঘাড় থেকে দশনামীর ভূত নেমে গেছে। যাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম তাঁর নাম সাধু প্রজ্ঞানাথ। বাবা গোরখনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য প্রজ্ঞানাথজী। বছরের ছ-মাস গঙ্গোত্রীতে ছ-মাস উত্তরকাশীতে অবস্থান করতেন। প্রজ্ঞানাথজী উত্তরকাশীতে আমায় আশ্রয় দেন। প্রজ্ঞানাথজীর কৃপায় মা আনন্দময়ীর সাক্ষাৎ পাই। এ সমস্ত কথা পরে আসছে। এইবেলা দশনামী সম্প্রদায়ের পরিচয়টুকু জানিয়ে দি। আমার মনে হয় দশনামী বলতে কাদের বোঝায় তা অনেকেই জানেন না।

তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরি পর্ব্বতসাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরীতি দশ কীর্ত্তিতঃ॥

(১) তীর্থ (২) আশ্রম (৩) বন (৪) অরণ্য (৫) গিরি (৬) পর্বত (৭) সাগর (৮) সরস্বতী (৯) ভারতী (১০) পুরী ঐ দশটি হচ্ছে দশটি সম্প্রদায়ের নাম।

আচার্য শঙ্করের চারজন মাত্র শিষ্য। প্রথম বিশ্বরূপ বা হস্তামলক! দ্বিতীয় বলভদ্র, তুঙ্গ বা পদ্মপাদ। তৃতীয় নবটক বা ত্রোটক। চতুর্থ পৃথীবর বা সুরেশ্বর। শঙ্করাচার্যদেব ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। চারজন শিষ্যকে চার মঠের আচার্য করে দিয়ে যান। ঐ চারজন শিষ্য থেকেই দশনামী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। সাক্ষাৎ শঙ্করাচার্যদেব দশনামী সম্প্রদায় গড়ে গেছেন এ কথাটা ভুল। এখন শুনুন, দশনামীদের কিভাবে পরিচয় দিতে হয়। পরিচয় আবার দু রকমের, স্থূল ও সূক্ষ্ম। যতদূর আমার মনে পড়ছে, ঐ দু-জাতের পরিচয়ই সাজিয়ে দিচ্ছি।

প্রথম

স্থূল পরিচয়	সূক্ষ্ম পরিচয়
আশ্রম—পশ্চিম	গুরু—ব্রহ্মা
মঠ—সারদা	ঋষি—তৎপুরুষ
ক্ষেত্র—দ্বারকা	উপদেশ—সৃষ্টি
তীর্থ—গোমতী	গম্য—কুণ্ডলিনী বা প্রকৃতি
দেবতা—সিদ্ধেশ্বর	যোগ—মন্ত্র ও হট
দেবী—ভদ্রকালী	সাত্বিককরণ—নাসিকা
আচার্য—বিশ্বরূপ বা হস্তামলক	রাজসিককরণ—পাদ
ব্রহ্মচারী—স্বরূপ	চক্র—মূলাধার
সম্প্রদায়—কীটবার	মূর্তি—পৃথিবী
বেদ—সাম	ব্রহ্মা—অ
গোত্র—অবগত	অনুভূতি—ন্যায়-দর্শন

স্থূল পরিচয়	সূক্ষ্ম পরিচয়
মহাবাক্য—তত্ত্বমসি	জ্ঞানদা—প্রথম জ্ঞানভূমি
পদ—তীর্থ এবং আশ্রম	কার্য—তত্ত্বমসি-বিচার

অর্থাৎ দ্বারকার সারদা মঠভুক্ত সন্ন্যাসীরা নিজেদের তীর্থ ও আশ্রম বলে পরিচয় দেন।

দ্বিতীয়

স্থূল পরিচয়	সূক্ষ্ম পরিচয়
আশ্রম—পূর্ব	গুরু—বিষ্ণু
মঠ—গোবর্ধন	ঋষি—অঘোর
ক্ষেত্র—পুরুষোত্তম	উপদেশ—স্থিতি
তীর্থ—মহোদধি	গম্য—পরমাত্মা
দেবতা—জগন্নাথ	যোগ—ভক্তি বা লয়
দেবী—বিমলা	সাত্ত্বিককরণ—জিহ্বা
আচার্য—বলভদ্র (তুঙ্গ, পদ্মপাদ)	রাজসিককরণ—উপস্থ
ব্রহ্মচারী—প্রকাশ	চক্র—স্বাধিষ্ঠান
সম্প্রদায়—ভোগবার	মূর্তি—জল
বেদ—ঋক্	বিষ্ণু—উ
গোত্র—কাশ্যপ	অনুভূতি—বৈশেষিক দর্শন
মহাবাক্য—প্রজ্ঞানমানন্দব্রহ্ম	সন্ন্যাসদা—দ্বিতীয়-জ্ঞান-ভূমি
পদ—বন ও অরণ্য	কার্য—প্রজ্ঞানব্রহ্ম চিন্তা

অর্থাৎ পুরীর গোবর্ধন মঠভুক্ত সন্ন্যাসীরা নিজেদের বন অরণ্য এই দুই নামে পরিচয় দেন।

তৃতীয়

স্থূল পরিচয়	সূক্ষ্ম পরিচয়
আশ্রম—উত্তর (বদরিকা)	গুরু—রুদ্র
মঠ—জ্যোতিঃ (জোশি)	ঋষি—সদ্যোজাত

স্থূল পরিচয়	সূক্ষ্ম পরিচয়
ক্ষেত্র—মুক্তি	উপদেশ—সংহার
তীর্থ—অলকানন্দা	গম্য—কাল
দেবতা—নারায়ণ	যোগ—ক্রিয়া এবং লক্ষ্য
দেবী—পুণ্যাগিরি	সাত্ত্বিককরণ—চক্ষু
আচার্য—নরটক বা ত্রোটক	রাজসিককরণ—পাণি
ব্রহ্মচারী—আনন্দ	চক্র—মণিপুর
সম্প্রদায়—আনন্দবার	মূর্তি—তৈজস বা অগ্নি
বেদ—অথর্ব	রুদ্র—ম
গোত্র—ভৃগু	অনুভূতি—যোগ-দর্শন
মহাবাক্য—অয়মাত্মাব্রহ্ম	যোগদা—তৃতীয় জ্ঞানভূমি
পদ—গিরি পর্বত সাগর	কার্য—জ্ঞান ধ্যান প্রকাশ

অর্থাৎ জোশি মঠভুক্ত সন্ন্যাসীরা নিজেদের গিরি পর্বত সাগর বলে পরিচয় দেন।

চতুর্থ

স্থূল পরিচয়	সূক্ষ্ম পরিচয়
আশ্রম—দক্ষিণ	গুরু—ঈশ্বর
মঠ—শৃঙ্গেরী	ঋষি—বামদেব
ক্ষেত্র—রামেশ্বর	উপদেশ—অনুগ্রহ
তীর্থ—তুঙ্গভদ্র	গম্য—বিজ্ঞান
দেবতা—আদিবরাহ	যোগ—জ্ঞান (রাজযোগ)
দেবী—কামাখ্যা	সাত্ত্বিককরণ—ত্বক্
আচার্য—পৃথ্বীবর বা সুরেশ্বর	রাজসিককরণ—পায়ু
ব্রহ্মচারী—চৈতন্য	চক্র—অনাহত
সম্প্রদায়—ভূরিবার	মূর্তি—বায়ু
বেদ—যজুঃ	নাদরূপ ঈশ্বর—৮
গোত্র—ভূর্ভুব	অনুভূতি—সাংখ্যদর্শন
মহাবাক্য—অহং ব্রহ্মোস্মি	লীলোন্মুক্তি—চতুর্থ-জ্ঞান-ভূমি
পদ—সরস্বতী ভারতী পুরী	কার্য—জ্ঞানধর্মাচরণ

অর্থাৎ সরস্বতী ভারতী পুরী সম্প্রদায়রা হচ্ছেন রামেশ্বরের শৃঙ্গেরী মঠভুক্ত সন্ন্যাসী।

এই পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলে নি। আমার মনে হচ্ছে, আমি হয়তো বড্ড বেশী বাজে কথা বলছি। হিমালয়ান সাহিত্য হচ্ছে না বোধহয় ঠিক। কিন্তু করি কি? হিমালয়ের পথ ঘাট মঠ মন্দির নিয়ে বিস্তর লেখা হয়ে গেছে। সেই সব গ্রন্থ পাঠ করলে হিমালয় সম্বন্ধে জানতে বাকী থাকে না কিছুই। সুতরাং আর একবার হিমালয়ের পরিচয় দিয়ে লাভ কি!

তার চেয়ে হিমালয়ের মানুষদের সম্বন্ধে কিছু বলে নি আমি। অনেকের কাছে হিমালয়ের সব থেকে বড় আকর্ষণ হিমালয়বাসী সন্ন্যাসীরা। আমি চেষ্টা করছি সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে কিছু জানাতে। অনেকের কাছে সন্ন্যাসীরা হলেন পরম পবিত্র রহস্যময় জীববিশেষ। সত্যিই কি তাই!

৬

এইবার উত্তরকাশী।

ভাবছি, উত্তরকাশীর কোন্ ব্যাপারটা আগে লিখি! সর্বাগ্রে যা লেখা উচিত তা হল মা আনন্দময়ী। ভাগ্য ভবিতব্য নিয়তি, কিংবা সৎ লোকে যার নাম দিয়েছে 'সেই তাঁরই কৃপা', ঐ সব কটি অজুহাত একসঙ্গে দায়ী আমার ঠিক সেই সময় উত্তরকাশীতে হাজির থাকবার জন্যে। উত্তরকাশীর পথে যখন ছুটে চলেছিলাম তখন কি নিমেষের জন্যেও কল্পনা করতে পেরেছিলাম যে আমার জন্যে কি সাজানো রয়েছে সেখানে! উত্তরকাশী পৌঁছে প্রজ্ঞানাথজীর কাছে আশ্রয় পাবার পরেও কি টের পেয়েছিলাম যে স্বয়ং মা ছুটে আসছেন আমার বাকী জীবনটাকে সঠিক পথে চালিয়ে দেবার জন্যে! সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা, তখনও আমি মা আনন্দময়ীর নামও শুনি নি। ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম এক কালীবাড়ি আছে। সাধু ভোলানাথ একাসনে বসে দীর্ঘ কয়েক বছর তপস্যা করেন ওখানে, এবং সেই মহাসাধক কালী প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কে সেই ভোলানাথ? কালীবাড়িতে যাওয়া আসা শুরু করে দিলাম। প্রায় ষাট বছর বয়েস এক ব্রাহ্মণ মায়ের সেবা পূজা করছেন। গেরুয়াধারী নন, গলায় পৈতে রয়েছে, অত্যন্ত অল্প কথা বলেন, ব্রাহ্মণকে দেখে ভক্তি হল। মা আনন্দময়ী সম্বন্ধে সামান্য কিছু তিনি বললেন। ভোলানাথ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বললেন না। সংসার-বিরাগী মানুষ, পুরুতের চাকরি করবার জন্যে সেই উত্তর-কাশীতে পড়ে আছেন মনে করলে ভুল করা হবে। সত্যিই সংসার ত্যাগ করেছেন, শীতকালেও উত্তরকাশীতে থাকেন। তিনশ পঁয়ষট্টি দিন মায়ের সেবা পূজা চালাচ্ছেন। পৃথিবীতে কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। সমস্ত রকম চাওয়া পাওয়া যেন চুকে বুকে গেছে,

নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করছেন ওপারে রওয়ানা হবার জন্যে। ঐরকম মানুষের সঙ্গে বেশী কথা বলা সম্ভব নয়।

কে মা আনন্দময়ী? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? একমাত্র প্রজ্ঞানাথজীর সঙ্গে দু-চারটি কথা বলতে পাই কোনও কোনও দিন। নিজে প্রায় কিছুই বলি না, প্রজ্ঞানাথজী যা বলেন শুনে নি। সময়ও হয় না বা মনেই থাকে না মা আনন্দময়ী সম্বন্ধে প্রজ্ঞানাথজীকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে। হঠাৎ একদিন উনি নিজেই মায়ের কথা উত্থাপন করলেন। বললেন—"মা আসছেন এখানে শুনেছ বোধ হয়?"

কে আসছেন? মা? কে সেই মা?

আরও অনেক প্রশ্ন গজিয়ে উঠল মনে। চুপ করে বসে রইলাম। কথা বলা নিষেধ, প্রজ্ঞানাথের হুকুমেই তখন বাক সংযম অভ্যাস করছি। উনি শিখিয়ে দিয়েছেন, মুখ দিয়ে কোনও বাক্য উচ্চারণ করার আগে ঠিক একশ বার শ্বাস-প্রশ্বাস গুণে নেবে। ঐ শ্বাস-প্রশ্বাস গোণাটা শেষ হবার আগেই প্রজ্ঞানাথ নিজের বক্তব্য শেষ করলেন।

"তোমার যিনি ইষ্টদেবী, যাঁকে তুষ্ট করার জন্যে রাশি রাশি সংস্কৃত মন্ত্র মুখস্থ করে ফেলেছ, তিনি স্বয়ং আসছেন। কালী সাধনা করলে কি হয় জান, কালী হয়ে যায়। কালী ত্রিগুণাতীতা—

সা শক্তি দক্ষিণাকালী সিদ্ধবিদ্যা-স্বরূপিণী।
সিদ্ধ বিদ্যাসু সর্ব্বাসু দক্ষিণা প্রকৃতিপুমান॥

এইবার স্বচক্ষে দেখবে তোমার ইষ্টদেবীকে। রক্ত-মাংসের মানুষ সাক্ষাৎ তিনি, সেই পরমাশক্তি। একটি বার স্পর্শ করে নিও, তাহলেই হবে। কি মূর্তিতে আসছে বেটী সেই হল কথা!"

কি রকম যেন একটু দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন প্রজ্ঞানাথ, আমিও পড়লাম। কে সেই মা আনন্দময়ী? প্রজ্ঞানাথজী বললেন—"তোমার যিনি ইষ্টদেবী, রক্ত-মাংসের মানুষ সাক্ষাৎ তিনি, সেই পরমাশক্তি।" আরও সব গড়বড় হয়ে গেল।

প্রজ্ঞানাথ বললেন—"কালী ত্রিগুণাতীতা।" ওটা তো আমিও জানি। বহুবার গুরু শুনিয়ে দিয়েছেন—

সত্ত্বংরজস্তমঃ ইতি গুণত্রয়মুদাহৃতম্।

সাম্যাবস্থিতিরেতেষা মব্যক্তং প্রকৃতিং বিদুঃ ॥

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণের নিষ্ক্রিয় অবস্থা মূল প্রকৃতি। এবং সেই মূল প্রকৃতিই সাক্ষাৎ কালী।

রক্ত-মাংসের শরীরে যিনি অবস্থান করছেন, তিনি ত্রিগুণাতীতা হয়ে গেছেন? কি সর্বনাশ!

তারপর যেখানেই যাই, ঐ এক কথা শুনি, মা আসছেন, মা আনন্দময়ী আসছেন। কালীকম্বলীর ছত্রে ভিক্ষা নিতে গিয়ে শুনলাম —মা আসছেন। কয়েকজন দণ্ডীস্বামী ছিলেন তখন উত্তরকাশীতে, তাঁদের মুখেও ঐ এক সংবাদ—মা আসছেন।

অনেকগুলি গুহা ছিল উত্তরকাশীতে, অনেক গুহার ভেতর কাঠের তক্তা দিয়ে বাঁধানো ছিল। মহাত্মারা গুহায় বাস করতেন। সারাদিনে একবার মাত্র গুহা থেকে বেরিয়ে কালীকম্বলীর ছত্রে ভিক্ষা নিতে যেতেন, অনেকে তাও যেতেন না। ছত্র থেকে তাঁদের কাছে রুটি পৌঁছে দেওয়া হত। প্রায় সব সাধু-মহাত্মাকেই দর্শন করা হয়ে গেছে। সকলেই জানেন যে প্রজ্ঞানাথজীর কাছে আমি আশ্রয় পেয়েছি। তখনকার দিনে উত্তরকাশীতে গিয়ে প্রজ্ঞানাথজীর কাছে আশ্রয় পাওয়াটাই এক মস্ত ব্যাপার। ওতেই আমার কদর যথেষ্ট বেড়ে গেছে। সবাই ধরে নিয়েছেন যে আমি ব্যাটাও একজন কেষ্ট-বিষ্টু গোছের কিছু নিশ্চয়ই। প্রজ্ঞানাথ যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে একটা মস্ত বড় কিছু হয়ে সাধু সমাজের মুখোজ্জ্বল করব আমি। তাই কোনও মহাত্মার সঙ্গে দেখা হলেই "নমো নারায়ণ" সম্ভাষণটি পেতে শুরু করেছি। কাজেই প্রত্যেক মহাত্মা ঐ কথাটি শুনিয়ে দিলেন—"মা আসছেন, শুনেছ নিশ্চয়ই!" হিন্দী

মাদ্রাজী পাঞ্জাবী এমন কি ইংরেজী ভাষাভাষী সাধুও শোনালেন ঐ এক সংবাদ—মা আসছেন। নব্বই বছরের বেশী উত্তরকাশীতে বাস করছেন ভারতীবাবা, একমাত্র "হরি ওঁ তৎসৎ" ভিন্ন আর কোনও বাক্য যাঁর মুখ থেকে বেরোয় নি নব্বই বছরে, সেই মহাপুরুষের মুখেও নতুন কথা ফুটেছে। যে যাচ্ছে তাঁকে প্রণাম করতে তাকেই শোনাচ্ছেন—"বেটী আতী হায়।" তুমুল কাণ্ড যাকে বলে। গাড়োয়ালীদের মুখেও ঐ এক কথা। বোধ হয় একজন সাব-ডিভিসান্যাল অফিসার থাকতেন তখন উত্তরকাশীতে, থানাও বোধ হয় ছিল। ওঁরা সরকারী হুজুর হয়েও ছুটোছুটি করতে লাগলেন। রাস্তাঘাট ঠিক করতে হবে, উত্তরকাশীর কপালে কোনও কালে ঝাড়ু পড়ত না, সেই ঝাড়ু হরদম চলতে লাগল। অনেক দোকানদার কটকটে লাল রঙ্ দিয়ে দোকানের সামনেটা রঙ্ করে ফেললে। দেখতে দেখতে বদলে গেল উত্তরকাশীর চেহারা। ভীষণ কাণ্ড, রাণীর রাণী মহারাণী মা আসছেন।

ওধারে কালীবাড়ির সেই পুরোহিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি ক্রমেই যেন একটু অস্থির হয়ে উঠলেন। স্পষ্ট দেখলাম, কি যেন হচ্ছে তাঁর চিত্তে। চেপে আছেন প্রাণপণে, কিন্তু কষ্ট হচ্ছে। ওঁর মুখের ওপর যে পরম নিশ্চিন্ততা বিরাজ করত, সেটা যেন অন্তর্ধান করেছে।

শেষ পর্যন্ত একদিন মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে বসলাম—"কি হল দাদা? শরীর ভাল আছে তো?"

দাদা কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে আমার মুখপানে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"তোমার সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, নিখুঁতভাবে তুমি কালীপুজোটা শিখেছ। তাই ভাবছিলাম—"

যা ভাবছিলেন তা আরও কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলেন। আমার সেই এক কায়দা, নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস গুণে যাচ্ছি। একশ পার হয়ে দু-শ পর্যন্ত প্রায় পৌঁছেছি যখন তখন দাদা তাঁর ভাবনাটা স্থগিত রেখে বললেন—"যদি মা রাজী হন তাহলে আমি মায়ের সঙ্গে

গঙ্গোত্রী যাব। এত বছর এখানে রয়েছি, যদি এতদিনে সময় হয়ে থাকে। যে কদিন আমি এখানে থাকব না তুমি এখানকার পূজাটা চালিয়ে নেবে—কেমন ?"

কেমন মানে!

ন্যাড়া ভাত খাবি, না বসব কোথায় ? অতবড় সাধু সিদ্ধ-সাধক ভোলানাথ যে মায়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই মায়ের সামনে বসে --আহা—এ হেন সৌভাগ্য কি সত্যিই হবে ?

হায় মা জগদম্বা !

ভুলেই গেলাম সাক্ষাৎ রক্ত-মাংসের ইষ্টদেবীর কথা। তিনি আসছেন, গাড়োয়ালের মহারাজা বিশেষ ব্যবস্থা করে পাঠাচ্ছেন মাকে। সেই নরেন্দ্রনগর থেকে দু-দিনের মধ্যেই এসে পেঁছে যাবেন উত্তরকাশী। দু-দিনের মধ্যে না এলেও চার দিন, আর বড় জোর চার দিন দেরি আছে। মা আসছেন। এবং সেই মা রাজী হলে পর ঐ পাথুরে মায়ের সেবা পূজা আমি করতে পাব। তবে রাজী তিনি হবেনই।

পুরোহিত দাদাটি নিজেকে নিজে ভরসা দিলেন—"হুকুম, আমি পাবই। আর কত দিনই বা বাঁচব ? এইবার মায়ের সঙ্গে না যেতে পারলে আমার ভাগ্যে গঙ্গোত্রী দর্শন আর হবে না।"

এমন ভাবে এমন সুরে ছেলেভুলানো গলায় বললেন কথাগুলি যে আমি মোটে ভরসাই পেলাম না।

দেরি আছে এখনও মায়ের উত্তরকাশী পৌছতে। ইতিমধ্যে আমি কিভাবে উত্তরকাশী গিয়েই প্রজ্ঞানাথের আশ্রয় পেলাম সে কাহিনীটা সেরে ফেলি। আমার সঙ্গে যে অস্থাবর সম্পত্তিগুলো উত্তরকাশী যাচ্ছিল, সেগুলোই প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞানাথজীর নামটি আমাকে শুনিয়ে দিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। অথবা আরও সহজ করে বলতে গেলে বলা যায়, লাঠি কমণ্ডলু কম্বল দুখানা চাদরের খুঁটে বাঁধা টাকাগুলো মায় চাদরখানা পর্যন্ত খুইয়ে একেবারে যাকে বলে—

ষোল আনা সন্ন্যাসী অর্থাৎ "নিস্ত্রৈগুণ্যো নির্বিকল্পো নির্লোভঃস্ত্যাক্তসঞ্চয়ী" —হয়ে চরম অবস্থায় পোঁছে জানতে পারলাম, উত্তরকাশীতে প্রজ্ঞানাথ আছেন। প্রজ্ঞানাথের আশ্রয় নিলেই সর্বদুঃখ দূর হয়ে যাবে। মাত্র কৌপিন আর পাঁচ হাত একখানা বস্ত্র সম্বল করে উত্তরকাশীতে গিয়ে প্রজ্ঞানাথজীকে খুঁজে বার করেছিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় পেয়েছিলাম। ঐ অবস্থায় দেখে প্রজ্ঞানাথজী একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেন নি। সর্বপ্রথম নিজের গায়ের কম্বলখানা আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা, ওঁর কুঠরিতে আর এক মহাত্মা বসেছিল। তাঁকে হুকুম করেছিলেন, দৌড়ে গিয়ে বাজার থেকে গরম দুধ আর কেশর আনবার জন্যে। কেশর হল জাফরান। সত্যিকারের জাফরান ঘোঁটা গরম দুধ গিললে খাঁটি ব্রাণ্ডি গেলার ফল হয়। মানে শরীরটা তখন তখনই গরম হয়ে ওঠে।

প্রজ্ঞানাথজী গঙ্গার কিনারায় বাস করতেন। হাত ছয়েক লম্বা হাত চারেক চওড়া একটি কাঠের কুঠরিতে থাকতেন। কুঠরিটার সামনে দিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তায় খানিকটা নিচের দিকে নামলে রাস্তার ওপাশে মা আনন্দময়ীর কালীবাড়ি। প্রজ্ঞানাথজী যে কুঠরিতে থাকতেন তার নিচে গর্ত। সেটিও একটি চমৎকার গুহা, দেওয়াল পাথরের মেঝে পাথরের ছাদ কাঠের, যেটা হচ্ছে প্রজ্ঞানাথজীর কুঠরির মেঝে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে বেরুতে হয়, এমন একটু দরজা ছিল সেই তলাকার গুহার। সেখানেই ব্যবস্থা হল আমার থাকবার। একজন লোক এক বোঝা শুখনো ঘাস দিয়ে গেল। কালীকম্বলীর ছত্র থেকে দুখানা কম্বল আনিয়ে দিলেন প্রজ্ঞানাথ। সেই দুধ আর জাফরান খাওয়ার দরুণ কি না বলতে পারব না, প্রথম রাতটা বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে কাটালাম। তখনও বেশ অন্ধকার, ঘুম ভাঙতেই নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। প্রজ্ঞানাথজীর ঘুম ভাঙবার আগেই স্নানটান করে তৈরী হয়ে নিতে চাই। হরি হরি! গঙ্গার দিকে মুখ করে সেই সাতসকালে কে দাঁড়িয়ে রয়েছেন?

স্বয়ং প্রজ্ঞানাথ। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"নমো নারায়ণ। চল ওপরে, অনেকক্ষণ জল চড়িয়ে দিয়েছি। একলা চা খেতে ইচ্ছে করল না। এই ভোরবেলাটা খুব চমৎকার সময়। মুখ ধুয়ে এস। আমি যাই এইবার জলে পাতি ছাড়িগে।"

মহাত্মা গোরখনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য প্রজ্ঞানাথ, সমস্ত সাধুসমাজে যাঁর চেয়ে বড় বিদ্বান আর একজনও ছিলেন না তখন, যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে কেউ সাহস করতেন না, সেই প্রজ্ঞানাথজীর আসল রূপটা আমি দেখেছি। শিশুর মত সরল সদাসন্তুষ্ট মানুষটি। এত রোগা এত দুর্বল যে দেখলে মন খারাপ হয়। মনে হয়, দীপ নিভল বুঝি। কিন্তু না, ও দীপ সহজে নিভবে না। জ্বলছে নিবাত নিষ্কম্প প্রাণ-প্রদীপ, সত্য-শিব-সুন্দরের আরতি হচ্ছে।

গঙ্গা থেকে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে ওপরে গেলাম। ফিকে চা খাওয়া হল। প্রজ্ঞানাথ বললেন—"খুবই অসুবিধে হবে তোমার। বিড়ি সিগারেট পাবে না। ছত্র থেকে পাবে শুধু রুটি আর ডাল। কি নিয়ে থাকবে?"

যেন নিজেকেই করলেন প্রশ্নটা, নিজেই জবাবটা খুঁজে বার করার জন্যে ভাবতে লাগলেন। আমিও ভাবতে লাগলাম। একটু পরে মুখ তুলে আবার বলতে লাগলেন—"তোমার টাকাকড়ি জিনিসপত্র যারা নিয়েছিল তারা ধরা পড়েছে। এখানেই তাদের আটকে রেখেছে পুলিস। যদি সেগুলো ফেরত চাও আমি ওদের খবর দিতে পারি। টাকাগুলোর ভাগবাটোয়ারা নিয়ে ওরা মারপিট করছিল। দুজন খুব জখম হয়েছে। পুলিস জানতে চায় অতগুলো টাকা ওরা পেল কোথা থেকে। ওরা বলে ভিক্ষে করে পেয়েছি। অত টাকা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই চুরি ডাকাতি করেছে ভেবে পুলিস তাদের ধরে রেখেছে। এক ছোকরা ভয়ানক কান্নাকাটি আরম্ভ করে গাঁজার জন্যে, গাঁজা না খেতে পেলে সে নাকি বাঁচবেই না। তখন তাকে কয়েকটা বিড়ি খাইয়ে আসল কথাটা পুলিস জেনে নেয়। মস্ত বড়

এক মোহান্ত মহারাজ একলা আসছিলেন উত্তরকাশীতে। তিনি নাকি তাঁর যথাসর্বস্ব ওদের দান করে দিয়েছেন। সেই ছোকরাই পুলিসকে বলেছে যে মোহান্ত মহারাজ প্রজ্ঞানাথ স্বামীর কাছে আসবেন। পুলিস আমার কাছে এসে দুবার খোঁজ নিয়ে গেছে কাল। মোহান্ত মহারাজের জন্যে আমি তৈরী হয়ে ছিলাম। তিনি এলেন একেবারে সন্ধ্যার সময়। এতটা দেরি হল কেন পথে? ওরা তো পরশু দিনই এখানে পৌঁছেছে। শুধু গায়ে ঐ অবস্থায় কোথায় পড়ে রইলে দু-দিন?"

এও সেই একই কায়দা, প্রজ্ঞানাথ নিজেকেই যেন জিজ্ঞাসা করলেন প্রশ্ন দুটো। একটু ভেবে নিয়ে নিজেই সঠিক উত্তরটা খুঁজে পেলেন—"খুব সম্ভব কিছু খাইয়ে তোমাকে ওরা বেহুঁশ করে ফেলে রেখে চলে এসেছিল। ওটাই ওরা করে সাধারণতঃ। যাক গে, শেষ পর্যন্ত যে উঠে হেঁটে চলে আসতে পেরেছ এইটুকুই বড় কথা। কিন্তু আমার কাছে আসছ তুমি, এ কথাটা ওরা জানল কেমন করে? আমার নাম তুমি শুনলে কোথায়?"

এইবার সোজা প্রশ্ন। উত্তর দিতে হল। বললাম—"ওরাই আপনার নাম করেছিল আমার কাছে। উত্তরকাশীতে কোন্ মহাত্মার কাছে গিয়ে আশ্রয় নোব, আমি জানতে চেয়েছিলাম। ওরা আপনার নাম করলে। এ কথাও বললে যে কেউ আপনার ধারে কাছে আসতে চায় না। তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে উত্তরকাশীতে আপনার কাছেই আশ্রয় নোব। যদি আশ্রয় না পাই উত্তরকাশী ছেড়ে চলে যাব।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রজ্ঞানাথ বললেন—"কিন্তু কষ্ট হবে তোমার। আমার কাছে যে টাকাপয়সা নেই। টাকাগুলো ফেরত পেলে বিড়ি সিগারেট কিনতে পারতে। পুলিসকে ডেকে পাঠাচ্ছি, টাকাকড়িগুলো তোমার বলে দাবি করলেই ফেরত পাবে।"

মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ না।

"কেন ?" প্রজ্ঞানাথ আমার মুখপানে তাকালেন।

"ও বেচারাদের কাজে লাগুক টাকাগুলো, আমার তো দরকার নেই।"

"কিন্তু ওরা তোমায় বিষ দিয়েছিল। হজম করে ফেলেছ তাই রক্ষে, মরেও যেতে পারতে। ওদের শাস্তি হওয়া উচিত।"

আবার মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ সেই না।

"কেন ? ভাবছ বুঝি থানা আদালত সাক্ষী নানা ঝঞ্ঝাট। ও সমস্ত কিছুই হবে না। আমি বলে দোব, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। পুলিসকে শুধু সব কথা বলবে।"

আবার মাথা নাড়লাম। একটু যেন বিরক্ত হয়ে উঠলেন প্রজ্ঞানাথ। একটু শক্তভাবে জানতে চাইলেন, কেন আমি অনবরত না না বলছি।

"অতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো উচিত হয় নি আমার।" খোলাখুলি জবাব দিতে লাগলাম। ওদের হাল আমি দেখেছি। দিনের পর দিন উপোস করছে, বস্তীতে ভিক্ষে করে যদি কিছু জোটে তাই খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। ওরা সাধু-মহাত্মা না হতে পারে কিন্তু চোর নয়। চোর হলে সমাজ সংসার ছেড়ে বনে-জঙ্গলে আসবে কেন। সমাজে রোজগার করে পেট চালাবার কোনও উপায় নেই। লক্ষ কোটি মানুষ বেকার, কেউ কারও মুখের দিকে তাকায় না। অতগুলো ক্ষুধার্ত জীবের সামনে আমি একরাশ টাকা নিয়ে বেড়াচ্ছি। অন্যায়টা আমার। আমি যদি আগেই ওদের দিয়ে দিতাম টাকাগুলো তাহলে এই হাঙ্গামায় ওদের পড়তে হত না।

গড়গড় করে বলে যেতে লাগলাম। মাথামুণ্ড কি বলছি তাও খেয়াল নেই তখন। অনাচার অবিচার অত্যাচার, সবার বড় জ্বালা বিদেশীদের দাসত্ব, যার নাম পরাধীনতা, সমস্ত জ্বালা উজাড় করতে লাগলাম। বুকটা খালি করে গুম মেরে বসে রইলাম।

প্রজ্ঞানাথও চুপ করে রইলেন। অতি অল্প আলো এসেছে

কুঠরির ভেতর, দিনের বেলাতেও প্রায় রাতের মত অন্ধকার। তুজনে চুপচাপ বসে আছি। কথা ফুরিয়ে গেছে।

বাইরে কাঠের বারান্দার ওপর অল্প একটু আওয়াজ হল। লম্বা গরম কোট পরা এক ভদ্রলোক মাথার টুপি খুলে নিচু হয়ে ঘরে ঢুকে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

প্রজ্ঞানাথ ইশারা করলেন বসবার জন্যে। বসবেন কোথায় তিনি, জায়গা নেই। কোনও রকমে এক কোণে উবু হয়ে বসে নিবেদন করলেন কিছু। কি নিবেদন করলেন শুনতেই পেলাম না।

"ওদের আর আটকে রেখো না পাণ্ডে, ছেড়ে দাওগে। টাকাকড়ি-গুলোও দিয়ে দাওগে। মহাত্মাজী সমস্ত ওদের দান করেছেন। ঐ বসে আছেন, জিজ্ঞাসা কর।" অকম্পিত কণ্ঠে হুকুম দিলেন প্রজ্ঞানাথ।

মহাসম্ভ্রমের সঙ্গে পাণ্ডে বললেন—"ভাগবখরা নিয়ে আবার যদি খুনোখুনি করে ওরা! টাকাও তো কম নয়। তু'শ টাকার ওপর রয়েছে এখনও। লোক সাতজন, প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ টাকা এক এক জনে পাবে। অতগুলো করে টাকা ওদের হাতে দেওয়া কি ঠিক হবে? নেশা করবে বেদম, তারপর খুনোখুনি।"

প্রজ্ঞানাথ চরম কথাটি শুনিয়ে দিলেন—"উপায় নেই, দিতে হবেই। তারপর নারায়ণ যা করেন।"

নারায়ণ যে শেষ পর্যন্ত কতদূর কি করতে পেরেছিলেন আমি জানতে পারি নি। কিছু করতে না পারলেও নারায়ণ ভদ্রলোককে আমি কোনও কিছুর জন্যে কখনও দায়ী করি না। কত আর করবেন তিনি, করতে করতে হয়রান হয়ে পড়েছেন। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসেছেন।

আমার বরাতটা কিন্তু খুলে গেল। পাণ্ডে ছিলেন তখন উত্তরকাশী পুলিসের বড় কর্তা, সর্বত্র রটিয়ে দিলেন তিনি যে মহাত্মা প্রজ্ঞানাথের কাছে একজন খাঁটি মহাত্মা জুটে গেছেন। এ কথাটাও বলতে ভুললেন

না যে, একমাত্র প্রজ্ঞানাথ ভিন্ন অন্য কারও সঙ্গে নবাগত মহাত্মাটি বাক্যালাপ করেন না।

তখন আর একটি ছত্র ছিল ওখানে, পাঞ্জাবী ছত্র। সেখান থেকে ভোরবেলা অপর্যাপ্ত ঘি দেওয়া গরম হালুয়া আর এক লোটা গরম চা আসতে লাগল। জানতে চাইলাম প্রজ্ঞানাথের কাছে—কি করব অত খাদ্যদ্রব্য নিয়ে। দুপুরে কালীকম্বলীর ছত্র থেকে ডাল রুটি নিয়ে আসছি। সেগুলোই সব শেষ করতে পারি না। আবার ভোরবেলা চা হালুয়া আসছে। কত খাব!

এইবার ধরা দিলেন মানুষ প্রজ্ঞানাথ। মহাত্মা প্রজ্ঞানাথের খোলস থেকে বেরিয়ে এল আসল মানুষটি। বললেন—"ফেরত দিও না। ঠাণ্ডায় হালুয়া পচবে না, জমা করে রেখে দেবে। পরে কাজে লাগবে।"

কি কাজে লাগবে? ভাবতে লাগলাম। কিভাবে রাখবই বা সেই হালুয়া? একটা পাত্র চাই। একটিমাত্র পাত্র জুটিয়ে দিয়েছেন প্রজ্ঞানাথ, প্রায় এক হাত লম্বা পেতলের বালতি একটি। সের খানেক জল ধরে তাতে। সেই বালতি আর এক হাত লম্বা চওড়া একখানি ঝাড়ন মাত্র সম্বল। ঝাড়নখানিকে ঝোলার মত করে কোণে কোণে গিঁট দিয়ে নিতে হয়। সেই ঝোলা আর বালতি হাতে নিয়ে কালী-কম্বলীর ছত্রে ভিক্ষা আনতে যেতে হয়। বালতিতে আসে ডাল ঝাড়নে আসে রুটি। নিয়ম হচ্ছে সাধুরা একবার মাত্র আহার গ্রহণ করবেন। গঙ্গার কিনারায় পাথরের ওপর বসে ডাল রুটি গিলে বালতি ধুয়ে জল ভরে কুঠরিতে নিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হতাম। হালুয়া দিয়ে বালতি বোঝাই করা যায় না। শরীর-ধর্ম পালন করতে বালতিটি মহাপ্রয়োজনীয় বস্তু। ঐটি ভরে জল নিয়েই ভোরবেলা জঙ্গলে যেতে হয়। এমন কি মুখ ধুতেও বালতি লাগে, গঙ্গায় কুল্লি করা নিষেধ। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম বালতি হালুয়া দিয়ে আটকালে আমার চলে কি করে!

তারপর আছে পিঁপড়ে। গুহার ভেতর এক টুকরো রুটি পড়লে

নিমেষের মধ্যে এক লক্ষ পিঁপড়ে অন্তরীক্ষ থেকে আবির্ভূত হয়ে ছেঁকে ধরে। পাপ হালুয়া নিয়ে মুশকিলেই পড়ে গেলাম। দিন তিনেকের হালুয়া জমে গেছে এধারে, ঝাড়নে বেঁধে রেখেছি। শুধু বালতি হাতে নিয়ে ছত্রে যাই, ডালের ভেতর রুটি চুবিয়ে নিয়ে আসি। হালুয়া বাঁধা ঝাড়নটাকে গঙ্গার ভেতর একটা পাথরের ওপর রেখে দিয়েছি কয়েকখানা পাথর চাপা দিয়ে। যে পাথরটার ওপর রেখেছি সেটার চতুর্দিক দিয়ে জল বয় বলে পিঁপড়েদের গ্রাস থেকে বেঁচেছে। এধারে রাত পোহালেই হালুয়া আসছে। ঝাড়ন বোঝাই হয়ে গেলে করব কি ?

কিছুই করতে হল না, যা করবার প্রজ্ঞানাথ করে ফেললেন। ছত্র থেকে ডাল রুটি নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম এক আদ্যিকালের বদ্যি-বুড়ী দরজার সামনে বসে আছে। আমার সাড়া পেয়ে প্রজ্ঞানাথ ডাক দিলেন। ওপরে যেতে বললেন—"হালুয়াটা বুড়ীকে দিয়ে দাওগে। দু-তিন দিন বাদে বাদে ও আসবে। লুকিয়ে আসবে, হালুয়া নিয়ে লুকিয়ে চলে যাবে। কেউ জানতে পারবে না হালুয়া কোথায় যাচ্ছে। জানাজানি হলেই কেলেঙ্কারি। একটু সাবধানে দিও।"

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"সে কি! লুকিয়ে দিতে হবে কেন? হালুয়াটা যখন আমাকে দিয়েছে, তখন আমি যা খুশি করতে পারি।"

ম্লান হাসি হেসে প্রজ্ঞানাথ বললেন—"পার না। খাচ্ছ না হালুয়া, অন্য কাউকে খাওয়াচ্ছ জানতে পারলে ওরা আর দেবে না। ছত্রে যাঁরা টাকা দান করেন তাঁদের উদ্দেশ্য হল তোমার আমার মত সাধুকে খাইয়ে পুণ্য অর্জন করা। ঐ বুড়ীটাকে খাওয়ালে যদি পুণ্য হত, তাহলে ছত্র খুলে সাধু পোষবার দরকারই হত না। ঐ বুড়ীটার পানে ভালো করে তাকিয়ে দেখ। চোখে দেখতে পায় না, হাঁটতে পারে না, এই শীতে হিমালয়ের ভেতর ঐভাবে বেঁচে আছে। ওকে দেখবার কেউ নেই। কে দেখবে? যতদিন না মরছে ঐভাবে বেঁচে

থাকতে হবে। কোটি কোটি টাকা দান করা হয় এই দেবভূমিতে, সাধু-সন্ন্যাসীরা মোহান্ত মহারাজরা আর পাণ্ডারা পায়। এই তো সবে এলে, থাক না কিছুদিন, সবই বুঝবে। যাও, তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দাও বুড়ীটাকে। যে কদিন ওর কপালে আছে চলুক।"

"কপাল ভাঙবে কেন ওর? যতদিন আমি থাকব এখানে—"

প্রজ্ঞানাথ বাধা দিয়ে বললেন—"তোমার চেয়ে ভাল সাধু আর একজন এসে পড়লে ঐ হালুয়া তাঁর কাছেই যাবে। কপাল ভাঙবে তোমার, বুড়ীর নয়। এই রীতি এখানে। আমি যখন নতুন আসি তখন কয়েকদিন আমারও কপাল ভাল ছিল।"

যা শোনবার শুনে নিয়ে নিচে গিয়ে বুড়ীকে হালুয়াটা দিয়ে দিলাম।

প্রাণ অপান ব্যান সমান উদান— প্রজ্ঞানাথ দিনে একবার ঠিক সন্ধ্যার আগে এক ঘণ্টা ধরে আমাকে প্রাণের ক্রিয়া বোঝাতে লাগলেন। ব্যায়াম করতে হবে, প্রাণের ব্যায়াম। প্রাণবায়ুর সংযম হচ্ছে প্রাণায়াম। চিত্তকে নিশ্চল করবার কায়দা হচ্ছে প্রাণায়াম।

চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।
যোগীস্থাণুত্ব মাপ্নোতি ততো বায়ু নিরোধয়েৎ॥

বায়ু যদি চঞ্চল হয় চিত্তও চঞ্চল হবে। বায়ু নিশ্চল হলে চিত্ত স্থির হবে। বায়ু নিরোধ কর, যোগীর মত স্থাণু হও।

প্রজ্ঞানাথজী সর্বপ্রথম জানতে চাইলেন আমি বেঁচে আছি কি না। প্রশ্ন শুনে থ হয়ে রইলাম। দিব্যি জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছি, ও আবার কি প্রশ্ন? আমার মুখের অবস্থা দেখে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন—

"প্রমাণ কি? বেঁচে যে আছ তার প্রমাণ দাও।"

"এই তো দিব্যি শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে—মানে—"

"শ্বাস-প্রশ্বাস চললেই বেঁচে থাকা হয়? শ্বাস-প্রশ্বাসটাই তাহলে বেঁচে থাকার অব্যর্থ প্রমাণ বলতে চাচ্ছ? ও কাজটি না করেও বহু

জীব বেঁচে থাকতে পারে। যাক সে কথা, এটা কিন্তু মানছ যে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলাটাই আসল কথা। তাহলে এই যে এতগুলো বছর বেঁচে রয়েছ, বেঁচে থেকে সমানে শ্বাস টানছ প্রশ্বাস ফেলছ, ঐ কর্মটি কতক্ষণ রোজ সজ্ঞানে কর? অর্থাৎ সজ্ঞানে কতক্ষণ বেঁচে থাক?"

মোটেই না। সত্যিই আমি দিনে রাতে একবারের জন্যেও মনে করতে পারি না যে আমি বেঁচে আছি। ফুরসৎ কোথায়? যে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হলে এই দুনিয়ায় আমার অস্তিত্বই থাকবে না, সেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিজে থেকেই চলছে। যদি কোনও কারণে দম বন্ধ হয়ে আসে তখনই টের পাই যে—

প্রজ্ঞানাথজী সোজা আসল কথায় পৌঁছে গেলেন। যা তিনি বললেন, যেভাবে বললেন, তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হল না। চেষ্টা করছি তাঁর বক্তব্যটুকু সহজ ভাষায় বলতে।

জীবনী-শক্তিকে সংযত করাই হল প্রাণায়াম। যখন শ্বাস টানছি তখন তার মাপ হচ্ছে দশ আঙ্গুল, যখন ফেলছি তখন দাঁড়াচ্ছে বারো আঙ্গুল। অর্থাৎ প্রতিবার শ্বাস ফেলবার জন্যে দু আঙ্গুল পরিমাণ বেশী আমাদের প্রাণবায়ু ক্ষয় হচ্ছে। প্রাণবায়ুর ঐ ক্ষয়টা রোধ করার জন্যে শ্বাস টানাটা বড় করে শ্বাস ফেলাটাকে ছোট করবার চেষ্টা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত শ্বাস ফেলাটা একদম বন্ধ করতেও পারা যায়। এরই নাম হল কুম্ভক।

> যথা সিংহোগজো ব্যাঘ্রো ভবেদ্বশ্যঃ শনৈঃ শনৈঃ।
> তথৈব সেবিতো বায়ুরন্যথা হন্তি সাধকম্॥
> প্রাণায়ামাদিযুক্তেন সর্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ।
> অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্বরোগ সমুদ্ভবঃ॥

সিংহ গজ ব্যাঘ্রকে যেমন একটু একটু করে বশীভূত করতে হয়, সেই ভাবে বায়ুকেও অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকেও বশীভূত করা যায়। বায়ুকে বশীভূত করতে পারলে সর্বরোগ নাশ নয়, ঠিকভাবে ঐ কর্মটি অভ্যাস না করলে নানারকম রোগ জন্মাতে পারে।

প্রথমে চেষ্টা করতে হবে খুব আস্তে আস্তে শ্বাস টানা ফেলা। সহজ উপায় হল একটি নরম পালখ বা একটু তুলো নাকের সামনে ধরে দেখা কতটুকু নড়ছে। সদা সর্বক্ষণই আমরা কম বেশী হাঁপাচ্ছি। ঐটে কমিয়ে আনা চাই। স্থির হয়ে বসে শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নজর রাখলেই দেখা যায় যে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই আস্তে আস্তে চলছে। জোরে হাঁটলে ছুটলে রেগে উঠলে তর্কাতর্কি করলে আমরা হাঁই হাঁই করে হাঁপাতে থাকি। তারপর খানিক জিরিয়ে নি। ঐ জিরনো, স্থির হয়ে বসে একটু ঠাণ্ডা হওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসটাকে স্বাভাবিক করে আনা, তারও পরে শ্বাস-প্রশ্বাসকে স্বাভাবিকের নিচে নামানো, তা বলে দম আটকে বসে থাকা নয়, চলবে শ্বাস প্রশ্বাস, কিন্তু এত আস্তে আস্তে চলবে যে নাকের সামনে তুলো ধরে থাকলেও তুলোটা কাঁপবে না, এই পর্যন্ত পোঁছতে হবে সর্বাগ্রে। তারপর আসছে পূরক কুম্ভক রেচকের কথা। যতক্ষণ না শ্বাস-প্রশ্বাস আস্তে আস্তে পড়ছে ততক্ষণ প্রাণায়ামের প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

এইটে মনে রাখতেই হবে যে প্রাণায়াম করার সময় পাশে যে বসে থাকবে সেও যেন বুঝতে না পারে যে শ্বাস টানা হচ্ছে বা ফেলা হচ্ছে। খুবই আস্তে আস্তে, পালখটিও কাঁপবে না, এইভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোটা অভ্যাস হওয়া চাই। অভ্যাসের দ্বারা বাঘ-সিংহীকেও তো বশীভূত করা যায়।

তারপরের ব্যাপার পূরক কুম্ভক রেচক, সোজা বাংলায় শ্বাস টানা শ্বাস বন্ধ করে রাখা শ্বাস ফেলা। ডান নাক ডান হাতের বুড়ো আঙুলের চাপে বন্ধ করে খুব আস্তে আস্তে বাঁ নাক দিয়ে শ্বাস টানতে হয়। এক দুই তিন চার মনে মনে চার গোণা পর্যন্ত টানা হল, সঙ্গে সঙ্গে চারগুণ সময় ষোল গোণা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হল আর দুটো আঙুল দিয়ে বাঁ নাক চেপে; অর্থাৎ বন্ধ রাখার সময় ডান নাক বাঁ নাক দু নাকই চেপে রাখা হয়েছে। ষোল গোণা শেষ হলেই ডান নাকটার ওপর থেকে বুড়ো আঙুল তুলে নিয়ে, বাঁ নাক তো চেপে ধরাই

রয়েছে, ডান নাক দিয়ে আট পর্যন্ত গুণতে গুণতে শ্বাস ফেলতে হবে। ফেলাটি শেষ হলেই ঐ ডান নাকেই আবার চার পর্যন্ত গুণতে গুণতে টানতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ডান নাকের ওপর বুড়ো আঙ্গুল চেপে ষোল গোণা পর্যন্ত শ্বাস বন্ধ করে রাখা। তারপর বাঁ নাকের ওপর থেকে আঙ্গুল তুলে বাঁ নাক দিয়ে আট গোণা পর্যন্ত শ্বাস ফেলা। ফেলাটা শেষ হলেই ঐ বাঁ নাকেই চার গুণতে গুণতে টানা, বাঁ নাক চেপে ধরে ষোল গোণা পর্যন্ত বন্ধ রাখা, ডান নাকের ওপর থেকে আঙ্গুল তুলে আট গুণতে গুণতে ফেলা। চার ষোল আট, চার ষোল আট, চার ষোল আট—মোট তিনবার হল। ঐ তিনবারে একটি প্রাণায়াম হয়। এই একটি প্রাণায়াম শেষ হবার পর দু নাক ছেড়ে দিলেও যদি নাকের সামনে পালখ ধরলে পালখটি না নড়ে তবেই বুঝতে হবে যে কোনও গোলমাল হচ্ছে না। এইটুকুই আসল কথা।

এখন আসছে এটাকেই বাড়াবার পন্থা। চার ষোল আট, চার ষোল আট, চার ষোল আট তিনবার হল। ডান নাক দিয়ে শ্বাস ফেলা শেষ করে হাত সরালাম না। বাঁ নাক তখন চাপাই আছে, ডান নাক দিয়ে আবার চার গোণা পর্যন্ত টানলাম, ডান নাক বন্ধ করে ষোল গোণা পর্যন্ত কুম্ভক করলাম, বাঁ নাক দিয়ে আট গোণা পর্যন্ত ফেললাম। ফেলেই ঐ বাঁ নাক দিয়েই চার গোণা পর্যন্ত টানলাম, দু নাক বন্ধ করে ষোল গোণা পর্যন্ত কুম্ভক করে রইলাম, ডান নাক ছেড়ে আট গোণা পর্যন্ত ফেললাম, ফেলেই ডান নাক দিয়ে চার গোণা পর্যন্ত টানলাম, ষোল গোণা পর্যন্ত দু নাক বন্ধ করে রইলাম, বাঁ নাক ছেড়ে আট গোণা পর্যন্ত ফেললাম। দুটো প্রাণায়াম হল। তারপরেও হাত সরালাম না, ঐ বাঁ নাকেই আবার চার গোণা পর্যন্ত টেনে, দু নাক বন্ধ করে ষোল গুণে, ডান নাক ছেড়ে আট গোণা পর্যন্ত ফেলে, ডান নাকে চার গুণতে গুণতে টেনে, ষোল গোণা পর্যন্ত বন্ধ করে, বাঁ নাকে আট গোণা পর্যন্ত ছেড়ে, ফের ঐ বাঁ নাকে টেনে, চারগুণ সময় বন্ধ করে, টানটা দুগুণ সময় ধরে ডান নাক দিয়ে ছাড়লে তিনটি প্রাণায়াম হল।

তিনবার চার ষোল আট করবার পর আবার তিনবার চার ষোল আট, ফের তিনবার চার ষোল আট, একই সঙ্গে তিনটি প্রাণায়াম করার নাম একটি পূর্ণ প্রাণায়াম করা। সাধারণতঃ মানুষে পূজায় বসে ঐ একবারই চার ষোল আট করেন। ওতে পূজা অনুষ্ঠানের কোনও হানি হয় না বটে। কিন্তু যিনি বায়ুসংযম করতে চান তাঁকে ঐ নবার করতে হবে। এবং এইটুকুই তাঁর আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত যে ঐ নবার রেচক কুম্ভক পূরকেও তাঁর নাকের সামনের পালখ নড়ছে না। অর্থাৎ তিনি হাঁপাচ্ছেন না।

অত্যন্ত সাবধান হয়ে, আমার পক্ষে যতটা সাধ্য সহজ করে, ব্যাপারটা আমি নিখুঁতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছি। হয়ত অনেকে বিরক্ত হবেন। কিন্তু সাবধান আমাকে হতেই হবে। কারণ এমনও হতে পারে যে আমার এই লেখা পড়ে কেউ প্রাণায়াম অভ্যাস করতে চেষ্টা করবেন। যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তাঁর তাই আমার এত সাবধানতা।

প্রজ্ঞানাথও আমাকে বার বার সাবধান করে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য ওঁর পাশে বসেই আমাকে অভ্যাস করতে হয়। তারপর তো মা আনন্দময়ীই স্বয়ং --

যাক পরের কথা পরে আসছে। প্রাণায়ামের ব্যাপারটা এইবেলা শেষ করে ফেলি।

কথা হচ্ছে, নাক টিপে টিপে চার ষোল আট প্রাণায়াম করাটাই তো মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ওটা হল ব্যায়াম অভ্যাস। ওটা হচ্ছে ওস্তাদ হবার আগে রাগ-রাগিণীর রেওয়াজ করার মত একটা কাজ। সময়ের মাত্রাটা ঠিক হয়ে গেলে তাল সোম লয় মাফিক গান গাইতে হবে তো। গান গাওয়াটাই উদ্দেশ্য, জীবনভোর রেওয়াজ করাটা নিশ্চয়ই বড় কথা নয়। তেমনি চার ষোল আট থেকে ষোল চৌষট্টি বত্রিশ পর্যন্ত যখন খুবই সহজ হয়ে গেল, তখন আর নাক টেপবার বা গোণবার দরকার হয় না। নাক না টিপে চার ষোল আট না গুণেই

সময়ের মাত্রা নিখুঁত রেখে তিন-তিরিক্ষে নবার প্রাণায়াম .যখন হচ্ছে, তখনই বোঝা যাবে যে মন এবং বুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তকে একটু একটু বাগ মানানো যাচ্ছে। এ কথাটার মানে হল, মন বুদ্ধিকে যে কোনও কর্মে বা চিন্তায় বেশ কিছুক্ষণ ষোল আনা লাগিয়ে রাখা যাচ্ছে। "চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।" ঐ নিশ্চলং পর্যন্ত হওয়া চাই। ভাল মন্দ সৎ অসৎ সর্ববিধ চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্তি পাওয়া চাই। উদ্দেশ্যটি হল নিরোধ, চিত্তবৃত্তির নিরোধ। সেই নিরোধ পর্যন্ত পৌঁছনো যায় কি করে সেইটুকু বলেই ক্ষান্ত দিচ্ছি। আর অতি অল্প কথাই বলার আছে।

ঐ যে তিন-তিরিক্ষে নবারে একটি প্রাণায়াম হচ্ছে, ঐ প্রাণায়ামকে সামনে দ্বাদশ বার চালাতে পারলে একটি প্রত্যাহার হয়। তাহলে একটিবার যিনি প্রত্যাহার করতে চান তাঁকে ন-বারং একশ আট বার প্রাণায়াম করেও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে হবে। ঐরকম বারোটি প্রত্যাহার যিনি অচ্ছেদ্য চালাতে পারবেন তিনি একটি ধারণা করতে পারলেন। অর্থাৎ ধারণা পর্যন্ত পৌঁছাতে গেলে এক হাজার দু-শ ছিয়ানব্বই বার সমানে চার ষোল আট বা আট চৌষট্টি বত্রিশ চালাতে হবে। ধারণার বারো গুণ চালাতে পারলে হবে একটি ধ্যান। তার মানে ধ্যান পর্যন্ত পৌঁছতে চান যদি তাহলে আপনাকে পনেরো হাজার পাঁচশ পঞ্চান্ন বার পূরক কুম্ভক রেচক সমানে চালাতে হবে। এই ক্ষমতা যখন হবে আপনার তখন আপনার ইষ্টদেবতা বা দেবী সাক্ষাৎ দর্শন দেবেন। শেষ কথাটি হচ্ছে সমাধি। বারোটি ধ্যান যিনি সমানে চালাতে পারেন, ঐ পনেরো হাজার পাঁচশ বাহান্নকে বারো দিয়ে গুণ দিয়ে দেখুন কত হয়, সেই পরিমাণ পূরক কুম্ভক রেচক পর্যন্ত পৌঁছনোর নামই সমাধি। সমাধি পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে তবেই শান্তি!

কিন্তু কে পৌঁছবে সমাধি পর্যন্ত? কোনও রকমে দুখানা গান শিখে এ-পাড়ার ও-পাড়ার প্যাণ্ডেলে বসে গান গাইতে পারলেই হয়! কে বাবা দশ বছর ধরে রেওয়াজ করতে যাচ্ছে!

ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন মিনিটে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। স্বাভাবিক অবস্থায় আঠার উনিশ বা কুড়ি বার। ঘণ্টায় এক হাজার, এগারশ, বা বারোশ বার। এখন একটু চিন্তা করুন বা গুণ ভাগ করে দেখে নিন একটিবার প্রত্যাহার করতে কতটা সময় লাগছে। তাহলেই আন্দাজ করতে পারবেন ব্যাপারটা।

আসল ব্যাপার হল প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যান পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে সম্পূর্ণ কুম্ভক হয়ে যায়। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়।

যদি কেউ পরীক্ষা করতে চান তাহলে তাঁকে এইটুকুই বলতে চাই যে আমি নিজে ঐ ব্যায়ামটি বেশ কিছুদিন করে দেখেছি। নির্ভয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের এই ব্যায়াম চালাতে পারেন। দেখবেন, ঠিক এই শক্তি-গুলো পর পর জন্মাবে। কিন্তু কলকারখানার ধারে কাছে নয়, যেখানে হাওয়ায় ধোঁয়া ময়লা কম সেখানে গিয়ে এই ব্যায়াম করবেন।

আগেই বলেছি, আমরা যখন শ্বাস টানি তখন তার মাপ দশ আঙ্গুল, মাপ মানে ইংরেজীতে যাকে বলে ভেলোসিটি, বাংলায় হবে প্রচলন বেগ, ঐ বেগের পরিমাণ শ্বাস টানবার সময় দশ আঙ্গুল ফেলবার সময় বারো আঙ্গুল, প্রতিবার দু আঙ্গুল করে ক্ষয় হচ্ছে। প্রাণবায়ু নিয়ে ব্যায়াম করতে করতে ঐ ভেলোসিটি কমতে থাকে। বারো থেকে কমে এগারতে নামলে জিতেন্দ্রিয়তা নিজে থেকে জন্মাবে। এগার থেকে নেমে দশে পৌঁছলে আনন্দে স্থিতিলাভ, অর্থাৎ সহজে কেউ খেপে উঠবে না। দশ থেকে নেমে নয়ে যখন দাঁড়াবে তখন জন্মাবে কবিত্বশক্তি। পরীক্ষা করেও দেখতে পারেন, শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রশ্বাস নয়ের ওপরে পৌঁছয় না। অর্থাৎ উনি সহজে উত্তেজিত হন না। আমাদের চেয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র মশাই বহুগুণ বেশী নিশ্চিন্ত মানুষ, কারণ উনি জাতকবি। ওঁর চিত্ত অর্থাৎ মন বুদ্ধি অন্য স্তরে আটকে থাকে। প্রাণায়াম করে ঐ অবস্থা হয় নি ওঁর, ঐটেই ওঁর ধাতস্থ। কবিদের ধাতুই ঐরকম।

তারপর শুনুন নয় থেকে কমে আটে পৌঁছলে কি হয়। যখন

আপনার প্রশ্বাসের ভেলোসিটি আটে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে তখন ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা জানবার ক্ষমতা হবে। তারপর সাত পর্যন্ত নামলে জন্মাবে সূক্ষ্মদৃষ্টি। আরও নেমে যদি ছয়ে দাঁড় করাতে পারেন তাহলে আপনার দেহটা মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠবে। আরও কমিয়ে পাঁচ আঙ্গুলে দাঁড় করান, পাবেন একটি সাংঘাতিক ক্ষমতা—দূরদৃষ্টি। পাঁচ আঙ্গুল থেকে কমিয়ে চার পর্যন্ত পৌঁছলে কি ক্ষমতা লাভ করবেন সেটা বলে আর লাভ নেই। কারণ ঐ পাঁচ পৌঁছতে পারলেই আপনি ভয়ঙ্কর নামজাদা মহাপুরুষ হয়ে যাবেন। হরদম বড় মানুষরা আপনাকে ঘিরে থাকবে। গরদের গেরুয়া পরে ফার্স্ট ক্লাস গাড়ি রিজার্ভ করে বম্বে দিল্লি কলকাতা চষে বেড়াবেন। ভক্তদের কৃপা করতে করতেই আপনার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। পাঁচ থেকে চারে নামবার জন্যে যে তকলিফ করতে হবে সেটা করবার আর ফুরসতই পাবেন না।

অতএব এখানেই ইতি।

তখন শুরু হয়ে গেছে প্রাণবায়ু নিয়ে ব্যায়াম—প্রাণায়াম। গুহার ভেতর বসে প্রাণায়াম করা যায় না। আকাশের তলায় খোলা বাতাসে ঐ ব্যায়ামটি প্রথম প্রথম অভ্যাস করতে হয়। তাই করছি, প্রজ্ঞানাথ নজর রাখছেন। কাশীতে মা কালীর নিত্যসেবা করার সময় চার ষোল আটটা রপ্ত করতে হয়েছিল। পূজা এবং জপের সময় প্রতিদিনই নাক টিপে ত্রুবার চার ষোল আট করতে হয়েছে। সেটা তো ব্যায়াম করার ব্যাপার ছিল না, ছিল পূজার অঙ্গ। হাঁসফাঁস করে হাঁপাতে হাঁপাতে করেছি। উত্তরকাশীতে বসে যা করতে শুরু করলাম তার নাম ব্যায়াম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গঙ্গার ধারে পাথরের ওপর বসে আগে শ্বাস-প্রশ্বাসকে ঠাণ্ডা করে আনা তারপর নাক টেপা। নাক টেপবার আগে আরও একটু মজার ব্যাপার আছে। দেখতে হবে শ্বাস-প্রশ্বাস বাঁ নাকে বইছে কি না। প্রাণায়ামের সময় বাঁ নাকে শ্বাস-

প্রশ্বাস যদি না বয় তাহলে কিছুতেই একটানা তিন-তিরিক্ষে নবার চার ষোল আট করা যাবে না। নানান ভজকট, পেট যদি পরিষ্কার না থাকে তাহলে বাঁ নাকে শ্বাস বইবে না। এইজন্যেই হটযোগীরা অন্তর্ধৌতি করেন। কালীকম্বলীর ডাল রুটির কল্যাণে ওটা এমনিই হয়ে যেত। ভোর হবার আগে জলপাত্র হাতে করে জঙ্গলে গেলেই কর্ম শেষ, পেটে আর কিছুই থাকত না। তাই শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামটা সকালের দিকেই চালানো সুবিধে। ভরা পেটে এই ব্যায়াম করা চলে না।

চলছে ব্যায়াম, চার ষোল আট থেকে ষোল চৌষট্টি বত্রিশে উঠে পড়েছি। রাত্রে গুহায় শুয়েও ছুটি নেই, বাঁ নাকে শ্বাস চলছে কি না নজর রাখতে হচ্ছে। ডান দিক চেপে শুয়ে থাকলেই বাঁ নাকে শ্বাস চলে। মুশকিল হল কিছুতেই ঘুম আসে না। প্রায় প্রতিটি রাত জেগে কাটাতে লাগলাম। নিদারুণ অস্বস্তি, ছুটি নেই। সদা সর্বক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের চাকরি করছি। কি আপদ, কি উপায়ে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ ছুটি পাওয়া যায়!

জানালাম প্রজ্ঞানাথকে, ঘুম একেবারে হচ্ছে না, পাগল হয়ে যাব নাকি?

"ঘুম!" প্রজ্ঞানাথ এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে যে ভয়ানক আজগুবী একটা কিছু বলছি যেন। ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম—"আজ্ঞে একেবারে ঘুমোতে পারছি না, সারারাত ঐ শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নজর রাখছি।"

"যদি ঘুমিয়ে পড় তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নজর রাখবে কে?" জিজ্ঞাসা করলেন প্রজ্ঞানাথজী।

"তাহলে কি একদম ঘুমোতেই পারব না?" দস্তুরমত ভয় পেয়ে গেলাম। ভয়টা বোধ হয় আমার চোখে মুখে ফুটে উঠল। প্রজ্ঞানাথজী চটে গেলেন যেন। বেশ শক্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি জেগে আছ?"

চুপ করে রইলাম। ঐসব উল্টো-পাল্টা প্রশ্নের কি জবাব দেব ?

উনিও বহুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর ওঁর নিজস্ব ঢঙে একেবারে নির্লিপ্তভাবে বলতে লাগলেন— "তোমার পথ আলাদা। হয় তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে নয়ত ছুটে বেড়াবে। কে ঘুম পাড়াবে তোমাকে ? সে শক্তি কার আছে ? চিৎশক্তি আর জড়রূপা শক্তি। আগুনের যেমন দু-জাতের শক্তি আছে—দাহিকাশক্তি তার প্রকাশিকাশক্তি। চিৎশক্তি হচ্ছে প্রকাশিকা শক্তি, জড়রূপাশক্তি দাহিকাশক্তি।

শক্তিতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি শৃণুস্ব তৎ সমাহিতঃ।
ব্রহ্মণশ্চিজ্জড়য়ো র্ভেদাৎ দ্বে শক্তি পরিকীর্তিতে॥
চিচ্ছক্তিঃ স্বরূপা জ্ঞেয়া মায়া জড়া বিকরিণী।
কার্য্যপ্রসাধিনী মায়া নির্ব্বিকারা চিতিঃ পরা॥

ঐ কার্যপ্রসাধিনী মায়া ঐ শক্তির যে সাধনা করে তাকে আমি নির্বিকারা চিৎশক্তির সাধনা করতে বলছি! তুমি তো না ঘুমিয়ে থাকতে পারবে না। ব্রহ্মশক্তি মায়াকে যে জানবে চিনবে বুঝবে সে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেখবেই আগুনটা সত্যিকারের আগুন কি না। আলো দিচ্ছে বলেই আগুন আছে, এই তত্ত্বে সে বিশ্বাস করবে কেন? আগে পুড়িয়ে ছাই করুক তবে না আগুন আছে বলে মানব। সে আগুন আমি পাব কোথায় ?"

কিছুই মাথায় ঢুকল না। জানতে চাইলুম ঘুমাব কেমন করে, আবোল-তাবোল বকতে লাগলেন। সাধে কি আর মানুষ প্রজ্ঞানাথের ধারে কাছে ঘেঁষে না।

আমি কিন্তু সহজে ছাড়ছি না। এতদিনে নির্ভয় হয়েছি। যতদিন ওঁর আশ্রয়ে আছি উনিই রক্ষা করবেন। কিছুতেই পাগল হতে দেবেন না।

হঠাৎ প্রজ্ঞানাথজী এক আজগুবী প্রশ্ন করে বসলেন—"মা আসছেন এখানে শুনেছ বোধ হয় ?"

মা? কে মা?

বৃদ্ধের শীর্ণ মুখখানি ঝলমল করে উঠল। বললেন—তোমার ইষ্টদেবী, যাঁকে তুষ্ট করার জন্যে রাশি রাশি সংস্কৃত মন্ত্র মুখস্থ করে ফেলেছ, তিনি স্বয়ং আসছেন। হ্যাঁ, ঘুম পাড়িয়ে ফেলবেন তোমাকে। তোমার মত দামাল ছেলেকে স্বয়ং মা ছাড়া কে ঘুম পাড়াবে? আমি! হুঁ! পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে বসে "ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ম্" জপ করছি। আমার কাছে পরম পুরুষার্থ হল—"অথত্রিবিধদুঃখাদের-ত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ॥" ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়াটাই পরম পুরুষার্থ আমার কাছে। স্রেফ ফাঁকিবাজি। তোমার মা আসছেন, তোমার মায়ের সংসারে ত্রিবিধ দুঃখ আছে। তুমি হলে মায়ের ব্যাটা, মাযের সংসারে যা আছে তাই নিয়ে তুমি ভুলে থাকবে। তোমার পথ আমার মত ফাঁকিবাজির পথ নয়। মা আসছেন, আর ভাবনা কি তোমার। এইবার নিশ্চয়ই ঘুমোবে।"

মা এলেন।

উত্তরকাশীর মানুষ সর্বকর্ম ফেলে ছুটে গেল মাকে দর্শন করতে। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী অনেকটা পথ আগিয়ে গেলেন মাকে নিয়ে আসার জন্যে। ব্যাপার দেখে ভয়ানক মনমরা হয়ে পড়লাম। ওরে বাপ্ রে! ঐ তুমুল মচ্ছবের মধ্যে মায়ের কি নজর পড়বে আমার মত হাড়হতচ্ছাড়া সন্তানের দিকে? আর আমিই বা কেন হ্যাংলার মত গুঁতোগুঁতি করতে যাব মায়ের কাছে যাবার জন্যে! সত্যিই যদি আমার মা হন—

প্রাণায়াম-ফানায়াম আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গুম হয়ে বসে রইলাম গুহার ভেতর। হাত পাঁচেক ওপরে প্রজ্ঞানাথও দরজা বন্ধ করে রইলেন। বাক্যালাপ বন্ধ কয়েক দিন, দরজা-বন্ধ ঘরের ভেতর কি যে করেন দিনরাত জানবার উপায় নেই। দরকারও নেই আমার জানবার। বেশ আছি লুকিয়ে, ওঁর মত লুকিয়ে থেকে যদি জীবনটা

কাটানো যায় তো মন্দ কি! এইটুকুই তো কামনা করেছিলাম। উত্তরকাশীতে গিয়ে এমন এক মহাত্মার চরণতলে আশ্রয় পেতে চাই যাতে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে যায়। তাই তো গেছে। এর বেশী আর চাই কি।

না, কিছুই চাই না। শুধু ছুটি চাই আর ঘুমাতে চাই। দুইই জুটেছে কপালে। কে বাবা মাকে দর্শন করার জন্যে হুজ্জত করতে যাবে।

একটা সামান্য আশা যেন রয়েই গেল—সত্যিই যদি আমার মা হন—তাহলে—

মা এলেন। বিরাট গোলমাল, বিরাট ভিড়। কালীবাড়ি বেশী দূরে নয়, বহু লোক যে জমা হয়েছে কালীবাড়িতে—গুহার ভেতর বসেই টের পেলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেল। উত্তরকাশীতে সন্ধ্যা মানেই অর্ধেক রাত। সে রাতটা কিন্তু অন্য জগতের রাত। রাতেও উত্তরকাশী নিস্তব্ধ হল না।

ভোর হল। গুহা থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে ফিরে আসতে হবে। ঠিক করে ফেলেছি যে ভিক্ষা নেবার জন্যে ছত্রেও যাওয়া চলবে না। যে কদিন মা আনন্দময়ী থাকবেন সে কদিন লুকিয়ে থাকতে হবে। দেখাই যাক না কি হয়। আমার মা যদি হন—

আবার সেই আশা। আমার মা যদি হন তাহলে দেখা পাবই। মা নিশ্চয়ই আমাকে দেখা না দিয়ে যাবেন না। জঙ্গল থেকে এসে গঙ্গায় নামলাম। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে সেই ডাল আনবার বালতি করে মাথায় জল ঢেলে স্নান করতে হয়। অন্ধকার থাকতেই কর্মটি সেরে ফেলি। রোদ উঠলেই হাওয়া চলতে শুরু করে। তখন কার সাধ্য কম্বল ছেড়ে গঙ্গায় নামে।

স্নান হল, এইবার ছুটে গিয়ে গুহায় ঢুকতে হবে। জল ছেড়ে উঠলাম, কৌপিনটা শুধু অঙ্গে রয়েছে। পাথরের চাঙড়গুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দম আটকে তেড়ে আসছি, কোনও রকমে কুঠরির ভেতর

পৌঁছতে পারলে হয়। আর একটু হলেই লেগেছিল ধাক্কা, কোনও রকমে সামলালাম।

"এই নাও, কম্বলখানা জড়িয়ে কালীবাড়ি যাও। এখন কেউ নেই। মাকে দেখে এস গে।" প্রজ্ঞানাথজী নিজের গায়ের কম্বলখানা খুলে বাড়িয়ে ধরলেন।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কম্বলখানা যে নেওয়া উচিত ওঁর হাত থেকে এ কথাটাও খেয়াল হল না।

প্রজ্ঞানাথ বললেন—"সকাল হলেই আবার ভিড় হবে তো। এই সময়েই যাওয়া উচিত।"

"এত ভোরে!" আরো কিছু বলবার চেষ্টা করলাম, গলা বন্ধ হয়ে গেছে।

"তোমার মা দিন রাত সন্ধ্যে সকাল তৈরী করেছেন, ওঁর কাছে কোনও সময় সময় নয়। কালের অতীত কালী, মহাকালকেও গ্রাস করে ফেলেন। যাও, দেরি করো না।" বলে কম্বলখানা আমার গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে ওপরে চলে গেলেন।

অতঃপর যেতেই হল। ওঁর কম্বলখানা জড়িয়েই রওয়ানা হলাম। বুকটা কেঁপে উঠল যেন, সাক্ষাৎ ইষ্টদেবী, সাক্ষাৎ ইষ্টদেবীর সামনে যেতে বুক কাঁপবেই।

তখনও আঁধার রয়েছে।

দূর থেকেই দেখতে পেলাম কালীবাড়িতে জোরালো আলো জ্বলছে। লোকজনের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কালীবাড়ির দরজা খোলা। এধারে ওধারে আলোগুলোই জ্বলছে শুধু, একজন মানুষও জেগে নেই। না না, ঐ তো রয়েছে। কে যেন হাঁটছে না মা কালীর ঘরের সামনে! কে হাঁটছে এ সময়?

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, মায়ের দর্শন এখন পাব কোথায়।

দাঁড়ালাম গিয়ে বারান্দার সামনে। বারান্দা অন্ধকার। কালীর দরজাও বন্ধ। কিন্তু চিনতে পারলাম। কাউকে বলে দিতে হল না, চিনিয়ে দিতে হল না, ধপধপে সাদা কাপড় পরা যিনি হাঁটছিলেন তাঁর মুখখানিও ষোল আনা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। ভাল-মন্দ দ্বিধা-সংশয় কিছুই উদয় হল না মনে। পাথরের মত দাঁড়িয়েই রইলাম। দেখতে লাগলাম হাঁটুনি, একবার এধার থেকে ওধার আবার ওধার থেকে এধার মা হাঁটতেই লাগলেন, হাঁটতেই লাগলেন। হাঁটুনি কিছুতেই থামল না।

আলো এসে পড়ল। লোকজনও উঠে পড়ল। দিনের আলোয় মুখ দেখলাম, চুল দেখলাম। কিংবা কিছুই দেখি নি হয়তো, সেই হাঁটুনিই শুধু দেখেছিলাম। ইংরেজী কথাটা হচ্ছে ম্যাজেস্টিক, আস্তে আস্তে পায়চারি করার মধ্যে কোনও বিশেষ জাতের কায়দা নেই, কিন্তু ব্যাপারটা এক কথায় ম্যাজেস্টিক। ভয়ঙ্কর রকম ম্যাজেস্টিক, সেই গুরুতর মর্যাদাসম্পন্ন হাঁটুনির সামনে নিজেকে একটা কেঁচো বলে মনে হল।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম মনে করতে পারছি না। এইটুকুই শুধু মনে আছে যে অন্য কেউ এসে আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি, তাড়িয়ে দেওয়া তো বহুদূরের কথা। ব্যাপারটা কিন্তু বাস্তবিকই একটা তাজ্জব কাণ্ড। অনর্থক একজন সমানে হাঁটছে, একবার চলে যাচ্ছে বারান্দার ও-প্রান্তে, আবার ফিরে আসছে। চলে যাচ্ছে সে-প্রান্তে, আবার ফিরে আসছে। ঘাড় সোজা সমস্ত দেহটা সোজা চোখে পলক পড়ছে না। একরাশ রুক্ষ চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে। যেন মানুষ নয়, একটা আস্ত সিংহ যেন, কেশর ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদম টেরই পাচ্ছে না কিছু। কম্বল জড়ানো আর একটা জীব দাঁড়িয়ে রয়েছে সিঁড়িতে, আর তার ঠিক দু হাত সামনে দিয়েই বার বার পার হচ্ছে। তাতে কি, পাথর তো, মার্বেল পাথরের তৈরী একটা চলন্ত যন্ত্র। নর নয় নারী নয় কিছুই নয়, শুধুই যন্ত্র। দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে কে। পাক খাচ্ছে।

মা আনন্দময়ী! ওকে মানুষে মা বলে কেন? আমি তো দেখছি মা নয় বাবা নয় কিছুই নয়। পাক খাচ্ছে একটা যন্ত্র। যন্ত্রটার পাক খাওয়া দেখতে দেখতে যন্ত্রের শক্তিটাও দেখতে পাচ্ছি। আসল ব্যাপার হল ঐ শক্তি, যেটা ঐ মার্বেল পাথরের যন্ত্রটাকে অবলম্বন করে পাক খাচ্ছে।

ভয়ঙ্করী শক্তি, থামতে জানে না, পাক খাওয়াচ্ছে যন্ত্রটাকে, অবিরাম পাক খাওয়াচ্ছে। ওকেই মানুষে মা বলছে! কি আহাম্মকী!

এধারে আমি যে পহেলা নম্বরের আহাম্মকের মত গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি সেদিকে খেয়াল নেই। কিছুই খেয়াল নেই। মায়ের মন্দির খুলে পুরোহিত পূজায় বসলেন, পূজা শেষ হল, ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়ে আরতি হল, কিছুই টের পেলাম না। বিস্তর লোকজন এল গেল, কালো পাথরের নিশ্চল কালীকে আর সাদা পাথরের সচল কালীকে প্রণাম করে চলে গেল, কিছুই জানতে পারলাম না। অবশেষে হুঁশ হল যখন তখন দেখি কে যেন আমার ডান হাতের কব্জিটা ধরে আছে। ফিরে তাকালাম। তাকিয়েই ভয়ানক রকম চমকে উঠলাম। ডুপ্লিকেট, একদম নকল, কিংবা এইটিই আসল, আর ঐ চলন্ত যন্ত্রটা নকল!

নকলই হোন আর আসলই হোন যিনি আমার হাত ধরেছিলেন তিনি ফিসফিস করে কথা বললেন—"চলে আসুন, কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন?"

দম ফেলে সিঁড়ি থেকে নেমে এলাম। হাত ছেড়ে দিয়ে পাশে পাশে তিনি হাঁটতে লাগলেন। কালীবাড়ির বাইরে পৌঁছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় থাকেন? মা যখন কথা বলবেন খবর পাঠাব।"

সেখান থেকেই প্রজ্ঞানাথজীর কুঠিরটা দেখিয়ে দিয়ে জানতে চাইলাম, আর কতক্ষণ ঐভাবে হাঁটবেন মা।

দিদি জবাব দিলেন—"কি করে জানব ভাই। কাল এখানে

পৌঁছেই ঐ অবস্থা। কুড়ি ঘণ্টা তো পেরোতে চলল। দেখা যাক।”

ফিরে চললাম। যিনি আমাকে ভাই বললেন, আমার হাত ধরে ঐ জ্যান্ত পাষাণের সামনে থেকে যিনি টেনে নিয়ে এলেন, মনে মনে সেই দিদিকে প্রণাম করলাম। মায়ের চেয়ে দিদি অনেক আপনার, দিদি দিদিই। ভাগ্যে দিদি ছিল তাই রক্ষে পেলাম। নয়ত বোধ হয় ঐ পাষাণী মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমিই পাষাণ হয়ে যেতাম।

আমাকে বলতে হবে উত্তরকাশী থেকে বিদায় নিলাম কখন। আস্ত হিমালয়ের পরিচয় দিতে বসেছি আমি সেকথা ভুললে চলবে না। মা আনন্দময়ীর মহিমা শোনাবার জন্যে এ কাহিনী লিখতে বসি নি আমি, এটি হচ্ছে নীলকণ্ঠের পরিচয়। হিমালয়কে দেখে হিমালয়ের মধ্যে ঘুরে এসে মানুষ ধন্য হয়ে যায়। এমনভাবেই হিমালয় মন মজিয়ে ফেলে যে বার বার অনেকে ঘর সংসার ফেলে ছুটে যায় হিমালয়ের কোলে। কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা মেটে না, যতবার যায় হিমালয়ে ততই হিমালয়কে জানবার চেনবার হিমালয়ের অন্তরের বাণী শোনবার দুর্নিবার বাসনাটা বেপরোয়া বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ অতৃপ্ত বাসনা বুকে নিয়েই অনেকে হিমালয়ের কোলেই লুটিয়ে পড়ে একদিন, হাঙ্গামা চুকে যায়।

হিমালয়ের রহস্যটুকু যেমনকে তেমন হিমালয়ের অন্তরে লুকানোই থাকে। বরফের মুকুট মাথায় পড়ে হিমালয় অগ্নিনেত্রে তাকিয়ে থাকেন। নীলকণ্ঠ সাক্ষাৎ নীলকণ্ঠ, কার সাধ্য নীলকণ্ঠের স্বরূপ প্রকাশ করবে! বিষের জ্বালায় জ্বলে যাবে যে, যে বিষ জমা আছে নীলকণ্ঠের কণ্ঠে, যুগ-যুগান্ত ধরে জমছে, শুধুই জমছে, এতটুকু খরচ হচ্ছে না, সেই হিমালয়-প্রমাণ বিষের পরিমাণ কার সাধ্য নির্দেশ করছে!

আসল কথা হিমালয়কে জানবার চেনবার বোঝবার শক্তিটা পাবে কোথায়! চোখ ফুটিয়ে দেবে কে! পাপ-পুণ্য ধর্ম-অধর্ম শাস্ত্র-অশাস্ত্র নানা জাতের রঙিন চশমা চোখে এঁটে হিমালয়ের সঙ্গে পরিচয় করতে যায় লোকে। অনেকে যায় হিমালয়ের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে। সাতাশ হাজার ফুট উঠতে পারল হিমালয়ের বুক বেয়ে না ছাব্বিশ হাজার ফুট উঠল, এইটুকুই হল আসল কথা। জয় করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য কি না, হিমালয়ের বুক বেয়ে হিমালয়ের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়াতে পারলেই

হিমালয়কে জয় করা হয়ে গেল। মানুষের তৈরী কাগজে মানুষের তৈরী ছাপাখানায় মানুষে ছেপে বার করে দিলে নাম, মহাবীর অমুক মানুষটি হিমালয়কে জয় করে ফিরে এল। তাতে বড় বয়েই গেল হিমালয়ের, হিমালয়ের শির নুয়ে পড়ল কি তাতে! মোটেই না, হিমালয় লেখাপড়া জানে না। তাই মানুষের ছাপা সংবাদপত্র পড়ে পরাজিত হবার সংবাদটাও জানতে পারে না। ভাগ্যে জানতে পারে না! পারলে পরাজয়ের গ্লানি ঘোচাবার জন্যে এমনই প্রতিশোধ নিত হয়তো যে তামাম মানুষ জাতটাই এই পৃথিবী গ্রহটার বুক থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যেত।

সংকেত, বিলকুল সবটুকুই সংকেত। হিমালয়কে যদি জানতে বুঝতে চাও, হিমালয়ের সংকেতটুকু বোঝবার চেষ্টা কর। তার আগে ঐ হিমালয়ের মত স্থির হও, ঐ হিমালয়ের মত মৌনতা অবলম্বন কর, ঐ হিমালয়ের মত বিষ গিলে কণ্ঠে ধারণ করার শক্তিটা অর্জন কর। নিজে আগে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হিমালয় বনে যাও, তবে তো হিমালয়ের অন্তরের ভাষা বুঝতে পারবে।

কি করতে হবে তার জন্যে? তপস্যা? লক্ষ কোটি বার একাসনে বসে চার ষোল আট আট বত্রিশ ষোল ষোল চৌষট্টি বত্রিশ গোণা!

তাহলে মেয়াদটুকুই যে ফুরিয়ে যাবে। মেয়াদ ফুরোবার আগে কিছুই যে জানা হবে না।

অতএব ঐ ভয়ঙ্করী শক্তি, ঐ যাকে মানুষ নাম দিয়েছে মা আনন্দময়ী, ঐ শ্বেত পাথরের যন্ত্রটা থেকে খানিকটা শক্তি নিজের ভেতর নিয়ে নাও।

প্রজ্ঞানাথজী উপায়টি বাতলে দিলেন। বললেন—"তোমার জন্যে ঐ নাক টেপাটিপি নয়, তোমার ধাতে সইবে না। দূর ছাই বলে ফেলে দিয়ে আবার ছুটে বেড়াবে। যা তুমি চাইছ তা আছে ঐ রক্ত-মাংসের দেহটায়। সাংঘাতিক জাতের জেনারেটার, চার্জ করে নাও, নিজের ব্যাটারীটাকে চার্জ করে নাও ঐ জেনারেটার থেকে।"

কি করে ?

"তা আমি বলব কেমন করে।" কাটা ছেঁড়া জবাব দিয়ে প্রজ্ঞানাথজী মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ভ্যালা আপদ হল তো।

চুপচাপ বসে শুয়ে থাকতে পারছি না গুহায়, অনবরত টানছে। টানটা বুঝতে পারছি, কেন টানছে বুঝতে পারছি না। হাঁটুনিটা থামল কি না তাই বা কে জানে! দেখে আসব ? দেখে আসতে গেলে ঐভাবে আটকে যাব না তো আবার! আবার যদি ঐভাবে জরদ্গব বনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, লোকেই বা কি ভাববে ?

কোনও রকমে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটল। সন্ধ্যার পর আর থাকতে পারলাম না। চুপিচুপি এগিয়ে গেলাম কালীবাড়ির দিকে। দূর থেকেই দেখা যাবে এখনও চলছে কি না হাঁটুনি। দূর থেকে দেখেই চলে আসব।

দূর থেকে কিছুই দেখা গেল না। হাঁটুনি বন্ধ হয়েছে এইটুকুই শুধু জানতে পারলাম। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম কালী-বাড়ির সামনে। অনেকগুলো জোরালো আলো জ্বলছে। কিন্তু নিস্তব্ধ, টুঁ শব্দটি শোনা যাচ্ছে না। তাহলে ?

ঐ তো! ওধারের ঐ ঘরটায় চুপচাপ কারা যেন বসে রয়েছে না!

কি করছি না করছি হুঁশ নেই তখন। কখন যে দাঁড়ালাম গিয়ে দরজাটার সামনে তাও বুঝতে পারি নি। দাঁড়িয়েই রইলাম চুপচাপ আর তাকিয়ে রইলাম। কি দেখেছিলাম সেটুকু বলছি। কারণ সেই ছবিটা শেষ নিশ্বাস পড়া পর্যন্ত আমার মন থেকে মুছে যাবে না।

বসে আছেন শ্বেত পাথরের প্রতিমা, পেছন দিকে পা দুখানি মুড়ে সোজা হয়ে বসে আছেন। চোখের পলখ পড়ছে না। তাকিয়ে আছেন কিন্তু, মুখখানি সামান্য ওপর দিকে তোলা, ওপর দিকেই তাকিয়ে আছেন। কি দেখছেন ? কিছুই দেখছেন না। অথবা এমন কিছু দেখছেন যা আমরা কেউ দেখতে পাই না।

আরও অনেকে বসে আছেন সেই ছোট ঘরখানিতে। গেরুয়া পরা পাগড়ি বাঁধা কয়েকজন সন্ন্যাসীও রয়েছেন। কেউ নড়ছেন না, একটি কথাও বলছেন না কেউ। সবাই তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে পাষাণ প্রতিমার পানে।

মায়ের ঠিক পিছনেই বসে আছেন সেই দিদি, তিনি আবার চোখ বুঁজে বসে আছেন। অদ্ভুত কাণ্ড যাকে বলে, ঘরসুদ্ধ সবাই যেন ঘুমিয়ে রয়েছে।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছি। খেয়াল নেই যে পেছনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা ঘরে ঢুকতে চান।

আবার একজন গায়ে হাত দিলেন। পেছন ফিরে তাকাতেই কানে কানে বললেন—"বস না ভেতরে গিয়ে, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন।" হিন্দীতে বললেন। হিন্দী শোনবার ফলেই বোধ হয় ষোল আনা হুঁশ ফিরে পেলাম। আর দাঁড়ালাম না। কোনও রকমে মুখ লুকিয়ে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে এলাম।

ভোর হবার অনেক আগে প্রজ্ঞানাথজী ডাক দিলেন। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন—"আজ তুমি তোমার ইষ্টদেবীকে পূজা করবে। মন্ত্রতন্ত্র যা শিখেছ সমস্ত আওড়ে ভোগ নিবেদন করবে। সেই ভোগ খাওয়াবে। পাষাণ প্রতিমা নয়, সুতরাং খাওয়াতেই হবে। যদি না খাওয়াতে পার তাহলে পূজা নিষ্ফল। যাও তৈরী হয়ে নাও। একজনকে বলে দিয়েছি, পূজার উপচার আর ভোগ নিয়ে আসবে। সেই সমস্ত নিয়ে তুমি তোমার মায়ের পূজা করতে যাবে।"

তৈরী হতে হবে! তৈরী হবার জন্যে ওপর থেকে নেমে এলাম।

হায়—কে আমায় বলে দেবে তখন যে কি ভাবে আমি তৈরী হব!

তারপর কয়েক ঘণ্টা কি অবস্থায় কাটল, তা বলবার সামর্থ্য আমার নেই। আনন্দ নয় উত্তেজনা নয়। ভয়? না তাও নয়।

সত্যিকারের স্তব্ধ হয়ে যাওয়া কাকে বলে তা যদি জানা থাকে কারও তাহলে তিনি কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন। স্রেফ স্তব্ধ হয়ে গেলাম, ভাবনাও নেই দুর্ভাবনাও নেই। কে আমার ইষ্টদেবী! আমিই বা কে! কোনও প্রশ্ন মনে জাগছে না। একদম ঘুমিয়ে পড়েছি। নির্জলা ঘুম ঘুমিয়ে রইলাম নির্জলা জেগে থেকে। এটা যে কি জাতের অবস্থা তা আমি বোঝাই কেমন করে।

অবশেষে সময় হল। ছোট একখানি পাথরের থালায় ভোগ নিয়ে প্রজ্ঞানাথজী সঙ্গে সঙ্গে চললেন। পৌঁছলাম আবার সেই ঘরের সামনে। দেখলাম সেই একভাবে বসে আছেন আমার ইষ্টদেবতা। সামনে একখানা আসন পেতে আসনের সামনে কোষাকুষি ফুলচন্দন সাজিয়ে পূজার ব্যবস্থা। পুরোহিত ঠাকুর এলেই হয়।

ভোগের থালাখানি নামিয়ে দিয়ে প্রজ্ঞানাথ ইশারা করলেন। অর্থাৎ বসে বড়। মন্ত্রতন্ত্র যা কিছু শিখেছ আওড়াও গিয়ে ঐ শ্বেত পাথরের প্রতিমার সামনে। জাগাও তোমার ইষ্টদেবীকে। যোগনিদ্রা স্বরূপিণীর যোগনিদ্রা ভাঙাও।

বসে পড়লাম।

মন্ত্রতন্ত্রের ভূত তার অনেক আগেই আমার ঘাড় থেকে নেমে গেছে। নিজের বাপের নামও ভুলে গেছি। নিজেকেই ভুলে গেছি তো নিজের বাপের নাম। আসনশুদ্ধি জলশুদ্ধি ন্যাস প্রাণায়াম বিলকুল উধাও। ষোল-দু-গুণে বত্রিশ আনা ভূতশুদ্ধি হয়ে গেছে। থালাখানি তুলে মুখের সামনে ধরে ফিসফিস করে বললাম। কি বললাম তা নিজেও জানি না। থালাখানি ধরে রইলাম শুধু মুখের সামনে। আর দম আটকে তাকিয়ে রইলাম।

খুবই চুপিচুপি মায়ের পেছন থেকে কে যেন বলল—"খাইয়ে দাও, মুখে তুলে দাও, মায়ের হাত কই যে তুলে খাবে।"

আরে সত্যিই তো! চারখানা হাতই যে জোড়া! খড়্গ মুণ্ড বর অভয়, চার হাতই যে জোড়া!

তাড়াতাড়ি একটা মনেক্কা না কি তুলে ঠোঁট দুখানির সামনে ধরে নিঃশব্দে বর্ণহীন ভাষায় বললাম—"খাও মা।"

নড়ে উঠল ঠোঁট দুখানি, জিনিসটা ঠোঁটের ফাঁকে দিয়ে দিলাম।

একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে মা আমার মুখপানে তাকালেন। অদ্ভুত একটা আলোর মত কিছু জ্বলে উঠল যেন। মুখ নড়তে লাগল। একটু পরে ঢোঁক গিলে সহজ স্বাভাবিক জননী কেঁদেই ফেললেন প্রায়। উঃ সে কি মায়াকান্না! খাঁটি বাঙাল দেশের মেয়ে, কিচ্ছুটি জানে না, খাঁটি বিক্রমপুরী ভাষায় হাউমাউ কান্না। কি ব্যাপার?

আহা বাছারে, কোন্ মায়ের কোল খালি করে কোন্ অভাগী মাকে কাঁদিয়ে এই বয়েসে তুই সংসার ছেড়ে চলে এসেছিস রে বাছা!

ভয়ানক ভেবাচাকা খেয়ে গিয়ে মুখ তুলে প্রজ্ঞানাথের মুখপানে তাকালাম। নির্বিকার সন্ন্যাসী ইশারা করে জানালেন, উঠে পড়।

উঠে পড়লাম। বেরিয়ে এলাম প্রজ্ঞানাথের সঙ্গে। মায়ার চোটে বিক্রমপুরী বোকা জননী তখনও হাউমাউ করছেন।

মা আনন্দময়ী।

মায়ের পরিচয় ছেলে দিতে পারে না। ছেলের পরিচয় মা ভাল করে জানে। এত বড় গাড়ল নই আমি যে মা আনন্দময়ীর পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। সে গরজও আমার নেই। এইবার শেষ হবে এই প্রসঙ্গ, আর অল্পই বলার আছে। উত্তরকাশী থেকে বিদায় হলাম যখন তখন কি নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে সেটুকু বলতে হবে তো।

কি রকম যেন আধজাগ্রত অবস্থায় দিনটা কেটে গেল। ছত্র থেকে না কোথা থেকে বলতে পারব না, এক চাঙড় ভাত আর খানিকটা ডাল আনিয়ে প্রজ্ঞানাথজী নিচে নেমে গিলিয়ে গেলেন আমাকে। রাত্রি এল। গুহার ভেতর কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছি, কে যেন কপাটে ঘা দিল। বেরিয়ে দেখলাম কালীবাড়ির সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

ভুলেই গিয়েছিলাম ওঁর কথা। আরে তাইতো! গঙ্গোত্রী যাবেন ভদ্রলোক মায়ের সঙ্গে, আমাকে তো তখন সেবা-পূজা চালাতে হবে।

খুবই উৎসাহ দেখিয়ে জানতে চাইলাম—"বলুন দাদা, হুকুম পেয়েছেন তো মায়ের? বলুন কবে থেকে কাজে লাগতে হবে।"

দাদা বললেন উদ্ভট কথা। আমাকেই হুকুম নিতে হবে মায়ের কাছ থেকে। তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার। আমিই পারব, কারণ সকালে গিয়ে মাকে জাগিয়ে দিয়ে এসেছি। জাগিয়ে দেবার দরুন সবাই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। শুরু হয়ে গেছে তোড়জোড়, এবার মা গঙ্গোত্রী যাবেন। সুতরাং এই বেলা মায়ের কাছে গিয়ে আমাকেই দাদার জন্যে হুকুম আনতে হবে।

"খুব খুব, নিশ্চয়ই যাব। কেন যে অত ভয় করেন দাদা মাকে। চলুন, এখুনই যাই। এখন ভিড় নেই তো মায়ের কাছে?" বলতে বলতে রওয়ানাই হলাম একেবারে। এতটার জন্যে দাদা প্রস্তুত ছিলেন না। বেশ ভয় পেয়ে গেলেন যেন। বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। থাকুক না এখন, রাত্রে না গেলেও হয়। সকালে গিয়ে—

কে শোনে কার কথা। চলে এলাম কালীবাড়ি। হৈ চৈ হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে সবাই কথাবার্তা বলছেন। সেই মৌন গাম্ভীর্য আর নেই। মা কোথায়?

ঐ যে ওধারে। গাড়োয়ালী কুলীরা ঘিরে বসে আছে মাকে। ওদেরই মা, ওদের ঘরকন্নার কথা ওদের সুখ-দুঃখ নিয়েই মেতে আছেন। দুনিয়া উচ্ছন্নে যাক, কোনও দিকে তাকাবার সময় নেই মায়ের। বড় বড় সাধু-সন্ন্যাসীরা আসছেন মাকে দর্শন করতে। কে কার কড়ি ধারে। মা তাঁর হতদরিদ্র হাবাতে সন্তানদের নিয়েই মশগুল।

চলে গেলাম কাছে। ভয়ানক একটা মজার ব্যাপার চলছে তখন। একজন আধাবয়সী গাড়োয়ালী জিভ তালু ঠোঁটের সাহায্যে বিচিত্র আওয়াজ করে চলেছে মায়ের সামনে বসে আর মাথা নাড়ছে। অর্থাৎ তবলা বাজাচ্ছে। সবাই হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে, মা পর্যন্ত

হাসছেন। ভয়ানক রকম হাসছেন, চোখ মুখ সর্বাঙ্গ দিয়ে হাসি যেন উপছে পড়ছে।

আমাকে দেখে ডাক দিলেন মা—"আয় আয়, বোস আমার কাছে এসে। দেখ কি কাণ্ড হচ্ছে।"

গাড়োয়ালীদের মাঝখানে গিয়ে বসে পড়লাম। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে সাধু দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল না ওরা। মায়ের রোগে ধরেছে ওদের, ছুনিয়াকে আর গ্রাহ্য করে না।

আরও কিছুক্ষণ হৈ চৈ হবার পরে ওরা উঠে গেল। ফাঁক পেয়ে যা বলতে এসেছিলাম বলে ফেললাম। মা তৎক্ষণাৎ রাজী। মা সবতাতেই রাজী। শুধু রাজীই হলেন না, ভয়ানক রকম অপরাধিনীও হয়ে পড়লেন। আহা-হা, ঐ বুড়ো মানুষ, একলাটি পড়ে আছে উত্তরকাশীতে এত বছর, এখনও গঙ্গোত্রী যেতে পারে নি একটি বার! কি অন্যায়, কি অন্যায়। কেউ কি কারও পানে তাকায়। নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণটি যাবে মায়ের সঙ্গে গঙ্গোত্রী। আর তখন আমি কালীবাড়িতে নিত্যসেবা চালাব।

চুকে গেল। ফিরে এলাম নিজের ডেরায়। ভোর রাতে আবার ডাক দিলেন প্রজ্ঞানাথ। ফিকে চা গিলিয়ে বললেন—"ঐ কালীর নিত্যসেবা করার অধিকার নেই তোমার। পৈতে পুড়িয়ে সন্ন্যাস নিয়ে বসে আছ। ঐ কালী ভোলানাথের। তিনি ছিলেন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রমতে তাঁর কালীর নিত্যসেবা হওয়া চাই। তাই ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে গেছেন। পৈতে পোড়ানো সন্ন্যাসী কি করে নিত্য-সেবা চালাবে। তোমার ঐ খেপী মাকে বল গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে। তারপরও যদি ঐ খেপী হুকুম দেয় তখন ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দিও।"

যাঃ বাবা! গেল বুঝি সব ভণ্ডুল হয়ে। ব্রাহ্মণটির জন্যে খুবই মন খারাপ হয়ে গেল। এবারও তাহলে বেচারার গঙ্গোত্রী যাওয়া হল না বুঝি?

না, শাস্ত্রে যা আছে তা লঙ্ঘন করার শক্তি স্বয়ং মায়েরও নেই। শাস্ত্রটা বেরিয়েছে মায়েরই পেট থেকে, লঙ্ঘন করবেন কেমন করে। বিষম ভয়ে পেয়ে গেলেন মা—"ওরে বাপ্‌রে! তাও কি কখনও হয়? ঐ কথা সেই মহাপুরুষ বললেন বুঝি? দেখ দিকিনি, কি হতে কি হচ্ছিল। আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, আমি কি করে জানব কি আছে শাস্ত্রে। ভাগ্যে উনি দয়া করে বললেন। ঐসব দায় নিতে আছে কখনও। বাছার আমার কি বিপদ ঘটত তাই বা কে জানে। পৈতে ফৈতে পুড়িয়ে এসেছে এখানে শান্তি পাবার জন্যে, তা ওর ঘাড়েই ঐ বিপদ চাপাচ্ছে। কোথায় গেল সে, ডাক তাকে। ব্রাহ্মণ বুড়ো হয়েছেন, শাস্ত্রে কি লেখা আছে তাও জানেন না?"

বক বক বক বক অনর্গল বকতে লাগলেন। একটা পাঁচ বছরের মেয়ে, কিচ্ছু জানে না, কিছুই বোঝে না। ভয়ঙ্কর ভীতু, একটু কিছু হলেই একেবারে ভয়ে কাঠ।

মা আনন্দময়ী। জ্ঞান-বিজ্ঞান শাস্ত্র-অশাস্ত্র ধর্মাধর্ম সর্বস্ব যিনি প্রসব করেছেন এবং যিনি গ্রাস করবেন, সেই মহাশক্তি সাক্ষাৎ কালশক্তি কালী। একটা পাঁচ বছরের মেয়ে, কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু বোঝে না, একদম নির্বিকার। কিন্তু ভোলানো যাবে না আর আমাকে, আমি যে তখন মাকে ছুঁয়ে ফেলেছি। বুড়ী ছুঁয়ে থাকলে কি করে আর চোর হবে। খেলাই খতম হতে চলেছে তখন, আর আমায় পায় কে।

হুকুম দিলেন মা—"একবার আসিস তো বাবা সন্ধ্যের পরে। অনেকটা রাত করেই আসিস। একটা কথা আছে তোর সঙ্গে। আহা বাছারে, কোন্ মায়ের বুকে আগুন জ্বেলে এই বয়েসে সন্ন্যেসী হল।"

শুরু হয়ে গেল আবার হা-হুতাশ। ফিরে এলাম, ঐ আবোল-তাবোল কে শোনে।

প্রজ্ঞানাথ বললেন—"হয়ে গেল। এইবার তুমি ঘুমাবে আর তোমার মা তোমাকে পাহারা দেবেন। যার ছেলে সে নিজেই নিচ্ছে ছেলের ভার। আপদের শান্তি। তোমার গুরুর আদেশ, তিন বছর

মৌনব্রত অজগরব্রত পঙ্গীব্রত নিয়ে এই হিমালয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। গুরু-নির্দিষ্ট-পথে আগলে রইলেন ইষ্টদেবী। যা বলবার এখনই বলে নাও। আর সময় পাবে না।"

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞানাথের চরণ দুখানির ওপর কপাল ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ পড়ে রইলাম। বিকারবিহীন সন্ন্যাসী আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। জিভ দিয়ে যা বলা যায় তা উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়। একমাত্র ব্রহ্মই উচ্ছিষ্ট নন, জিভ চালিয়ে তাঁকে বোঝানো যায় না।

পরম ব্রহ্মজ্ঞ প্রজ্ঞানাথজীকে জিভ চালিয়ে উচ্ছিষ্ট বাক্য দ্বারা কিছুই বলতে হল না। যা কিছু বলা কওয়া সমস্তই বাক্যাতীত বাক্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হল।

রাত তখন অনেক।

পৌছলাম যখন কালীবাড়িতে তখন মা অন্ধকারে কালীর দরজায় বসে আছেন। খুঁজতে হল না, হঠাৎ মনে হল মা কালীর সামনে প্রণাম করে আসি তারপর জ্যান্ত মা কোথায় আছেন দেখব। সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। কি যেন একটু গুছিয়ে জানাতেও যাচ্ছিলাম, ফুরসৎ হল না। অন্ধকার দরজার কাছ থেকে ডাক এল —"আয় উঠে আয়।"

একটু বোধ হয় চমকে উঠেছিলাম। তারপর উঠে গেলাম দালানে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন—"বোস আমার কাছে।"

বসে পড়লাম হাত খানেক তফাতে। মা নিজেই একটু সরে এলেন। বললেন—"হাঁ কর, আগে কাজটুকু সেরে নি, তারপর যা বলার বলব।

হ্যাঁ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম কি হল। কয়েকটি মুহূর্তমাত্র, তারপর আমার মুখের ভেতর থেকে আঙ্গুল টেনে নিলেন মা। মুখ বন্ধ হল।

শুনতে লাগলাম তখন অভয়বাণী—"এইবার ঘুরে বেড়াগে যা, চোখ মেলে দেখবি, কান পেতে শুনবি, চৈতন্য দিয়ে বুঝবি। তোর

মা নিজের জিভটা কামড়ে রয়েছেন। জিভ কামড়ে থাকলে কি কেউ কথা বলতে পারে রে। তোর জিভটাও অচল করে দিলুম। এইবার মজা করে দেখে নে তোর মায়ের এই সংসারটা কেমন জায়গা। এই যে হিমালয়, এখানেই সব আছে। তিন বছর পরে যখন বেরুবি পাহাড় থেকে তখন সব তোর জানা হয়ে গেছে। বিষ, সমস্তই বিষ। সেই বিষ যিনি কণ্ঠে ধারণ করে আছেন তিনিই সাক্ষাৎ শিব নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের ভালও নেই মন্দও নেই। সৎ অসৎ কিছু নেই। সত্যের জাত নেই। সত্য হল সত্য, ঐ নীলকণ্ঠই একমাত্র সত্য। বিষকে কণ্ঠে ধারণ করেছেন যিনি তিনিই সত্য শিব সুন্দর। আর সুন্দরের শক্তি আনন্দভৈরবী।"

কথা শেষ হল।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠলাম। অন্ধকারে তাকিয়ে দেখলাম, মা সেখানেই কালীর দরজায় মাথা দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছেন। যোগনিদ্রা নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল, নিশ্চিন্ত।

বিদায় উত্তরকাশী।

আবার দেখা হবে, বহুবারই দেখা হবে। তিন বছর থাকতে হবে হিমালয়ে, ঘুরতে ঘুরতে বহুবারই হয়ত আসব। আবার যখন ফিরে আসব তখন তুমি আমায় চিনতে পারবে তো?

গঙ্গোত্রীর পথে ভিড়, ডাণ্ডি কাণ্ডি মালপত্র নিয়ে যাত্রীরা চলেছেন তীর্থ করতে। প্রজ্ঞানাথও যাবেন কয়েকদিন পরে। মা আনন্দময়ী চলে গেলেন দুপুরের দিকে। দিন সাতেকের ভেতর ফিরে এসে নেমে যাবেন। বিচার বিবেচনা করে দেখলাম, এই ফাঁকে পালাতে হবে। কেউ অবশ্য মানা করছে না থাকতে উত্তর-কাশীতে, প্রজ্ঞানাথ চলে যাবার পরে মাস চার পাঁচ একলাই থাকতে পারি। ওপরে প্রজ্ঞানাথ থাকবেন না, একলা থাকব নিচের গুহায়। কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। ছত্র থেকে ডাল রুটি এনে খাওয়া আর পড়ে

থাকা। ব্যাপারটা লোভনীয় বটে। মৌনব্রত অজগরব্রত পঙ্গীব্রত বিলকুল বজায় রেখে তিন বছর নিশ্চিন্তে কাটাবার এ হেন সুযোগ কি ছাড়তে আছে ?

বিদায় উত্তরকাশী। কোনও লোভেই তোমার আশ্রয়ে আর একটা রাতও কাটাব না।

"ঘুরে বেড়াগে যা, চোখ মেলে দেখবি, কান পেতে শুনবি, চৈতন্য দিয়ে বুঝবি—" ঐ তিনটি হল আসল কাজ। দেখা শোনা বোঝা, এই গুহায় পড়ে থাকলে কি দেখব কি শুনব কি বুঝব ! কত কাণ্ডই না ঘটছে বাইরে আর আমি চোখ বুঁজে পড়ে আছি !

আগের রাতে যে সময় মা আমার জিভ স্পর্শ করেছিলেন, সেই সময়টি এসে গেল। চব্বিশটা ঘণ্টাই নষ্ট হল। আর নয়, একমুহূর্তও নষ্ট করা হবে না। ওপরে প্রজ্ঞানাথ জেগে আছেন, জেগেই থাকেন সদাসর্বক্ষণ, দরজায় ধাক্কা দিয়ে ওঁকে প্রণাম করে চলে যাব। পেতলের বালতিটা সঙ্গে নেব নাকি ? নিতেই হবে, জলপাত্রটা চাই। অন্য সময় দরকারে না লাগুক, প্রত্যেক দিন ভোরে লাগবে। ঐটে আর কম্বল দুখানা আর কাপড়ের টুকরো দুটো তো গায়ে আছেই। ব্যাস, একদম ঝাড়া হাত-পা, কি আরাম।

অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলাম। কোথায় গেল জলপাত্রটা ? জল-ভরতি ঐ কোণটায় রেখে দি রোজ। নেই তো ? বাইরে রেখেছি নাকি ? ভুলে হয়ত বাইরে রেখেছি।

দরজা খুলে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে পড়লাম। চমৎকার জ্যোৎস্না, গঙ্গার ওপার পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এইবেলা পা চালালেই ভোর হবার আগে উত্তরকাশীর সঙ্গে সম্বন্ধ চুকে যাবে। কিন্তু সেই জল-পাত্রটি গেল কোথায় ? ওটিকে যে চাই।

দরজার পাশে রাখতাম পাথরের ওপর বসিয়ে। নিশ্চয়ই তাই করেছি।

আরে এ কি ! এগুলো আবার এল কোথা থেকে !

জিনিসগুলোর পানে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। বুকের ভেতরটা হু-হু করতে লাগল। বিদেয় দিয়েছ তাহলে আমাকে? এইভাবে বিদেয় দিলে?

সাধুদের হাতে যেরকম কাঠের কমণ্ডলু থাকে সেই কমণ্ডলু একটি, একগাছা লম্বা লাঠি, একখানি দামী কম্বল গুছিয়ে রাখা হয়েছে দরজার পাশে। সন্ন্যাসী প্রজ্ঞানাথ অনেক আগেই আমাকে বিদেয় দিয়ে গেছেন।

গায়ে জড়ানো কম্বলটা খুলে ফেলে দিলাম গুহার ভেতরে। নতুন কম্বলখানা জড়িয়ে নিয়ে লাঠি কমণ্ডলু হাতে তুলে নিলাম। তারপর দৌড়, আর একমুহূর্ত দেরি করতে আছে?

সকাল হল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ হল। সেই ঘুম, প্রজ্ঞানাথের কাছে নালিশ করতে গিয়েছিলাম যে ঘুমের জন্যে, সেই ঘুম দিব্যি ঘুমিয়েছি। হাঁটতে হাঁটতে ছুটতে ছুটতে ঠক্কর খেতে খেতে ঘুমিয়েছি। কোনও মুশকিল নেই, ঘুমাবার জন্যে আশ্রয় খুঁজতে হবে না, ঘুমাবার জন্যে শুয়ে পড়তে হবে না। যে কোনও অবস্থায় যে কোনও জায়গায় চলতে চলতে দৌড়তে দৌড়তেও ঘুমাতে পারব। বেশ বুঝতে পারছি ব্যাপারটা কি ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। শরীরটা একটা যন্ত্র বা যন্ত্রযান, সেই যন্ত্রযানের মধ্যে আমি চড়ে বসে আছি। ছুটুক না গাড়িটা, তাতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে কেন।

কিন্তু গাড়িটা নিয়ে এল কোথায়? এটা তো পথ নয়। যাত্রীরা নিশ্চয়ই এইরকম পথে যাচ্ছে না। একটা পায়ে চলা সরু পথ পাক দিয়ে দিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলেছে। ঝাউজঙ্গল, গাছগুলো সোজা উঠে গেছে। অস্বাভাবিক লম্বা সান্ত্রী সব, রাজাধিরাজকে অভ্যর্থনা করার জন্যে তটস্থ হয়ে আছে। রাজকীয় মর্যাদা বজায় রেখে সান্ত্রীদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু কোথায়?

আরে যেখানেই হোক না, আমার কি গেল এল তাতে। দেখাই যাক না কোথায় নিয়ে চলল গাড়ি। মজা লাগছে। বেশ মজা লাগছে। মোটরগাড়িতে বসে কাঁচঢাকা জানলার ভেতর দিয়ে দেখছি যেন সব। ক্রমেই উঠতে লাগল গাড়িটা, পাক দিতে দিতে ঝাউজঙ্গলের ভেতর দিয়ে ক্রমেই ওপরে উঠতে লাগল। জঙ্গল শেষ হল, সঙ্গে সঙ্গে ওতরাই। সরু পথটা মানে পথের চিহ্নটা হারিয়ে গেল নেড়া পাথরের ওপর। এ-পাথর থেকে ও-পাথরে পা দিয়ে সাবধানে নামতে লাগলাম। কোথায় চলেছি তাহলে ?

আবার এক ধমক লাগালাম নিজেকে। আরে বাপু, কেন অনর্থক মাথা ঘামিয়ে মরছ। যেখানে নিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা সেখানে যাচ্ছে। কোথায় গিয়ে থামে আগে দেখ। তারপর খোঁজ নিও যে কোথায় পৌঁছলে।

পৌঁছল শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় আমার গাড়ি। একটা ঝর্ণা, হাতখানেক চওড়া জল, ডানদিক থেকে তেড়ে নামছে। ভয়ঙ্কর তেজ, হুড়মুড় করে চলেছে নেমে বাঁদিকে। জরুরী কাজ আছে নিশ্চয়ই, নয়ত অত তাড়াতাড়ি কেন। কোথায় চলল একটু দেখে এলে হয় না ?

ছুটন্ত জলের পাশে পাশে চলল আমার গাড়ি। খানিকটা নামবার পরেই প্রথমে দেখতে পেলাম ধোঁয়া, কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে একটা পাহাড়ের পেছন থেকে। জলের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়টাকে ঘুরে ওধারে গিয়ে পৌঁছলাম। এইবার সমস্ত দেখা গেল। দুটো গরু চরছে, কয়েক টুকরো খেত পাহাড়ের গায়ে ওপর ওপর সাজানো রয়েছে। খেত কখানির ওপরে কয়েকটি ঝাউগাছ আর সেই গাছ-তলায় কাঠের খুঁটির ওপর কাঠ দিয়ে বানানো কয়েকখানি ঘর। মানুষ বাস করছে ওখানে, মানুষের ঘর-সংসার। রক্ষে পাওয়া গেল। চল বাবা গাড়ি ঐ মানুষদের কাছে। মানুষ রয়েছে যখন তখন আর ভাবনা কি। জয় বাবা মানুষের জয়।

কায়দা করে লাঠিটা জলের ভেতর ঠেসে ধরে জলটা পার হতে

হল। ঐ যে বলেছি না ভয়ানক তেজ সেই পাহাড়ী মেয়ের, অসাবধানে জলের ভেতর পা দিলে তেজী মেয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাবে। হিমালয়ের প্রতিটি ঝর্ণাই হিমালয়-তুহিতা, তেজ হবে না কেন।

জল পার হয়ে ওপর দিকে চড়তে লাগলাম আবার। মানুষের টানে গাড়িখানা মানুষের পানেই চলল।

হায় ভগবান!

মানুষ কোথায়, এ যে আবার সেই সন্ন্যাসী! দেখেই আসা যাক সাধুবাবাকে।

দূর ছাই, সন্ন্যাসী কোথায়? সন্ন্যাসিনী। মেয়েমানুষ গেরুয়া পরে সন্ন্যাসিনী হয়েছে। দরকার নেই বাবা, ফিরে চল গাড়ি, দূর থেকেই ফিরে চল। কি দরকার কাছাকাছি এগিয়ে?

ফিরলাম। অনেকটা ওপর থেকে ডাক শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সন্ন্যাসিনী হাত নেড়ে ডাকছেন। কি হল আবার! ডাকে কেন

না, ফেরা হবে না। স্বয়ং শঙ্করাচার্য বলেছেন, স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়াবে না।

গাড়িখানা আরও জোরে চলল, পালাতে পারলে বাঁচি।

সেই জায়গাটায় পৌঁছে গেলাম যেখানে ঝর্ণা পার হতে হবে। একটা উপযুক্ত জায়গা দেখে লাঠিটা গাড়বার চেষ্টা করছি, সামনে জলের ওপার থেকে কে যেন কি বললে। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, আর এক সন্ন্যাসিনী, পাঁচ-ছ হাত সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। পরিষ্কার হিন্দীতে বললেন—"চল ফিরে, পালাচ্ছ কেন? কেঁও ভাগতা?"

বলতে বলতে নেমে এসে টুপ করে একখানা পাথরের ওপর পা দিয়ে আমার পাশে লাফিয়ে পড়লেন। আবার সেই হুকুম হল—"চল এগিয়ে।"

গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ফিরে যাব আবার? কিছুতেই নয়।

সন্ন্যাসিনী রেগে উঠলেন। চড়া গলায় বললেন—"কি হল? দাঁড়িয়ে রইলে যে? ধরে নিয়ে যেতে হবে নাকি?"

বলে কি রে বাবা! সত্যিসত্যিই হয়ত গায়ে হাত দেবে। যেরকম মারমুখী, কিছুই অসম্ভব নয়। সুড়সুড় করে ফিরে চললাম আবার, তিনি পেছন পেছন উঠতে লাগলেন। অনেকটা ওঠবার পর পেঁৗছে গেলাম এক জাঁতার কাছে। ঝর্ণাটা সেখানে হঠাৎ মোচড় খেয়েছে। একটা মস্ত বড় পাথরের চাকি বসানো হয়েছে সেই বাঁকের মুখে, জলের তোড়ে সেটা অবিশ্রান্ত ঘুরছে। গম ভাঙবার কল, আজকে দেশময় বড় বড় ড্যাম তৈরী করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় যে উপায়ে ঠিক তাই। জলের তোড়ে চাকা ঘোরে। হিমালয়ের মানুষ কতকাল আগে থেকে যে জলের তোড়কে কাজে লাগাচ্ছে তার হিসেব কে নেয়। আর ওরা বানায় আটা, বিদ্যুৎ বানায় না।

জাঁতার ওপর পা দিয়ে পার হতে হল। হাতে ঘোরানো জাঁতায় ওপরের চাকি ঘোরে নিচেরটা স্থির হয়ে থাকে। জলে ঘোরানো জাঁতায় নিচের চাকি ঘোরে, ওপরেরটা স্থির হয়ে থাকে, এইটুকুই তফাৎ। পার হয়েই সিঁড়ি, পাথর সাজিয়ে দিব্যি সিঁড়ির মত করা হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘর কখানির সামনে পেঁৗছলাম।

সামনের বারান্দায় আর এক মূর্তি বসে আছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল পুরুষ, তারপর দেখলাম তিনিও নারী। যাকে বলে দশাসই নারী তাই। খাম্বাজ রাগিণীতে তিনি জানতে চাইলেন—"ভাগছিলে কেন?"

আমার পেছন থেকে জবাব হল—"বোবা বোধ হয়, কথা বলে না।"

খাম্বাজ রাগিণী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার মুখপানে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—"ঠিক আছে। থাকুক এখানে, দেখা যাক কথা বলে কি না।"

আমিও মনে মনে ঐ কথাই বললাম—“ঠিক আছে। দেখ যাক তোমাদের দৌড় কতদূর।”

ওঁদের নির্দেশমত একখানি খুপরিতে গিয়ে সেঁধুতে হল। পাহাড়ের গায়ে খোঁটা পুঁতে খুপরিগুলো বানানো হয়েছে। কাঠের মেঝে, মেঝেতে মোটা গালচে পাতা। ঘরের দেওয়ালগুলোও কাপড়-মোড়া। পরিপাটি ব্যবস্থা, প্রশংসা না করলে পাপ হবে। মনে মনে প্রশংসা কর্মটি সারতে হল।

ওঁরা মানে যাঁরা আমায় আশ্রয় দিলেন তাঁরা নিন্দা-প্রশংসার ধার ধারেন বলে মনে হল না। খুপরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে কোথায় যে অন্তর্ধান করলেন কে জানে। চুপচাপ লম্বা হয়ে রইলাম কার্পেটের ওপর। অনেকক্ষণ পরে একটা পেতলের থালায় একগাদা রুটি আর খানিকটা আলুর তরকারি নিয়ে আর এক মূর্তি উপস্থিত হলেন। ইনিও নারী, তবে মারমুখী নন। থালাখানি কার্পেটের ওপর নামিয়ে দিয়ে দু হাত জোড় করে বললেন—“বাবা শুখা রুখা—”

অর্থাৎ কি না, শুখনো এবং রুক্ষ এইটুকুই নিবেদন করছি। এই যৎসামান্য ভিক্ষা গ্রহণ করে তৃপ্ত হও।

উঠে বসে গিলতে লাগলাম। জবজব করছে ঘি, রুটি নয় চাপাটি। আলুর তরকারিটাও ঘিয়ে তৈরী।

জয় মা ভবানী। এইরকম শুখা রুখা যদি রোজ জোটাও কপালে!

বিদুর বাবা।

আজ এতদিন পরে বিদুর বাবার কাহিনী লিখতে বসে মনে হচ্ছে ওঁর দর্শনটা একবারে না পেলেই যেন জীবনটা ধন্য হত। চোখ মেলে দেখা কান পেতে শোনা চৈতন্য দিয়ে বোঝা, এবং দেখে শুনে বুঝেও বোবা কালা হয়ে থাকা কি সাংঘাতিক শাস্তি, মহাত্মা বিদুর বাবা সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, সব মতই মত সব পথই পথ। বিদুর বাবার পথটা কি জাতের পথ

তা আমি দেখেছি। ও-পথে ভগবানকে পাওয়া যায় না, শয়তানকে পাওয়া যেতে পারে। কিংবা বিন্থর বাবাই হয়ত আস্ত শয়তান, নিজের সেবা-পূজাই চালাচ্ছেন নিজের আশ্রমে। ওঁর চেলা-চামুণ্ডারা সেবার উপচার জোটাচ্ছে।

এক ভাটিয়া আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিস্তর পয়সার মালিক তিনি, বিন্থর বাবা হলেন তাঁর গুরু। বিন্থর বাবার মত হচ্ছে, একমাত্র প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপ নাশ হয়। এবং পাপ নাশ হলেই মুক্তি। অতএব প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ষোড়শোপচারে সাজানো হয়েছে বিন্থর বাবার আশ্রমে। দরকার শুধু পাপীর, কিন্তু পাপীরা তো স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করতে যাবে না সেখানে। তাই বিস্তর তোড়জোড় করে ওঁর ভক্তরা কভি কভি এক আধ জন পাপী পাঠান।

এইখানেই একটু মারপ্যাঁচ আছে। পুরুষ পাপী খুব সম্ভব সহজে জোটে না। এও হতে পারে যে বিন্থর বাবার বিচারে পুরুষে এমন কিছু পাপ করতে পারেই না যার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করার দরকার হতে পারে। যা জোটে তা হল স্ত্রীলোক পাপী। ভদ্র গৃহস্থঘরের কমবয়সী বউ-ঝি। তাদের বাপ ভাই স্বামী আত্মীয়স্বজনরা স্বেচ্ছায় তাদের বিন্থর বাবার কাছে পৌঁছে দেয়। মহানন্দে বিন্থর বাবা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে করিয়ে নিষ্পাপ করে ছেড়ে দেন।

ত্রিশ বছর আগে আমি জানতাম না যে এমন বিশ্রী জাতের রুগীও আছে যার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় কারও ওপর দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে। দৈহিক নির্যাতন কর্মটি চোখের সামনে সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হতে দেখলেও কেউ কেউ পরম পরিতুষ্ট হন। কয়েকটি প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা দোব কি না ভাবছি। যদি দিই তাহলে অনেকে শিউরে উঠবেন। অনেকে আমাকেই মারতে তাড়া করবেন অশ্লীল বর্ণনা দিচ্ছি বলে। ব্যাপারটা কিন্তু শ্লীল নয় অশ্লীলও নয়, নির্জলা বীভৎস কাণ্ড। ধর্মাচরণের নামে পাঁঠা মোষ বলি দেওয়াটাও অনেকের কাছে অতি বীভৎস ব্যাপার। আগে নরবলিও দেওয়া হত। বিন্থর বাবার

পন্থাটি একটু ভিন্ন ধরনের। ওঁর কারবার স্রেফ পাপীদের নিয়ে। এই জীবনেই প্রায়শ্চিত্ত করে পাপ নাশ করা চাই। কি ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করানো হয় তার একটি মাত্র উদাহরণ দেব।

প্রথম রাতটি ভালয় ভালয় কাটল। জবজবে ঘিয়েভাজা চাপাটি খেয়ে মোটা কার্পেটের ওপর শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিলাম। চোরের রাত্রিবাসটুকুও মস্ত লাভ। সকাল হলে সরে পড়ব এই মতলবটি মগজে রইল। ভোরবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে পা দিতেই বুঝলাম ব্যাপারটা গোলমেলে। আমাকে পাহারা দেওয়া হচ্ছে। একটা আধবুড়ো গাড়োয়ালী দরজার সামনেই বসেছিল। উঠে দাঁড়াল সে, তারপর আমার পিছু পিছু হাঁটতে লাগল। আসছে আসুক, পেছন ফিরেও তাকালাম না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম সেই জাঁতার কাছে। জাঁতার ওপর পা দিতে যাব, হঠাৎ আমার পাশ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে তাকালাম। লোকটি বলল—"ঐ ওধারে চলুন মহারাজ। জঙ্গলে যাবেন তো? খুব ভাল ব্যবস্থা আছে, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই পাহাড়ে যেখানে-সেখানে কেউ জঙ্গলে যায় না, মহাত্মাজীর হুকুম নেই।"

মহাত্মাজী! সেই প্রথম শুনলাম যে হুকুম দেনেওয়ালা একজন মহাত্মাজীও আছেন সেখানে। থাকাই উচিত। এমন একটা চমৎকার জায়গায় সেই দশাসই খাণ্ডারনী এই আশ্রম চালাচ্ছে, এটা ধারণা করাই আমার বোকামি হয়েছে। খানদানী আদবকায়দা দেখে সন্ত্রস্তও হয়ে উঠলাম একটু। রাত্রে অতিথির দরজায় চাকর বসিয়ে রাখেন যে মহাত্মাজী, তিনি নিশ্চয়ই হেঁজিপেঁজি সাধু নন। এই জাতের অতিথি সৎকার করতে পারেন রাজা-মহারাজারা। না, এ মহাত্মাটিকে একটিবার দর্শন করে না গেলে এখানে আসাই বৃথা। তাছাড়া ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে। জোর করে ধরে আনিয়ে যিনি ঐ রাজভোগ খাওয়ালেন, একটা রাত যাঁর আশ্রয়ে মোটা কার্পেটের ওপর

শুয়ে মহা আরামে ঘুমালাম, তাঁর সঙ্গে একটিবার দেখা না করে যাওয়াটা হবে চরম অভদ্রতা। না হয় মৌনব্রতই নিয়েছি, তা বলে ভদ্রতাটুকুও কি বিসর্জন দিতে হবে ?

সব ব্যবস্থাই নিখুঁত। স্নান করবার জন্যে যেখানে নিয়ে গেল, সেখানকার বন্দোবস্ত দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ওপর থেকে তোড়ে জল পড়ছে, মাথা পেতে দাঁড়ালেই হল। স্নানাদি সেরে ফিরে এলাম সেই ঘরে, খিদমতগারটি ঠিক পেছনেই আছে। একটু পরেই এল এক লোটা চা আর হালুয়া। আগের দিন যিনি চাপাটি এনেছিলেন তিনিই আনলেন। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর পানে। কোন্ দেশের মেয়ে! রাজস্থানের ? গুজরাটের ? কাথিওয়াড়ের ?

বোঝা শক্ত। চরণ থেকে কোমর, কোমর থেকে গলা, গলা থেকে মাথা, তিন ভাগ করে আদলটা মানে গড়নটা দেখলে প্রায়ই বোঝা যায় কোন্ জায়গার মেয়ে। এটা শিখতে হয় ভুবনেশ্বরের পাথুরে মূর্তিগুলো দেখতে দেখতে। খুবই সহজ, ভুবনেশ্বরীর মূর্তির পানে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকুন, তারপর চোখ বুঁজে মনে মনে একটা রেখা টানুন। ভুবনেশ্বরীর মূর্তির চারিদিকের রেখাটি আপনার মনে ঠিকভাবে আঁকা থাকা চাই। এইবার বেরিয়ে এসে ওদেশের কোনও নারীর পানে তাকান। দেখবেন, রেখা যেন হুবহু মিলে যাচ্ছে। নিচে একটা পেটমোটা কলসী, কলসীর গলা নেই। গলাহীন কলসীর ওপর আর একটি ছোট কলসী ঠিক নিচের কলসীর মত গড়ন, তবে এই দ্বিতীয় কলসীর গলা আছে। তার ওপর একটি গোল ঘট। হয়ে গেল, ঠিকঠাক সাজিয়ে নিলেই ওদেশের নারী-দেহের আদলটুকু এসে গেল। নেমে যান নিচের দিকে, মাদ্রাজে দেখবেন, বেশ বদলে গেছে রেখা। নিচের কলসীটি যেন ক্রমেই লম্বাটে হয়ে উঠছে, মাঝখানের কলসীটাও তাই, ওপরের ঘটটি আর ঠিক গোল বলে মনে হচ্ছে না। মীনাক্ষী মন্দিরের পাথরের মূর্তিগুলি একদম মানানসই বলে মনে হবে। মন্দিরে যাঁরা পূজা দিতে এসেছেন,

তাঁদের দেহের রেখাও হুবহু মিলে যাবে পাথরের মূর্তির রেখার সঙ্গে। তারপর মালাবার ঘুরে ওপর দিকে উঠতে থাকুন। পাথুরে মূর্তি বড় একটা দেখতে পাবেন না। কিন্তু নারী আছে যথেষ্ট। রক্ত-মাংসের দেহগুলির পানে তাকিয়ে মনে মনে রেখা টানুন। তফাৎটা ধরা পড়ে যাবে। ভাস্করের নজর পেয়ে যাবেন।

বাঙলা দেশের কারও দেহ নিয়ে কিছুই বলতে চাই না। কে বাবা ঝাঁটা পেটা খেতে যাবে।

আমার কিন্তু মনে হয় বাঙলা দেশের মেয়েদের গড়ন আর সিন্ধী মেয়েদের গড়ন অনেকটা যেন একই ধরনের। যাক, আর বাড়াবাড়িতে কাজ নেই। শ্লীল অশ্লীল থার্মোমিটার হাতে করে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের টেম্পার এবং টেম্পারেচার ইতিমধ্যেই হয়ত কয়েক ডিগ্রী চড়ে গেল। এখন আসল কথায় ফিরে যাচ্ছি।

যিনি চা হালুয়া নিয়ে এলেন, তাঁর চোখদুটির পানে তাকাবার সুযোগ হল। তিনিই দিলেন সুযোগ। লোটা থেকে বাটিতে চা ঢালতে ঢালতে অনেকবার আমার মুখপানে তাকিয়ে দেখলেন। মনে হল, কি যেন খুঁজছেন আমার চোখেমুখে, কিছু যেন জানতে চান, বুঝতে পারছেন না যেন কিছু। ইচ্ছে করেই একটু দেরি করছেন যেন। আগের দিন চাপাটিগুলো নামিয়ে দিয়েই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, চা হালুয়া দিতে এসে খাওয়াতে বসে গেলেন। অজুহাত অবশ্য আছে, ঘটিটা ভয়ানক তেতে উঠেছে, ঘটির মাথায় যে বাটিটা এনেছে তাতে চা ঢেলে দিতে হবে।

হল চা হালুয়া খাওয়া। সেই সঙ্গে আরও একটা বস্তু গিলতে হল। একটা সন্দেহ, সন্দেহ নয় ঠিক, একটা অস্বস্তি, যা উনি বলতে চাইছিলেন সেটা কি!

যাক গে, মহাত্মাজীকে দর্শন করে এবার বিদেয় হওয়া যাক। কোথায় আছেন মহাত্মা, সেটা জানতে পারলেই হল। জিজ্ঞাসা করার তো উপায় নেই, মুখ বন্ধ। দরকারই বা কি জিজ্ঞাসার?

ঘুরেই দেখা যাক না আশ্রমটা। ঠিকই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে। চা খেতে খেতেই মতলবটা ঠিক করে ফেললাম। যিনি চা খাওয়াতে এসেছিলেন তাঁর পিছু পিছু বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। কমণ্ডলু লাঠি কম্বল যথাসর্বস্ব হাতে নিয়েই রওয়ানা হলাম। দর্শন করেই সোজা চলে যাব।

"কোথায় যাচ্ছেন ?" পেছন ফিরে তাকিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

আমাকেও থামতে হল। জবাব না পেয়ে বললেন—"ঘরে গিয়ে বসুন, একটু পরে আপনাকে মহাত্মাজীর কাছে নিয়ে যাব। তাঁকে দর্শন না করে যাবেন কেন ?"

সামনাসামনি দাঁড়িয়েছি দুজনে, তফাৎ মাত্র এক হাত। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। ধপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল যেন তাঁর চোখদুটিতে। অদ্ভুত কায়দায় ঠোঁট নেড়ে নিঃশব্দে যা বললেন, স্পষ্ট যেন সব শুনতে পেলাম। সামান্য কথা, মাত্র দুটি কথা—"ভয় পেও না, আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দোব।"

ভেবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি চলে গেলেন। মাথা নিচু করে আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ফিরে গিয়ে ঢুকলাম আবার ঘরে। কি হয়েছে! ভয় পাবার মত কি আছে! আমাকে পথ দেখাতেই বা হবে কেন! গোলকধাঁধায় পড়ে গেছি নাকি!

গোলকধাঁধাই বটে।

ঘণ্টাখানেক পরে সেই খাণ্ডারনী এলেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। সাধু সন্দর্শনে চললাম। আরও খানিক ওপরে উঠতে হল। পেছনের ঝাউবনের মধ্যে ঢুকে দেখতে পেলাম এক অট্টালিকা। অট্টালিকাটি দোতলা, কাঠ টিন এবং কাঁচ দিয়ে বানানো। অট্টালিকায় প্রবেশ করে সত্যিই মনে হল গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছি। এ বারান্দা থেকে ও-বারান্দা, এক ঘর দিয়ে ঢুকে আর এক ঘরে পৌঁছে, নানা

রকম ছোট বড় সিঁড়ি দিয়ে উঠে নেমে পোঁছলাম গিয়ে যথাস্থানে। লাল নীল সবুজ হলদে নানা রঙের কাঁচ দিয়ে ঘেরা লম্বা চওড়া একটা হলঘর। আগাগোড়া বাঘছাল দিয়ে মোড়া সেই হলের শেষপ্রান্তে গদি। গদিতে মহাপুরুষ আসীন হয়ে আছেন। তাঁর সামনে পোঁছতে হলে জোড়া জোড়া বাঘের মাথার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ঘরের মেঝেয় কার্পেটের ওপর বাঘছালগুলো পাতা হয়েছে এমন কায়দায় যেন ছু-দল বাঘ পাশাপাশি পড়ে আছে মুখোমুখি হয়ে। সেই ছু-সাড়ি মুখের মাঝখান দিয়ে হাত ছুই চওড়া পথ সোজা দরজা থেকে গিয়ে পৌঁছেছে মহাপুরুষের গদির সামনে। যার নাম জাঁকাল কাণ্ডকারখানা, সন্ত্রাস না জাগুক সমীহ জাগবেই।

সন্ত্রাস সমীহ বিলকুল ঘুচে যাবে কিন্তু মহাপুরুষের সামনে পোঁছলে। আস্ত নরপিশাচ, আস্ত নরপিশাচ একটি বসে আছে গেরুয়া পরে ভেলভেট মোড়া গদিতে। একটা গোলাকার পদার্থ, ঘাড় নেই বললেই চলে, মাথাটা ঢুকে গেছে ধড়ের ভেতরে, একটা বিশাল আকৃতির ওলের ওপর একটা গোলাকার গ্যাঁজ গজিয়েছে যেন। সেই গ্যাঁজের ওপর আবার রাশিকৃত কোঁকড়ানো চুল। নিশ্চয়ই ভয়ানক কড়া চুল, সিংহের কেশরের মত ফুলে আছে। লক্ষ্য করে দেখলাম হাতও আছে ছুটো, সে ছুটোকেও ওলের গায়ে লম্বা গ্যাঁজের মত মনে হল। রঙিন কাঁচের ভেতর দিয়ে নানা রঙের আলো এসে পড়েছে সেই ওলটার ওপর, তাই সেটার আসল রঙ কি বোঝবার উপায় নেই। কেশরের ভেতর থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার পানে তিনি তাকিয়ে রইলেন। ভয়ঙ্কর হিংস্র জাতের একটা পিশাচ, বাঘগুলোকে সাবাড় করে নতুন শিকারের আশায় ওত পেতে বসে রয়েছে যেন। দেয় বুঝি ঝাঁপ ঘাড়ের ওপর!

বিত্তুর বাবা। ভয়ঙ্কর নামজাদা মহাপুরুষ। কচ্ছ সিন্ধু কাথিওয়ার অঞ্চলের হিন্দু জৈন এমন কি পারসী সম্প্রদায়েরও বিরাট বিরাট ধনীদের পরম পূজ্য গুরুদেব। অনেক পরে যখন জুনাগড়ে যাই তখন

জানতে পারি ওঁর প্রতাপ। ধনাদের ঘরে ওঁর ফোটোর সামনে নিত্য উপাসনা করা হয়। প্রচুর ধন উপার্জন করতে হলে প্রচুরতর পরিমাণে পাপ অর্জন না করে উপায় নেই। বিদুর বাবা শিষ্যদের অর্জিত পাপ গ্রহণ করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। ব্যবস্থাটি হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তের বিধি-বিধানগুলিও বিদুর বাবার দ্বারা রচিত। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, পাপের ওজন হিসেবে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নয়। পাপীর ওজনে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। অর্থাৎ যে পাপী মণ মণ স্বর্ণ উপার্জন করেন তাঁর প্রায়শ্চিত্তের ওজন তত বেশী সূক্ষ্ম হবে।

ওসব উচ্চাঙ্গের আলোচনা থাকুক। বিদুর সংহিতার ভাষ্য লিখতে বসি নি আমি। আমার কপালে কি জাতের প্রায়শ্চিত্ত লেখা ছিল সেটা শোনাই।

আমার পানে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা বিরাট শব্দে হাসি জুড়ে দিলেন মহাপুরুষ। একটা টিনের কানেস্তারার গায়ে এলোপাতাড়ি বাড়ি পড়তে লাগল যেন। তারপর শোনা গেল বাণী, সেও এক সাংঘাতিক জাতের নাদ। নাদ নয় আর্তনাদ। নাকি-সুরে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে যেন কেউ নরকের ভেতর থেকে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বোঝবার চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা। সবকিছুই চৈতন্য দিয়ে বোঝা চাই। যা বুঝলাম তা হচ্ছে এই—আমার মত মহাপাপী নাকি একটিও নেই। আমার প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। মৌনব্রত অবলম্বন করে আমি প্রায়শ্চিত্তকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছি। আমাকে অকপটে স্বীকার করতে হবে মহাপুরুষের কাছে কি কি পাপ আমি করেছি। তারপর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হবে। কোনও ভণ্ডামি খাটবে না তাঁর কাছে। কি করে মুখ খুলতে হয় তা তিনি জানেন।

আরও বহু কিছু বলে গেলেন বিদুর বাবা। সব কথা কানেও ঢুকল না। ভাবছি তখন আমাকে কৃপা করবার জন্যে এতটা গরজ কেন ওঁর।

গরজটা কার বুঝতে পারলাম সঙ্গে সঙ্গে। পেছন থেকে খাণ্ডারনী কি যেন বলে উঠলেন। তখন বুঝতে পারি নি, এখন বুঝি যে সিন্ধী ভাষায় কথা বলছিলেন তিনি বিদুর বাবার সঙ্গে। ভাষা না বুঝলেও ব্যাপারটা সেঁধুলো মগজে। তখন খাণ্ডারনীর চোখ মুখ সর্বাঙ্গ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে যেন। কিসের আগুন ?

বিদুর বাবা প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠলেন। খাণ্ডারনী একটু পিছিয়ে গেল। বাবা তখন হিন্দী ভাষায় আমাকে বললেন—"একটা প্রায়শ্চিত্ত তুমি দেখবে এখন। স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রায়শ্চিত্ত। কত বড় সাধু তুমি তাও দেখা যাবে। ঐখানে বসে দেখ।"

পেছন থেকে খাণ্ডারনী হিন্দীতে বলল—"বদমাশি কর যদি, মনে রেখো আমি পেছনে আছি।"

দৈহিক নির্যাতন। এমন বিশ্রী জাতের মানসিক রুগী আছে দুনিয়ায় যাদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় নিজের দেহের ওপর নির্যাতন করে। তার চেয়ে বিশ্রী রুগীও আছে, যাদের ঐ প্রবৃত্তিটা চরিতার্থ হয় অপরের দেহের ওপর নির্যাতন করে। বিদুর বাবা তার চেয়ে খারাপ রুগী। তাঁর কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় তাঁর চোখের সামনে যদি দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। বিদুর বাবার দুটি পা শুখিয়ে কাঠি হয়ে গেছে। কুঁচকি থেকে পাতা পর্যন্ত চামড়া ঢাকা হাড়। ওঁর ভক্তরা বিশ্বাস করে যে যুগযুগান্ত একাসনে বসে তপস্যা করার ফলে ঐ দশা হয়েছে ওঁর। কাজেই উঠতে পারেন না, হাঁটতে পারেন না, এবং বহু কিছুই করতে পারেন না। ওঁর পক্ষে নিজের হাতে বা নিজের সেই কিম্ভূতকিমাকার শরীর দ্বারা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা একেবারে অসম্ভব। এইটুকু মনে রাখলেই সহজে বোঝা যাবে ব্যাপারটা। বোঝবার পরে ওঁর ওপর রাগও হবে না ঘৃণাও হবে না। উল্টে হয়ত সহানুভূতিই জাগবে মনে। সহৃদয় মানুষে হয়ত বিদুর বাবার জন্যে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসবেন।

আমি কিন্তু ক্ষেপেই গিয়েছিলাম প্রায়। তবে শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছিলাম সেই নিদারুণ পরীক্ষায়। চোখের সামনে একটা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের নারীকে উলঙ্গ করে আর দুটি নারী পিটতে লাগল। চড় কিল লাথি চুল ধরে টানাটানি খামচানি, বিদুর বাবার নির্দেশে দেহের বিশেষ বিশেষ স্থান ধরে মোচড় দেওয়া, বহুক্ষণ ধরে চলতে লাগল সেই বীভৎস কাণ্ড। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে নারীটি চোখ বুঁজে মুখ টিপে সমস্ত সহ্য করলে। আমি তাকিয়ে রইলাম বিদুর বাবার পানে। নরপিশাচকে চাক্ষুষ দেখলাম। পৈশাচিক তৃপ্তিতে সেই পিশাচের কুৎসিত দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। কি করে যে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম সেই পরীক্ষায় আজ তাই ভাবি মাঝে মাঝে। ক্ষেপে উঠে সেই পিশাচের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ি নি। কিছুই করি নি, এমন কি আমার সামনে যা ঘটছিল তাও দেখি নি। বিদুর বাবার পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্য একটা ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম। ঐরকম একটা পৈশাচিক প্রবৃত্তি আমার ভেতরেও তো লুকিয়ে থাকতে পারে! তারপর আর ষোল আনা হুঁশ ছিল না। বুঝতেও পারি নি, কখন ঘরে ফিরে এলাম। কারা বা কে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল ঘরে টেরও পাই নি। সম্পূর্ণ সজাগ হলাম আবার খাবার আসতে। সেই চাপাটি আর আলুর তরকারি এল। যিনি নিয়ে এলেন তিনি তাঁর সেই অদ্ভুত কায়দায় শুনিয়ে দিলেন—"তৈরী থেক, ঠিক সময় তোমাকে রাস্তা ধরিয়ে দোব।"

যশোমতী পারেখ গুজরাটের কন্যা। ওর পরিচয় দিতে হবে এখন। যশোমতীর চেহারাটা মনে করতে চেষ্টা করছি। শীতের ভোরে চলন্ত ট্রেনে বসে জানলা দিয়ে দূরে মাঠের মধ্যে কাউকে দেখছি যেন। কুয়াশা ঘেরা একটি মূর্তি, মূর্তিটি যে নারীর এইটুকুই বোঝা যাচ্ছে। ত্রিশ বছর আগে বিশ কি পঁচিশটা দিন এবং রাত যশোমতীর সঙ্গে কেটেছে। দয়াহীন ক্ষমাহীন হিংস্র নীলকণ্ঠ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন শাস্তি দিতে আমাদের। গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের গর্তে লুকিয়ে গাছের পাতা চিবিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে। আর সেই সঙ্গে সদাসর্বক্ষণ মর্মে মর্মে অনুভব করেছি যে বেঁচে আছি। প্রজ্ঞানাথজী জানতে চেয়েছিলেন, সজ্ঞানে কতখানি সময় বেঁচে থাক। যশোমতীর সঙ্গে দেখা হবার পর, বিশ-পঁচিশটা দিন এবং রাত যশোমতীর সঙ্গে কাটাবার পর ঐ প্রশ্নটা করলে অনায়াসে বলতে পারতাম যে এ জীবনে বিশ-পঁচিশটা গোটা গোটা দিন রাত সম্পূর্ণ সজ্ঞানে বেঁচে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। সেজন্যে কায়দা করে শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নজর রাখতে হয় নি, নীলকণ্ঠ স্বয়ং যা করার করেছেন, সদাসর্বক্ষণ চিবিয়ে চিবিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বেঁচে থাকাটা কি মর্মান্তিক পরিহাস।

আমাকে উদ্ধার করেছিল যশোমতী। কেন সে নিতে গিয়েছিল অত বড় ঝুঁকিটা তা জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। মুখ বন্ধ, ইশারা করে কিছু জানতে চাওয়াও নিষেধ। নিজে থেকে যা আমায় শুনিয়েছিল যশোমতী সেইটুকুই আমার সম্বল। তা থেকে যা জানতে পেরেছিলাম সেটা এখনও পর্যন্ত হুবহু মনে আছে। কারণ সেটা যশোমতীর পরিচয় নয়, আমার নিজের পরিচয়। আমার আসল রূপটা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল যশোমতী। সেই বীভৎস রূপটা দেখে এমনই

আঁতকে উঠেছিলাম যে অন্য কোনও দিকে তাকাবার ফুরসৎ পাই নি। তাই যশোমতীর চেহারার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। যদি কোনও জাদুমন্ত্রবলে ত্রিশ বছর পিছিয়ে গিয়ে ত্রিশ বছর আগের সেই লেলিহান নজর আবার ফিরে পাই আমি আর ত্রিশ বছর আগে যে রকমটি ছিল যশোমতী সেই রকমটি হয়ে হাজির হয় আমার সামনে তাহলে কি তাকে চিনতে পারব! না, কিছুতেই নয়। যশোমতীর সঙ্গে দেখা হবার পরে লক্ষ কোটি নারী এই নজরের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে কজনের চেহারার বর্ণনা দিতে পারি আমি!

ফাঁকিটা এত দিন পরে ধরতে পারছি যেন। যশোমতী আমাকে ফাঁকি দিয়েছিল। ভয়ানক রকম ভয় পাইয়ে দিয়েছিল আমার আসল রূপটা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে। আর সেই ফাঁকে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। বিদুর বাবার খপ্পর থেকে আমাকে উদ্ধার করার গরজে ঠিক সময়ে রাস্তা ধুরিয়ে দিতে আসে নি যশোমতী, নিজেকে উদ্ধার করার গরজে অত বড় ঝুঁকিটা নিয়েছিল। এত দিন পরে ধরতে পারছি ওর চালাকিটা। আপসোস হচ্ছে, হাসিও পাচ্ছে। সাংঘাতিক ভয় পেলে কি সাংঘাতিক রকম বোঝা হয়ে পড়ে মানুষ, এইটে বুঝতে পারছি বলে হাসিও পাচ্ছে।

সাংঘাতিক ভয়ই পেয়েছিলাম। লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করছি, ভয় পেয়েছিলাম জলজ্যান্ত সেই খাম্বাজ রাগিণীটিকে। খাণ্ডারনীর চোখে মুখে একটা আগুন দেখেছিলাম, আমার পানে তাকিয়ে তাঁর নোলা দিয়ে লালা গড়াচ্ছিল যেন। বাঘিনী বোধ হয় ঐভাবেই খোঁটায় বাঁধা শিকারের পানে তাকায়। কেন জানি না, আমার ধারণা হয়েছিল যে আমার মুখ খোলবার ভারটা সেই খাণ্ডারনীর হাতেই পড়বে। ফলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে তা অবশ্য সঠিক আন্দাজ করতে পারি নি। সে প্রয়োজনও ছিল না। সেই বিশালাকৃতি নারী

আমাকে হাতে না পায় সেই চিন্তাতেই প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম। যশোমতী পারেখ সেটা বুঝতে পেরেছিল। ভয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়েছিলাম আর এক নারীর পিছু পিছু। একটি বারের জন্যে সন্দেহ হয় নি যে বাঘিনীর খপ্পর থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে এমন একজনের খপ্পরে পড়ছি যে সমানে বিশ-পঁচিশ দিন অহর্নিশ মনে করিয়ে দেবে যে সে একটি নারী। এবং নারীর জন্যে বা সোজা কথায় নারীদেহের জন্যে একটা দুর্দান্ত পিপাসা আমার ভেতর ঘাপটি মেরে আছে, এই মূল্যবান জ্ঞানটুকু যত রকম উপায়ে সম্ভব আমার মগজে ঢুকিয়ে না দিয়ে ছাড়বে না।

যশোমতী পারেখ গভীর রাত্রে তৈরী হয়ে এসে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। অপেক্ষা করতে করতে তখন নাড়ী ছাড়বার মত দশা হয়ে উঠেছে আমার, হাতে স্বর্গ পেলাম যেন। এক মুহূর্ত দেরি সইছে না তখন, কোনও রকমে বিদুর বাবার আশ্রয় থেকে মুক্তি পেলে বাঁচি। বেরিয়ে পড়লাম ওর পিছু পিছু। বাইরে কম্বল মুড়ি দিয়ে সেই বুড়ো গাড়োয়ালী ঢুলছিল। ঘরের বাইরে পা দিতেই সে উঠে দাঁড়াল। যশোমতী তার কাছে এগিয়ে গিয়ে কি যেন বলল। লোকটি আবার বসে পড়ল। বারান্দা থেকে নেমে আমরা দুজনে অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম। সত্যিই হারিয়ে গেলাম যেন। যার পিছু পিছু এলাম সে কোথায় গেল ঠাহর করতে পারলাম না। ভয়ঙ্কর অবস্থা, অন্ধকারে কোন্‌দিকে যাই তখন! পা তোলবার শক্তি হারিয়ে পাথরের মত খাড়া হয়ে রইলাম।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত সেই ভয়াবহ অবস্থায় কাটল। তারপর টের পেলাম আমার গায়ের কম্বল ধরে কে যেন টানছে। ধড়ে প্রাণ এল। আমার ডান হাতে লাঠি বাঁ হাতে কমণ্ডলু। লাঠিটাও বাঁ হাতে নিলাম। যে আমার কম্বল ধরে টানছিল তাকে ধরে ফেললাম ডান হাত বাড়িয়ে। সামান্য একটু শব্দ কানে গেল, মনে হল যেন হাসির শব্দ। চোখ বুজে পা চালাতে লাগলাম তারপর, কোথায় ফেলছি পা দেখবার উপায়

নেই। অন্ধকার, এমন নিরেট অন্ধকার যে শাবল চালালেও ছেঁদা করা যাবে না। সেই নিরেট অন্ধকার ভেদ করে অনায়াসে এগিয়ে চলেছি, ডান হাতের মুঠোয় রয়েছে একটা সরু কবৃজি। কখনও উঠছি ওপর দিকে, কখনও নিচের দিকে নামছি। ভয় ভাবনা উৎকণ্ঠা বিলকুল লোপ পেয়েছে তখন, মন বুদ্ধি আঁধারে তলিয়ে গেছে। মহর্ষি বেদব্যাস বলে গেছেন—"রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং"—অতএব রূপহীন রূপকে ধ্যানের দ্বারা খুশি মাফিক রূপ দিলেই বা কার কি বলবার আছে।

মনের আঁধার বাইরের আঁধার নির্ভেজাল আঁধার দিয়ে গড়ে তুললাম এক মূর্তি। না হল না, সর্বাগ্রে তৈরী হল চুল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঢাকা পড়ল চুলের আড়ালে। তারপর আস্তে আস্তে ফুটে উঠল আমার মানসী প্রতিমাখানি সেই নিবিড় অন্ধকার চুলের রাশির মাঝখানে। অন্ধকার চুল ছড়িয়ে রয়েছে পেছনে আর অন্ধকারের চেয়ে শত সহস্রগুণ কালো এক মূর্তি ফুটে উঠেছে সেই চুলের ওপর। সর্ববর্ণ বিলীন হয় কালো বর্ণের ভেতর, সেই সর্ববর্ণাতীত বর্ণ যাঁর তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।

কোথায় ?

কোথায় আবার, করাল বদন গহ্বরে, যেখানে পৌঁছতে পারলে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। করাল গ্রাসের ভেতর ঢুকতে পারলে একদম নিশ্চিন্ত।

এই ফাঁকে কয়েকটি কথা বলে ফেলি। অনেকে জানতে চান, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়টা শ্মশানে মশানে পাহাড়ে জঙ্গলে কাটিয়ে কি পেয়েছি আমি। কেউ কেউ সোজা কথায় জিজ্ঞাসা করে বসেন—"সাক্ষাৎ দর্শন লাভ কি সত্যিই হতে পারে?" সাধারণ সুখ দুঃখ আশা নিরাশা নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখে জীবনটা নষ্ট করছি আমি, এজন্যেও বহু সুধীজন আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। কিন্তু করি কি আমি! কি উপায়ে বোঝাব আমার বক্তব্য!

যদি বলি, পাহাড়ে জঙ্গলে শ্মশানে মশানে নিবিড় আঁধারে নিজেকে হারিয়ে ফেলে বহুবার উপলব্ধি করেছি সর্ববর্ণের অভাব বলতে কি বোঝায়, এবং ঐতেই আমার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়ে গেছে তাহলে কি কেউ সন্তুষ্ট হবেন ?

যদি বলি, নীলকণ্ঠের স্বরূপ জানতে হলে সর্বাগ্রে ব্রাহ্মীশক্তি স্বরূপা সৃষ্টিনিরতা মহাশক্তির লীলা যেখানে ঘটছে সেই মহাযোনি-পীঠে সাধনা করা প্রয়োজন, তারপর বৈষ্ণবীশক্তি-স্বরূপা পালনরতা মহামায়া যেখানে পালনক্রিয়া সম্পন্ন করছেন সেই পীনোন্নত পয়োধরের সুধা পান করা প্রয়োজন, সর্বশেষে করালবদনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করছেন যেখানে সেখানে পৌঁছনো প্রয়োজন, তাহলে কে কি বুঝবেন !

যদি বলি, অবিরাম সৃষ্টি পালন এবং সংহার চলছে যেখানে, সেখানেই তো মহাশক্তির লীলা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এর বাইরে মনগড়া একটা আজগুবী জগতে কাকে খুঁজতে যাব ! ইষ্ট-দেবীর সাক্ষাৎ পাবার আশায় তাই আমি নীলকণ্ঠের অন্তরে খোঁজ করেছিলাম। তিন-তিনটে বছর মৌনব্রত অজগরব্রত পক্ষীব্রত নিয়ে অর্থাৎ নিজেকে একটা দুর্ভেদ্য বর্মের মধ্যে পুরে চোখ মেলে দেখেছি কান পেতে শুনেছি আর চৈতন্য নিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি। ফলে এইটুকুই বুঝেছি যে জীব মাত্রেই অষ্টপাশে আবদ্ধ।

ঘৃণালজ্জাভয়ং শোকোজুগুপ্সা চেতিপঞ্চমী।
কুলং শীলং তথাজাতিরষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥

ঘৃণা লজ্জা ভয় শোক নিন্দা কুল শীল জাতি এই আটটি পাশকে ভয়ানক রকম সার্থক ভাবে চিনতে পেরেছি নীলকণ্ঠের কৃপায়। শুধু জানা হয় নি কি উপায়ে ঐ অষ্টপাশ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

বর্ণহীন অন্ধকার ফিসফিস করে কথা বলে উঠল—"হাত ছেড়ে দাও।"

ষোল আনা সজাগ হয়ে উঠলাম তৎক্ষণাৎ, হাতের মুঠো আরও শক্ত হয়ে গেল।

"উঃ লাগে। আচ্ছা বেকুফ তো! সাধু হয়েছ না! স্ত্রীলোক স্পর্শ করা তোমার পক্ষে মহাপাপ।"

কব্জিটা ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজে কাঁধটা খামচে ধরলাম। স্ত্রীলোকটি চটে উঠল না, অদ্ভুত একটু আওয়াজ করে হেসে উঠল যেন। বুঝতে পারলাম, আরও কাছে সরে এসে আমার বুকের সঙ্গে লেপটে দাঁড়াল। খুবই ক্লান্ত স্বরে বলল—"এখন খানিক বসলে হয়। আর পারা যাচ্ছে না।"

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাঁধ ছেড়ে দিয়েছি তখন। কি দরকার খামচে ধরে থাকবার, আমার বুকের ওপরেই তো হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পরে একটা হাই তুলে বলল—"চল আরও খানিক ওপরে, ভৈরোঁনাথের স্থানে গিয়ে বসব, ওখানটা বেশ ফাঁকা। এই অন্ধকারে বসে পড়া ঠিক হবে না, কত জাতের পোকামাকড় যে আছে জঙ্গলে।"

বুকের ওপর থেকে দেহের ভারটা একটু হালকা হল। তৎক্ষণাৎ আবার কব্জিটা ধরবার জন্যে হাতড়াতে লাগলাম। যদি সরে পড়ে!

না, সরে পড়বার পাত্রী নয়। আমার হাতখানা ধরে ফেলে বলল—"ভয় পাচ্ছ কেন, পালাব না। যাব কোথায়? ওখানে ফিরে গেলে কি আর রক্ষে আছে। যে লোকটা তোমাকে পাহারা দিচ্ছিল সে এতক্ষণে জানিয়ে দিয়েছে যে যশোমতীবাঈ সাধুটাকে বার করে নিয়ে গেছে মহাত্মাজীর সামনে হাজির করবে বলে। জানালেও ক্ষতি নেই, এই অন্ধকারে এমন কেউ নেই ওখানে যে আমাদের ধরতে বেরুবে। অন্ধকারে বেরুবার দরকার পড়লে আমাকেই বেরুতে হয়। এইবার বুঝবেন সবাই, যশোমতী পারেখ না থাকলে কি করে চলবে বিদুর বাবার আশ্রম দেখা যাবে। এত হেনস্তা আমাকে! আমি কেউ নই, ঐ ভক্তিঝাটাই সব। গতর নাড়তে পারে না, বসে বসে গিলছে

আর জুলুম চালাচ্ছে। অনেক দিন পরে একটা পুরুষমানুষ পেয়ে শয়তানী ভারী খুশী হয়ে উঠেছিল। কাল বা পরশু তোমার পরীক্ষা হত, বিদুর বাবার সামনে ঐ নচ্ছার মাগী তোমাকে থেঁতলাত। কতক্ষণ তুমি মুখ বন্ধ করে থাকতে পার তাই দেখত ওরা। ঐ রাক্ষুসীর জালার মত পেটে এমন সব মতলব আছে যে ঠিক কথা বলে ফেলতে। কিন্তু সত্যিই কি তুমি কথা বলবে না? মুখে কিছু নাই বা বললে যদি তোমার গুরুর বারণ থাকে। ইশারাও তো করতে পার। গুঁড়া নও তুমি, গুঁড়া হলে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে। নিশ্চয়ই মৌনব্রত নিয়েছ। মৌনব্রত নিলেও তো মহাত্মারা ইশারা করেন।"

হাঁটছি তখন আবার দুজনে। যশোমতী পারেখ আমার হাত ধরে আছে। দুটো নাম জানতে পেরেছি তখন। যাঁর আশ্রমে গিয়ে পড়েছিলাম সেই মহাত্মার নাম বিদুর বাবা এবং যিনি আমাকে বিদুর বাবার কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁর নাম যশোমতী পারেখ। যথেষ্ট জানা গেছে। ধৈর্য ধরে থাকতে পারলে আরও অনেক কিছুই জানা যাবে হয়তো। ধৈর্য ধরতেই হবে, নিবিড় অন্ধকারে কোনও কিছুই যখন ধরতে ছুঁতে পারা যায় না তখন একমাত্র অবলম্বন ধৈর্য।

হিমালয়ে অসংখ্য ভৈরোঁনাথের স্থান আছে। আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে যেমন রয়েছে বাবাঠাকুরের তলা তেমনি ধরনের ব্যাপার অনেকটা। ঝড় জল বরফ পাহাড়ের ধ্বস বহু রকমের দুর্যোগ দুর্বিপাকের সঙ্গে হামেশা মোকাবিলা করে বেঁচে থাকতে হয় যাদের তারা ভয়াল ভৈরবের কাছে মাথা ঠুকবেই। প্রকৃতি দেবীর দক্ষিণা-মূর্তিকে ওরা চেনে না, জননীর দংষ্ট্রা করাল বদনকেই ওরা চেনে, পীনোন্নত পয়োধরের খোঁজ রাখে না। বাঙলায় ছিল সাপ বাঘ ঠেঙারে ঠগী ওলাওঠা ম্যালেরিয়া নায়েব গোমস্তা। অতগুলো দুশমনের সঙ্গে লড়বার জন্যে মদৎ যোগাবে কে! বিশেষতঃ ভূত পেত্নী কবন্ধ পেঁচো যাদের দেখা যায় না চেনা যায় না ধরা যায় না, তেমনি সব

শত্রুদের শায়েস্তা করতে হলে বাবাঠাকুর ধম্মঠাকুর পাঁচুঠাকুরদের চাই-ই চাই। বহু কাল ধরে ওনারা বাতাসা ফুল বেলপাতা কাঁচা দুধ পাঁঠা কবুতর ঘুষ নিয়ে দিব্যি চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু এখন ওঁনাদের ঘোর দুর্দিন পড়েছে। গাঁয়ে গাঁয়ে বাস লরি পৌঁছছে, সর্বত্র ছেলে-মেয়েদের স্কুল খুলে গেছে, ভূত-পেত্নীদের অন্ধকার রাজত্বে ইলেক্‌ট্রিকের তার পৌঁছে যুগযুগান্তের অজ্ঞতাকে চার হাজার চারশ ভোল্টে তড়িতাহত করে ছাড়ছে। আর ওধারে ব্লক আপিসের দিদিমণিরা তো রয়েছেনই। এত বিপদে কি আর ধম্ম থাকে।

ত্রিশ বছর আগে কিন্তু সর্বত্র ধম্ম ছিল। হিমালয়ে যাঁরা জন্মাতেন তখন—ধম্ম মানতে মানতে তাঁদের অস্থিচর্মসার হত। অসংখ্য ভৈরোঁনাথরা তাই হিমালয়ে যত্রতত্র দিব্যি জামিয়ে বসেছিলেন।

যশোমতীর সঙ্গে যে ভৈরোঁনাথের স্থানে গিয়ে পৌঁছুলাম সেটির একটু বিশেষত্ব আছে। তাঁর কৃপায় বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব ঘোচে। ফাগুন পূর্ণিমায় বিরাট মেলা জমে সেখানে, বহু দূরের বস্তি থেকে বন্ধ্যারা এসে জোটেন। পাঁঠা কবুতর এন্তার বলি হয়। একটা বিতিকিচ্ছি গন্ধে দম আটকে এল।

আমার কানের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে যশোমতী ভৈরোঁনাথের মহিমা শোনাতে লাগল। জায়গাটায় গাছপালা নেই, ওপরে আকাশ দেখা যায়, তাই অন্ধকার অনেক কম। এধারওধার তাকিয়ে বসবার মত জায়গা খুঁজতে লাগলাম। কয়েক হাত সামনে একটা উঁচুমত পাথর দেখে এগিয়ে গেলাম। সেটার কাছে পৌঁছে নিচু হয়ে হাত বুলিয়ে দেখে নিলাম ওপরে কিছু আছে কিনা। তারপর পড়লাম বসে, পা দুখানাকে খানিক রেহাই দেওয়া যাক।

বসে পড়ে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে যশোমতী। কি ব্যাপার? এগিয়ে এসে বসে পড়ছে না কেন? বসে পড়বার জন্যেই যখন এখানে আসা হল—

একটু একটু করে কাছে সরে এল যশোমতী। হাতখানেক

তফাতে দাঁড়িয়ে বলল—"উঠে এস শিগ্‌গির, উঠে এস। কি সর্বনাশ করলে? ভৈরোঁনাথের মাথার ওপর বসে পড়লে?"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। আরে ছি ছি ছি ছি! ঠাকুর দেবতার মাথায় চড়ে বসেছি একেবারে!

ভৈরোঁনাথ বোধহয় আমোদ পেলেন খুব। হুম্ হুম্ করে গুরুগম্ভীর আওয়াজ উঠল কোথায়। দৌড়ে এসে যশোমতী আমার গায়ের সঙ্গে লেপটে দাঁড়াল। আমার বুকের ওপর মুখ চেপে ফিস ফিস করে বলল—"বাঘেড়া বাঘেড়া।"

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম নারীদেহটি তখন থরথর করে কাঁপছে।

অল্প অল্প ফরসা হয়ে উঠেছে তখন। বসে আছি ভৈরোঁনাথের স্থানে। যশোমতী ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ডান দিকটা চেপে বসে আমার ডান কাঁধের ওপর মুখ রেখে ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস যেভাবে পড়ে সেইভাবে পড়ছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস। একখানা কমলা রঙের আলোয়ান জড়ানো রয়েছে ওর গায়ে। একটা হাতের আঙুল থেকে কব্জি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে শুধু। আধ আঁধারেও বোঝা গেল যে দস্তুরমত ফরসা রঙ, একটু যেন লালচে আভা ফুটে উঠেছে ফরসা রঙের ভেতর থেকে। সেটুকুও ঢেকে দিলাম ওর আলোয়ানে। যা ঠাণ্ডা, কালিয়ে যাবে যে হাতখানা।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা উদয় হল মাথায়। আমার কম্বল-খানা দিয়ে ওকে ঢেকে দিলে কেমন হয়! ঐ পাতলা আলোয়ানে কতটা ঠাণ্ডা আটকাবে। একখানা কম্বল আনলে না কেন সঙ্গে। বিনা কম্বলে বাঁচবে কেমন করে। জন্মের শোধ বিদেয় হয়েই আসছ যখন তখন একটা কম্বল আনলে আর কি এমন মহাপাতক ঘটত। মহা হাঙ্গামায় পড়া গেল দেখছি। বিরাট এক দায়িত্ব চাপল ঘাড়ে। একে খাওয়াতে হবে, ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাতে হবে, পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে হবে। এইভাবে কত দিন যে কাটাতে

হবে তাই বা কে জানে। কি মতলব করেছে জানি.না, কোথায় চলেছে আমাকে নিয়ে তাও বুঝতে পারছি না। ভোর হচ্ছে, দিনের আলো উঠলেই বিদুর বাবার চর-অনুচরেরা নিশ্চয়ই খুঁজতে বেরুবে আমাদের। বিদুর বাবার আশ্রম থেকে বেশী দূরে পৌঁছুতে পারি নি নিশ্চয়ই। যদি কেউ খুঁজতে খুঁজতে চলে আসে এদিকে তাহলে কি হবে? এইবেলা আরও খানিক এগোতে পারলে তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। ওকে জাগাবার জন্যে সরে বসতে গেলাম, ঘুমন্ত মানুষের সজাগ হাত দুখানা তৎক্ষণাৎ আমাকে আঁকড়ে ধরল। নিমেষের মধ্যে কালো পর্দাখানা উধাও হয়ে গেল আমার চোখের সামনে থেকে, সাদা চোখে পরিষ্কার দেখতে পেলাম সব কিছু, সন্দেহ দ্বিধা আন্দাজ বেআন্দাজ করার মত এতটুকু আবরণ রইল না। ফাঁদে পড়ে গেছি, বিদুর বাবার ফাঁদ থেকে উদ্ধার পেতে গিয়ে আর একটা জটিল ফাঁসে মাথা গলিয়ে দিয়েছি। আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম। মিনিট দুয়েক পরে যশোমতী পারেখ আমার কাঁধের ওপর থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল। সেই সঙ্গে ওর হাত দুখানাও খসে পড়ল আমার গা থেকে। আড়ামোড়া খেয়ে হাই তুলে চোখ মেলল। ওপর পানে তাকিয়ে বলল—"সকাল হয়ে গেল যে। চল পালাই এখান থেকে, আরও দেরি করলে বিপদ ঘটবে। কাছাকাছি অনেক বস্তি রয়েছে, বস্তির লোকেরা আমাকে চেনে। দুপুর পর্যন্ত চড়াই ভাঙতে হবে। এই পাহাড়ের মাথায় চড়তে হবে। আগাগোড়া জঙ্গল, জঙ্গলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। এদিকটা আমি ঘুরে দেখেছি; অনেকবার নাগ মহারাজের আশ্রমে গেছি। নাগ মহারাজ যদি থাকেন তাহলে আর আমাদের কষ্ট করতে হবে না। তাঁর কাছে আশ্রয় পাব। ওখান থেকে সোজা নেমে গেলে গঙ্গার ধারে পৌঁছনো যায়। গঙ্গা পার হয়ে ত্রিযুগীনারায়ণ যাবার রাস্তা আছে শুনেছি। কোনও রকমে ত্রিযুগীনারায়ণ পৌঁছতে পারলেই হল। তারপর যা করেন বাবা কেদারনাথজী।"

দু-হাত জোড় করে পরম ভক্তিভরে বাবা কেদারনাথজীকেই বোধ হয় একটি প্রণাম নিবেদন করল। উঠে পড়লাম। ভৈরোঁনাথকে পাশ কাটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম আবার। উঠতে লাগলাম ওপর দিকে। ঠিক দু-হাত সামনে রয়েছে যশোমতী, অদৃশ্য একটা শক্ত শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে যেন আমাকে। কোথায়? জাহান্নমে? পৌঁছতে গেলে কি ওপর দিকে উঠতে হয়!

তারপর বিশ-পঁচিশ বার সূর্য উদয় হলেন এবং অস্ত গেলেন। অস্ত গেলেন আবার যথানির্দিষ্ট ক্ষণে উদয় হবার জন্যে। সেই সুদীর্ঘ সময়টার যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য শোনাবার জন্যে যদি চেষ্টা করি তাহলে হয়ত পাগল হয়ে যাব। যাঁরা ওটা খুঁটিয়ে পড়বার চেষ্টা করবেন তাঁরাও হয়ত খেপে উঠতে পারেন। অতএব ও চেষ্টায় এখানেই ক্ষান্ত দিচ্ছি। কিন্তু এটুকু যদি না বলি যে কি দিয়ে গেল আমাকে যশোমতী তাহলে বেইমানি করা হবে। বেইমানি করা হবে নিজের সঙ্গে, ঠকানো হবে তাঁদের যাঁরা এই লেখা পড়বেন, আর চরম নিমকহারামি করা হবে যশোমতীর সঙ্গে যে যশোমতী আমাকে জীবনের চরম সত্যটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়ে দিয়ে বিদেয় নিয়েছে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা ঝড় ঝঞ্ঝা সাপ বাঘ জঘন্যতম বিপদাপদের মধ্যেও অনুক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়ে কোন্ দুশমনকে পাহারা দিয়েছি সেই বিশ-পঁচিশ দিন!

জেগে থেকেছি, মুহূর্তের জন্যেও ঢুলিনি, অন্যমনস্ক হইনি, দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটার মত মনবুদ্ধি একভাবে একদিকে তাকিয়ে থেকেছে। আগুন জ্বলছে, অনির্বাণ চিতা হু-হু করে জ্বলছে, অবিরাম পুড়ছে শবদেহ। জন্মাচ্ছে মরছে পুড়ছে, মহাশ্মশান। মহাশ্মশানটা কোথায় জানতে পেরেছি।

এই দেহে। এই যে হাড় মাংস মজ্জা মেদ দিয়ে তৈরী দেহটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এর মধ্যেই রয়েছে সেই মহাশ্মশান, সেই শ্মশানে

দাউ দাউ করে জ্বলছে চিতা, পুড়ছে শব, শিয়াল-শকুনে টানাটানি করে ছিঁড়ে খাচ্ছে আধপোড়া মড়াগুলো। বিকার বিকার, জন্ম-মৃত্যু বিলকুল বিকার। একমাত্র সত্য সেই মহাশক্তি, যে শক্তি ঐ জন্ম-মৃত্যু ঘটাচ্ছে। সেই শক্তিটির নাম নেই গোত্র নেই পরিচয় নেই। সেই শক্তি শ্লীল নয় অশ্লীল নয়, সুন্দর নয় বীভৎস নয়। তারই নাম মহাক্ষুধা, করাল বদন ব্যাদান করে অবিরাম চর্বণ করছে আর গিলছে। গিলছে বিকার, রক্তবীজ অসুর, যার এক ফোঁটা রক্ত থেকে হাজারটা রক্তবীজ জন্মায়।

কাব্য করছি না, হেঁয়ালি ফাঁদছি না, সোজা সত্যি কথাটা বলছি। যশোমতীর নগ্ন দেহটা আমার সঙ্গে শত্রুতা করেনি, শত্রুতা করেছে আর একটা নারীদেহ যেটা আমার মনবুদ্ধিকে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটার মত একমুখী করে রেখেছিল। সেই দেহটাকে আমি আমার নিজের মনের মধ্যেই গড়ে তুলেছিলাম। অনেকের ধারণা, উপোস করলে কাম জব্দ হয়। কেউ কেউ বলেন, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়লে ঐ কুচিন্তাটা মগজে স্থান পায় না। ভুল, ভয়ঙ্কর ভুল, মারাত্মক জাতের একটা গোঁজামিল। অনাহারে শরীর ভেঙে পড়েছে, তেষ্টায় ছাতি ফাটবার উপক্রম হয়েছে, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় বৃষ্টির মধ্যে খোলা আকাশের তলায় দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে জঙ্গলের মধ্যে বসে থেকেছি। ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন শত্রুই দূর হয়েছে, কিন্তু চরম শত্রু কাম ঠিক জেগে রয়েছে। সেই চরম অবস্থাতেও নিষ্কৃতি পাইনি। এক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হতে পারিনি, চোখ বুঁজে নিজের ভেতর জ্বলন্ত চিতাটার পানে তাকিয়ে থেকেছি।

মহাশক্তি মহাশ্মশানে বাস করেন। মহাশ্মশানটা কোথায় আছে জানতে চাও? নিজের মধ্যে খুঁজে দেখ। সেই মহাশক্তিকে নাকি জয় করে ফেলেন অনেক মহাপুরুষ, কেউ কেউ নাকি একেবারে ধ্বংস করে ফেলে বিকারহীন হয়ে পড়েন। কি স্পর্ধা!

যে হলাহল স্বয়ং নীলকণ্ঠ উদরস্থ করতে সাহস করেন নি, কণ্ঠে

ধারণ করে সৃষ্টিরক্ষা করছেন, সেই হলাহলকে হজম করে ফেলবার স্পর্ধা দেখায়! যারা দেখায় তাদের বুজরুক বললে ভুল বলা হবে। বলা উচিত বুড়বাক। হিন্দী ভাষার সাহায্য নিতে হল। তার কারণ বুড়বাককে খাস বাঙলায় নিরেট মূর্খ বললে কিছুই বলা হল না।

এখন মহাত্মা নাগ মহারাজ সম্বন্ধে সামান্য একটু বলব। কিছুই জানতে পারিনি তাঁর সম্বন্ধে, জানবার বোঝবার উপায় ছিল না। দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল নাগ মহারাজের আস্তানায় পৌঁছুতে। পাহাড়ের একদম মাথায় চড়ে যশোমতী দেখিয়ে দিল নাগ মহারাজার আস্তানা। খানিকটা তফাতে আর একটা পাহাড়ের গায়ে একটা গর্তের মত জায়গা। বিস্তর ঝোঁপ ঘিরে রয়েছে জায়গাটা। নামতে শুরু করলাম পাহাড়ের গা বেয়ে। সোজাসুজি নাগ মহারাজের আস্তানায় পৌঁছুতে চাই।

আমার মনে হয়, পাহাড়ের গা বেয়ে ওপড়ে চড়া যতটা সহজ নিচে নামা ততটা সহজ নয়। কখনও গাছের শিকড় ধরে ঝুলতে ঝুলতে একটা জায়গায় পা ঠেকলে তবে শিকড় ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে হবে। কখনও পিছলে খানিকটা নেমে গেলে তবে পায়ের তলায় কিছু ঠেকবে, কখনও উবু হয়ে বসে আলতো ভাবে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে চার হাত পায়ে পাথর আঁকড়ে ধরতে হবে। ওপর দিকে ওঠবার সময় ঠিক ঐভাবে ষোল আনা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হয় না, নিজের হাত পা চারখানার ওপর অনেকটা নির্ভর করে দেহটাকে টেনেটুনে ওপরে তুলতে হয়।

যশোমতী তখন আলোয়ানখানা কোমরে জড়িয়ে ফেলেছে। একটা পাথরের কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে একটিবার তাকাল। পরমুহূর্তেই টুপ করে দিল ঝাঁপ, প্রায় দু-মানুষ প্রমাণ নিচু একটু জায়গায় পড়ে উঠে দাঁড়াল। ওপরদিকে তাকিয়ে আমায় ডাক দিল।

"দাও লাফ, আগে তোমার লাঠিটা ফেলে দাও, কমণ্ডলুটাও ফেলে দাও কম্বলে জড়িয়ে, ঠিক ধরে নেব আমি। তারপর ঝাঁপ দাও।

ঠিক ঐখান দিয়ে নেমে যাব। ঐখান দিয়ে নামা যাবে খুব সহজে। নয়ত অনেক রাত হবে ঘুরে যেতে। দেরি করছ কেন? লাঠি কমণ্ডলু ফেলে দাও না।

তাই করলাম। লাঠি কমণ্ডলু কম্বল ফেলে দিয়ে দু হাতে পাথরটার কিনারা ধরে ঝুলে পড়লাম। তারপর ছেড়ে দিলাম পাথর। ধুপ করে পড়লাম ঠিক যশোমতীর সামনে।

যশোমতী খুবই খুশী হয়ে উঠল। বলল—"এই তো চাই। আমাদের তো মরতে ভয় নেই। এস, এইদিক দিয়ে নেমে যাই। এইবার দেখা যাবে তোমার সাহস। নাগ বাবার আস্তানায় কি আছে জানো—নাগ। এই মোটা মোটা সাপে ছেয়ে আছে জায়গাটা। ঐ যে ঝোপগুলো দেখা যাচ্ছে, ওগুলো সব সাপে বোঝাই। কিন্তু কেউ কামড়ায় না। গায়ে পা পড়লেও মাথা তুলে তাকায় না। শুধু খানিকটা সরে যায়। ভয় পাবে না তো?"

আমার চোখের পানে তাকাল যশোমতী, আমিও নির্নিমেষ নেত্রে ওর চোখ দুটির পানে তাকিয়ে রইলাম। ভাবছি তখন, ঐ চোখ দুটির অন্তরালে কি জাতের কালফণী লুকিয়ে আছে।

অজস্র সাপ, বড় বড় পাহাড়ী শঙ্খিনী। শঙ্খিনী সাপের লেজ দেখলে মনে হয় সাপটা দু-মুখো, লেজের ডগা মাথার মত মোটা আর চেপ্টা। নাগ মহারাজ যেখানে বাস করেন সেখানে ঐ দু-মুখো সাপ শত শত পড়ে আছে। সাপ দেখলেই আঁতকে ওঠেন যাঁরা, তাঁরা জেনে রাখুন ঐ জাতীয় সাপ কখনও কামড়ায় না, কামড়ালেও ওদের বিষ নেই। সাপ দেখলে আঁতকে উঠি না আমি, খুন চেপে যায় আমার মাথায়। যতক্ষণ না তার সর্পজন্ম ঘোচাতে পারছি ততক্ষণ শান্তি নেই। একবার এক সাপ মারতে গিয়ে ঘরে আগুন দিয়ে ফেলেছিলাম। ভোরবেলা দারুণ চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল, বাড়িসুদ্ধ লোক সাপ সাপ করে চেঁচাচ্ছে। স্টোভ জ্বালাবার জন্যে এক বোতল

স্পিরিট ছিল তাকের ওপর, সেটাকে নিয়ে ছুটলাম। সাপটা রয়েছে আমার মায়ের ঘরে, দরজার সামনে বসে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পালাবে সে উপায় নেই। দরজার সামনেই ভিড়, সাপ সাপ শুনে সবাই এসে জমা হয়েছে সেখানে। ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে পৌঁছলাম। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে হাত বাড়িয়ে বোতলটা উপুড় করে স্পিরিট ছড়িয়ে দিলাম সাপের চতুর্দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটা কাটি জ্বেলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তুমুল কাণ্ড লেগে গেল, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, সেই আগুনের মাঝখানে সাপটা ঝাপটাঝাপটি শুরু করে দিলে। জ্বলন্ত স্পিরিট ছিটকে গিয়ে পড়ল বিছানার ওপর। আর যাবে কোথায়, নিমেষের মধ্যে ঘরময় আগুন, কাপড়-চোপড় বিছানাপত্র সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। দরজা জানলায় আগুন লাগে নি এই যা রক্ষে। পাড়ার লোক জুটে বালতি বালতি জল ঢেলে দরজা জানলাগুলো বাঁচিয়েছিল। তারপর থেকে সাবধান হয়েছি, সাপ দেখলে মাথা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করি। কিন্তু ভয়ঙ্কর ঘেন্না করে, সৃষ্টিকর্তার ঐ বিশেষ সৃষ্টিটির ওপর নজর পড়লেই গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। মঙ্গলময় ভগবানের তাবৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নাকি শুভ। জানি না, ওঁর সৃষ্ট ঐ সাপেদের দ্বারা কার কি উপকার হয়!

নাগ মহারাজের সামনে হাজির হলাম। পাহাড়ের গায়ে এক ফাটল, আড় হয়ে কোনও রকমে তার মধ্যে সেঁধুনো যায়। ফাটলের ভেতর নাগ মহারাজের আসন, একটা মানুষ বসে থাকতে পারে এতটুকু স্থান আছে। শুয়ে থাকবার উপায় নেই, শুলে পা দুখানা ফাটলের বাইরে বেরিয়ে পড়বে। নাগ মহারাজ বসে আছেন উবু হয়ে, চকচকে মাথাটা রয়েছে দুই হাঁটুর মাঝখানে, দেখাচ্ছে যেন পাশাপাশি তিনটি নেড়া মাথা রয়েছে।

যশোমতী সেই তিন মাথার সামনে নিচু হয়ে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে মাঝখানের মাথাটি খানিক উঠল। সবিস্ময়ে

দেখলাম এক অদ্ভুত মুখ। নাক চোখ কান কিচ্ছু নেই, আগাগোড়া সমস্ত মুণ্ডটা চকচকে চামড়া দিয়ে ঢাকা। যেখানে নাক থাকবার কথা সেখানে ছোট ছোট দুটি গর্ত আর তার নিচেই একটি বড় গর্ত। বড় গর্তটার মধ্যে কি একটা যেন নড়ছে।

আর একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠতাম হয়তো, ফাটলের বাইরে মানুষের গলা শোনা গেল। আর এক মুহূর্ত সেখানে দেরি করলাম না, আড় হয়ে বেরিয়ে এলাম। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক সাধু, খাঁটি নাগা বাবা, এতটুকু আবরণ নেই অঙ্গে, লম্বা লম্বা জটাগুলো কোমর ছাড়িয়ে পায়ের গোছ পর্যন্ত নেমেছে। নাগা বাবা 'নমো নারায়ণ' সম্ভাষণ জানালেন। এগিয়ে গিয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করলাম। যশোমতীও তখন বেরিয়ে এসেছে। তাকে দেখে নাগা বাবার চোখের চাউনি জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল। কাছে গিয়ে প্রায় চুপিচুপি কি যেন বলল তাঁকে যশোমতী, ফিরলেন তিনি। আমরা তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগলাম। সেই সর্পসঙ্কুল জায়গাটার নিচে নামতে হল। চমৎকার এক গুহা, গুহার ভেতর যথেষ্ট স্থান রয়েছে। ধুনি জ্বলছে, ধুনির সামনে মস্ত এক ত্রিশূল গাড়া রয়েছে। একধারে কয়েকটা কাঠের বাসন সাজানো রয়েছে। আরও যেন সব কি কি রয়েছে, আলো নেই বলে ভাল করে দেখতে পেলাম না। মোটের ওপর বেশ ছিমছাম সংসার, দেখে ভরসা পেলাম। সত্যিই তাহলে আশ্রয় মিলল। নাগ মহারাজের কাছে আশ্রয় পাওয়া যাবে বলেছিল যশোমতী, কথাটা দেখছি মিথ্যে নয়।

নাগ মহারাজের চেলা নাগা বাবা বোধ হয় আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গুহার মধ্যে আর একটা গুহায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লেন তিনি, যশোমতী গুহার বাইরে বেরিয়ে গেল। বলে গেল, জল আনতে যাচ্ছে। মস্ত একটা কাঠের পাত্রও নিয়ে গেল ঘাড়ে করে। একা আমি ধুনির সামনে বসে রইলাম।

ভাবতে লাগলাম—তারপর!

সোজা নেমে গেলে পৌঁছে যাব গঙ্গার ধারে, গঙ্গা পার হলে পাব ত্রিযুগীনারায়ণ পৌঁছবার রাস্তা। নারায়ণ জানেন কবে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছব।

পাংশুনা চ প্রতিচ্ছন্নঃ শূন্যাগার প্রতিশ্রয়ঃ।
বৃক্ষমূল নিকেতো বা ত্যক্ত সর্ব্ব প্রিয়াঽপ্রিয়ঃ॥

যিনি ভস্ম দ্বারা আচ্ছন্ন, যাঁর আশ্রয় শূন্যাগার, বৃক্ষমূলে যিনি বাস করেন, প্রিয় অপ্রিয় সমস্তই যিনি পরিত্যাগ করেছেন।

যাত্রা স্তমিতশায়ী স্যান্নিরগ্নিরনিকেতনঃ।
যথালব্ধোপজীবী স্যান্মুনির্দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

যাত্রাকালে যেখানে সূর্যদেব অস্ত যান সেখানেই যিনি শয়ন করেন, যাঁর ঘর নেই আগুন নেই, ঘর থাকলেই আগুন জ্বালিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে, যা পান তাতেই যিনি জীবনযাপন করেন তিনি পরম দয়ালু জিতেন্দ্রিয় মুনি।

নিষ্ক্রম্য বনমাস্থায় জ্ঞানযজ্ঞো গতস্পৃহঃ।
কালাকাঙ্ক্ষীচরন্নেব ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

কর্মরহিত স্পৃহাহীন জ্ঞানযজ্ঞ-পরায়ণ সেই মুনি বনে গিয়ে কালা-কাঙ্ক্ষী হয়ে বিচরণ করেন। ফলে তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

সব মিলে যাচ্ছে কি?

মনে মনে মিলাতে লাগলাম। ভস্মটা যদিও মাখতে শুরু করি নি কিন্তু ধূলি-ধূসর গাত্র হয়েছি নিশ্চয়ই। স্নান যে কবে করেছি, মনেই করতে পারছি না। শূন্যআগার-বৃক্ষমূল যেখানে হোক আশ্রয় নিচ্ছি। প্রিয় অপ্রিয় সবই ত্যাগ করে ফেলেছি তো!

যেখানে সন্ধ্যা হচ্ছে সেখানেই রাত কাটাচ্ছি, আগুন নেই ঘর নেই, নিজে থেকে বিনা চেষ্টায় যা জুটছে তাতেই দিব্যি চলে যাচ্ছে। তবে দয়ালু হয়ে পড়েছি কি না বা ইন্দ্রিয়জয় হয়েছে কিনা সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

কাজকর্ম বলতে কিছুই নেই, স্পৃহাহীন হয়েছি নিশ্চয়ই। কি স্পৃহা আছে আমার! ঐ যশোমতীর খপ্পর থেকে উদ্ধার পাওয়া ছাড়া আর কোনও স্পৃহা নেই। বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বতে তবু যা হোক একটা লোক সঙ্গে আছে। ত্রিযুগীনারায়ণ পর্যন্ত থাকুক। ত্রিযুগীনারায়ণ পৌঁছতে পারলে কেদারনাথ যাত্রীদের নাগাল পাওয়া যাবে। তখন ও নিজে থেকেই খসবে। ঝাড়া হাত-পা হয়ে মানে খাঁটি কালাকাঙ্ক্ষী হয়ে তখন বিচরণ করতে পারব।

শ্লোকটা মুখস্থ করেছিলাম। কিন্তু "কাল-আকাঙ্ক্ষী" কথাটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারি নি। কাল মানে মরণ, কালাকাঙ্ক্ষী মানে মরণ অভিলাষী। না, নিশ্চয়ই আমি মরতে চাই না এখনই। কেন মরব? ঘর-সংসার ছেড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি কি মরবার জন্যে? নিশ্চয়ই নয়, মরণকে জয় করবার জন্যেই এত কষ্ট করছি।

মৃত্যুঞ্জয়ী হতে চাই। মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চাই।

হায় নীলকণ্ঠ! তখনও আসল কথাটাই খেয়ালে আসে নি। মৃত্যুঞ্জয় হতে গেলে জীবনের হলাহলটুকু যে কণ্ঠে ধারণ করে থাকতে হবে, এই সত্যটা তখনও নাগালের বাইরে ছিল।

এল ভেতরে, নাগালের মধ্যে এসে দাঁড়াল উলঙ্গ সত্য, সৃষ্টির আদি মুহূর্তে যে হলাহল জন্মলাভ করেছিল তাই।

বলল—"জল এনে বাইরে রেখেছি। যাও মুখ হাত ধুয়ে এস. বেশী খরচ করবে না, অনেক নিচে থেকে জল আনতে হয়।"

মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। চমকে উঠলাম না, শিউরে উঠলাম না, আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম না। এমন কি মুখ ফিরিয়েও নিলাম না। মনে মনে প্রণাম করলাম।

জলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং।

প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নি মধ্যে ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং। চিতার আগুন,

চৈতন্যের শক্তি। জ্বলে উঠল চিতা, চিতার আগুনে স্পষ্ট চিনতে পারলাম আবরণহীনা আর এক মহাশক্তিকে। নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং, পঞ্চমুদ্রা হচ্ছে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, সেই মহাশক্তিকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেলাম।

আগে একবার বলেছি, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম থেকে আমরা পেয়েছি রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র এই সাতটি ধাতু। আর একবার ঐসব আওড়ে কোনও লাভ নেই। রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র এই যে সাতটি ধাতু, যা দিয়ে তৈরী এই দেহটা, এই দেহটায় যে মহাশক্তি সদাসর্বক্ষণ জেগে রয়েছে, সেই শক্তিটিকে মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার দিয়ে পাহারা দিতে হবে। খুবই স্পষ্ট ভাষায় বলছি—পাহারা দিতে হবে। এ জীবনে দিন বিশ-পঁচিশ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশে ঐ সুযোগটি পেয়েছিলাম আমি। পাহারা দিতে দিতে জানতে পেরেছিলাম, বিন্দু নাদ বীজ কাকে বলে। শ্লোক মুখস্থ করলে আর শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারলে কি লাভ হবে, আসল কথা হল অনুভূতি। আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব, তিনটি তত্ত্বের প্রথমটি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনুভূতি না হলে কার সাধ্য বিদ্যাতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা করবে।

শুক্র শোণিতয়োর্যোগে পঞ্চভূতাত্মিকা তনুঃ।
পাতাল-স্বর্গ-পর্য্যন্তং আত্মতত্ত্বং তদুচ্যতে॥

পাতাল থেকে স্বর্গ মানে আপাদমস্তক এই যে শরীরটা শুক্র-শোণিত দিয়ে তৈরী। এই ক্ষিতি অপ তেজ মরুত ব্যোম পঞ্চভূতের সমষ্টির নাম আত্মতত্ত্ব। এই শরীরে যা আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও তাই আছে। এই শরীর জন্মায় মরে, সুখ-দুঃখ ভোগ করে, ছোট থেকে বড় হয়। এই শরীরে রয়েছে মূলাধারচক্র স্বাধিষ্ঠান চক্র মণিপুর চক্র অনাহত চক্র বিশুদ্ধাখ্য চক্র আজ্ঞাচক্র। এন্তার ছবি এঁকে বা শ্লোক আওড়ে ঐ চক্রগুলোকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। আর ঐ

কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাবার জন্যে হাজারো জাতের কায়দা বাতলানো হয়েছে। ফলে এমন কিম্ভূতকিমাকার জ্ঞান অর্জন করেছেন অনেকে যে বোকা বনবার ভয়ে অবিরাম স্বীকার করে চলেছেন যে বিলকুল বুঝতে পেরেছি। তার চেয়ে সর্বনেশে কথা হল, কুণ্ডলিনী শক্তি জেগে গেছে এমন অনেক মহাপুরুষও এখানে ওখানে আশ্রম ফেঁদে জাঁকিয়ে কারবার চালাচ্ছেন। সবই সেই দুর্ভাগী কুণ্ডলিনীর পোড়া কপালের দোষ। কি করা যাবে?

গুরু বলে দেবেন সংকেতটুকু—বিদ্যাতত্ত্ব রহস্য—

মূলাধারে চ যা শক্তির্গুরুবক্ত্রেণ লভ্যতে।
যা শক্তি র্মোক্ষদা নিত্যা বিদ্যাতত্ত্বং তদুচ্যতে॥

এই যে শুক্র শোণিত দিয়ে তৈরী স্থূল শরীর এর মধ্যে কোনখানে আছে মূলাধার চক্র সেই চক্রে কিভাবে শক্তিরূপা মহাপ্রকৃতি অধিষ্ঠান করছেন, যাঁকে জানলে মুক্তিলাভ নিশ্চয়ই ঘটবে, সেই মহাশক্তি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম জ্ঞানলাভ হয় গুরুর দয়ায়।

হল, জানতে পারলাম ব্যাপারটা। কিন্তু তারপর?

জানাটাই শেষ কথা নয়, আসল কথা টের পাওয়া। টের পাব কেমন করে?

তারপরেও রয়েছে শিবতত্ত্ব—পরমতত্ত্ব।

আমার এই মাথাটার মধ্যেই সহস্রদল পদ্মে তিনি রয়েছেন—

সহস্রারস্য মধ্যস্থে সহস্রদলপঙ্কজে।
তন্মধ্যে নিবসেত্তত্ত্ব শিবতত্ত্বং তদুচ্যতে॥

মাথা খেয়েছে! এত ভজকট কি মাথায় ঢোকে রে বাবা! তার চেয়ে সোজা পন্থা হচ্ছে ভাবে গদগদ হয়ে ঢলাঢলি করা। ন্যাকা সাজতে পারলে আর ঢঙ করতে পারলেই কর্ম ফতে। কে যাচ্ছে বাবা অমৃতটুকু না চেখে হলাহল গলায় ঢালতে।

এইবার কয়েকটি হক কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

যাঁরা বলেন, কুণ্ডলিনী জেগে উঠলে চিরকাল জেগেই থাকেন তাঁরা মিথ্যে কথা বলেন। আগে যে সাতটি ধাতুর কথা বলেছি, ঐ সাতটি বাদে আর একটি ধাতু আছে তার নাম ওজঃ। অনবরত সবাই শুনছেন যে ব্রহ্মচর্য পালন করাই চাই। তার কারণটি হচ্ছে শুক্র থেকে ওজঃ উৎপন্ন হয়। শুক্রক্ষয় হলে ওজঃ ক্ষীণ হয়ে যায়। আর একটি কথা টুপ করে এখানে বলে রাখছি, এ নিয়ে আলোচনা করতে পারব না, ওজঃ বলতে যে জিনিসটাকে বোঝানো হচ্ছে সেটাই পারদের প্রাণ। মাত্র সাড়ে তিন ফোঁটা ওজঃ দেহেতে থাকে। এই ওজঃ হচ্ছে শক্তি অথবা এই ওজঃ থেকেই উৎপন্ন হচ্ছে শক্তি, যে শক্তিতে আমরা চলছি। এবং এই শক্তিই হল চিৎশক্তি বা চৈতন্যশক্তি। চৈতন্য-শক্তি জেগে ওঠে এবং ঘুমিয়েও পড়ে। সেইটেই হচ্ছে তার ধর্ম। হরদম হরবকৎ ঐ শক্তিটা জেগে থাকলে মহামায়ার মায়াটুকু একদম লোপ পাবে। ছুটন্ত হরিণের শিঙের ওপর একটি সরষে ফেললে যেটুকু সময় সেটি শিঙের ওপর থাকে, মাত্র সেইটুকু সময় মহামায়া মায়া সম্বরণ করেছিলেন। সেই সময় জন্মালেন শুকদেব, মায়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ মায়াহীন শুকদেব হলে সৃষ্টিটা চালু থাকে কেমন করে!

যশোমতী চেষ্টা করছিল নাগা সন্ন্যাসীদের দলে স্থান পাবার জন্যে। নাগা সন্ন্যাসী অনেকে দেখেছেন কুম্ভমেলায়, উলঙ্গিনী সন্ন্যাসিনীরা কুম্ভমেলায় আসেন না। আমি তাঁদের দেখেছি, কোথায় কিভাবে থাকেন তাঁরা জানি। চেষ্টা করব এই গ্রন্থেই তাঁদের কথা জানাতে। তিন বছর হিমালয়ে ঘুরতে ঘুরতে কুমায়ুন থেকে মানসসরোবর পর্যন্ত পরিক্রমা করে যাবতীয় যা কিছু দেখেছি, সবটুকু বলবার চেষ্টা করলে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং—

আচ্ছা, এবার যশোমতীর বিদায়ের পালাটুকু বলে নি।

নাগ মহারাজের আশ্রয় থেকে পরদিন সকালেই আমরা বিদেয় নিলাম। সারারাত সেই গুহায় কাটাতে হল। জেগে রইলাম। নিদ্রা

ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি আলস্য পঞ্চতত্ত্বের তৃতীয় তত্ত্ব তেজ থেকে ঐ পাঁচটি উৎপন্ন হয়, সবই দূর হয়ে গেল। অন্ধকারের অন্তরে সেই নাগা সাধু আর যশোমতী কি সাধনা করতে লাগল তা ওরাই জানে।

সকাল হল। কাপড়জামা পরে আলোয়ান জড়িয়ে তৈরী হল যশোমতী, একটা পোঁটলায় কিছু রসদও যেন সঙ্গে নিল। নাগা সন্ন্যাসীটি খানিকটা এলেন আমাদের সঙ্গে। তারপর আমরা দুজনে আর একবার নীলকণ্ঠের জঠরে হারিয়ে গেলাম।

কেমন করে কিভাবে বন জঙ্গল পাহাড় পর্বত ভেঙে পৌঁছেছিলাম ভাগীরথী তীরে তার নিখুঁত বিবরণ দিতে পারব না। দেওয়া সম্ভবও নয়। ভাগীরথী পার হয়ে দশ বারো দিন সমানে সেই সাংঘাতিক যাত্রা চালিয়ে যেতে হয়েছিল। অনেক নামজাদা ভ্রমণকারী আছেন যাঁরা বনে জঙ্গলে পাহাড়ে জীবন বিপন্ন করে ঘুরে সার্থক ভ্রমণ-কাহিনী রচনা করেছেন, তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর একখানা সাংঘাতিক জাতের রোমাঞ্চকর গ্রন্থ তৈরী করার গরজ নেই আমার। আমি শুধু বলতে চাই সেই অনুভূতিটুকু যেটুকু যশোমতী আমাকে দান করে চলে গেছে।

একটা দেহ আর একটা দেহের কাছ থেকে কি পেতে পারে?

অথবা একটা দেহ আর একটা দেহকে কি দিতে পারে?

উত্তাপ? সাহস? মহাক্ষুধার নিবৃত্তি?

জঠরের ক্ষুধা মৃত্যুভয় ঠাণ্ডা সব কিছু জয় করার মত মহাশক্তি দিতে পারে একটা দেহ আর একটা দেহকে। কিভাবে পারে তাই বলবার চেষ্টা করছি।

যাকে আমরা কাম বলি, আরও সোজা কথায় নারীদেহের আকর্ষণ বললে যে ব্যাপারটা বোঝায়, সেটা সত্যিকারের কি ব্যাপার যদি জানতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম ঘৃণা লজ্জা ভয় এই তিনটি ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হবে। এমন অবস্থায় এমন স্থানে সেই নারী-দেহটা কুড়ি-পঁচিশ দিন ছিল আমার সঙ্গে যে লজ্জা বা ভয়ের প্রশ্নই

ছিল না। দুনিয়ার এক প্রাণী জানতে পারে নি যে দুটি মানব-মানবী কোথায় লুকিয়ে আছে। লজ্জা ভয় বাদ দিলে যা থাকে তার নাম ঘৃণা। সেই ঘৃণাও ছিল না আমার মনে। ঘৃণা থাকলে কিছুতেই অতগুলো দিন রাত সেই দেহটাকে আগলে, প্রাণপণে সেটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে সেই রাক্ষুসে জায়গাটা পার হতে পারতাম না। পড়ে গিয়ে ঠ্যাং মচকে অচল হয়েছিল সেই নারীদেহটা, তখন সেটাকে কাঁধে করে বয়েছি। খিদেয় তেষ্টায় প্রায় শব হয়ে উঠেছিল তখনও সেটাকে ছাড়ি নি। অতএব ঘৃণা বলতে যা বোঝায় সেটাও ঘুচে গিয়েছিল একথা অনায়াসে বলা যায়। ঐ ঘৃণা লজ্জা ভয় সম্পূর্ণ ঘুচে গিয়েছিল বলেই কামের সত্যিকারের পরিচয়টা আমি পেয়েছিলাম। ওটা একটা কথার কথা নয়, ওটা রয়েছে আমার ভেতরে, ভয়ঙ্কর ভাবে জেগে রয়েছে। দিবারাত্র প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছি ওর শক্তি। সেই শক্তি আমাকে খেপিয়ে তুলেছে, মুচড়ে নিঙ্‌ড়ে আমার আমিত্বকে ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়েছে। যশোমতীর দেহটা তখন কি করতে পারে আমার! আমার নিজের আত্মতত্ত্বে যে সমুদ্রমন্থন চলছিল, সেই মন্থন থেকে যে হলাহলটুকু উঠেছিল, সেই হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে আমি তখন নীলকণ্ঠ বনে গেছি।

হ্যাঁ, হেঁয়ালি না করে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, যশোমতী আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেছে কি ভয়ঙ্করী এক শক্তির খেলা চলছে আমার মধ্যে। তোমরা তাকে বলবে কাম, বলবে ওটা নোংরা ব্যাপার, ওটা অশ্লীল। হয়তো অনেকে মুখ মুচকে হেসে বলবে—"ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাপও টের পায় না, কি করেছিলে না করেছিলে তখন স্পষ্ট করে খুলেই বল না চাঁদ, অনর্থক পেঁচিয়ে মরছ কেন?"

খুলেই বলছি, অকপটে বলছি, করেছিলাম রমণ। বাইরে নয়, সেই নারীদেহটা নিয়ে নয়, ভেতরে। বাইরের সেই নারীদেহটা নিয়ে রমণ করলে মিনিটকতক পরেই আগুন নিভে যেত, ক্লান্তি আসত, আনন্দটা নিরানন্দে পরিণত হত। তা হয় নি।

ওজঃশক্তি যার ভাল নাম কুণ্ডলিনীরূপিণী জীবের মহাশক্তি, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় মহাপ্রকৃতি স্বরূপিনী জীবনীশক্তি, সেই শক্তির সঙ্গে রমণ করেছিলাম। এবং তার ফলে জীবনের বিশ-পঁচিশটা দিন সত্যিকারের বেঁচে থাকা কাকে বলে তা টের পেয়েছিলাম। ঐ বিশ-পঁচিশ দিনের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যে গোঁজামিল দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বাঁচতে হয় নি।

একটা দেহ আর একটা দেহ থেকে ঐ ওজঃশক্তির সাহায্য পেতে পারে।

ত্রিযুগীনারায়ণ।

জ্বরে বেহুঁশ, রক্তআমাশয় প্রায় পঙ্গু। পড়ে আছি একটা চটির পেছন দিকে। কোনও রকমে একটু উঠে গিয়ে পাথরের আড়ালে উবু হয়ে বসছি, খানিকটা রক্ত বেরিয়ে যাবার পরে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এসে আবার সেই আঁস্তাকুড়ে পড়ছি। লাঠি কমণ্ডলু নেই, কবে কোথায় বিদেয় হয়েছে সেই সম্পত্তি দুটো তাও খেয়াল নেই। কম্বলখানা আছে। রক্তবিষ্ঠায় মাখামাখি হয়ে তখনও গায়ে জড়ানো আছে। এইটুকুই শুধু মনে আছে যে মাঝে মাঝে কেউ আমাকে একটু জল গিলিয়ে যেত। কে সে তা বলতে পারব না। শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বেহুঁশ হয়ে পড়লাম। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে উবু হয়ে বসবার শক্তিটুকুও আর রইল না।

হঠাৎ একদিন ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙতেই সর্বপ্রথম যা টের পেলাম তা হচ্ছে উৎকট কার্বলিকের গন্ধ। তারপর বুঝতে পারলাম, বেশ নরম বিছানায় শুয়ে আছি। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম চারিদিকে। এ কোথায় শুয়ে আছি আমি! কারা আমায় তুলে নিয়ে এল এখানে! কতদিন পড়ে আছি এভাবে!

সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর মিলল খানিক পরে। কানে গেল কথাবার্তার আওয়াজ। কি বলছে ওরা! ইংরেজী ভাষা যেন!

আমার চেয়ে প্রায় দু-গুণ লম্বা এক সাহেব এসে দাঁড়ালেন বিছানার পাশে। নিচু হয়ে মশারির মধ্যে মাথা গলিয়ে আমার মুখপানে তাকালেন। ইংরেজীতে বললেন—"এই যে, ঘুম ভেঙেছে দেখছি, ভাল বোধ করছ তো! ও আচ্ছা, ভুলেই গিয়েছি যে তুমি মৌন। যে মাদার আমাদের কাছে তোমার খবর দিয়ে গেছেন তিনিই বলেছেন যে তুমি ভাউ অফ্ সাইলেন্স নিয়েছ। খুব বড় কথা, ঐ ভাউটা রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নয়। আমরা চেষ্টা করব যাতে তোমার ঐ ভাউ অফ্ সাইলেন্স বজায় থাকে। হ্যাঁ, এইবার আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমি এন্‌ডেন্, জোয়লজিক্যাল্ সারভে অফ ইণ্ডিয়ায় চাকরি করি। সঙ্গে আমার স্ত্রীও রয়েছেন। এই যে কোথায় গেলে, হেলো জুলি—"

সাহেবের মতই ঢেঙা, রোগা শুখনো প্রায় বুড়ী এক মেমসাহেব সাহেবের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সাহেব খুব উৎসাহের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—"জুলি এন্‌ডেন্, আমার স্ত্রী। যোগ প্র্যাক্‌টিস করছে। টিবেট্ থেকে এক লামা এসেছিল সিমলায়, তার ডিসাইপেল্ হয়েছে। তুমিও তো মস্ত বড় যোগী, সেই মাদার বলে গেছেন। নিশ্চয়ই তুমি জুলিকে সাহায্য করতে পারবে। মাই গড্, এই দেখ, আবার আমি ভুল করছি। তুমি যে ভাউ অফ্ সাইলেন্স নিয়েছ এটা আমার মনেই থাকে না। যাই হোক, নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝতে পারছ তুমি। আচ্ছা, হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধর, তাহলেই আমি বুঝব যে তুমি ইংরেজী জান।"

হাত বাড়িয়ে সাহেবের হাতখানা ধরে ফেললাম। তৎক্ষণাৎ সাহেব দু হাতে আমার হাতটা ধরে বার বার বলতে লাগলেন—"থ্যাঙ্ক য়ু, থ্যাঙ্ক্ য়ু, থ্যাঙ্ক য়ু।"

বিদেশী মানুষ, বিশেষতঃ ইংরেজ। আমার সঙ্গে অহি-নকুল সম্বন্ধ। তবু যেন বেশ কাহিল হয়ে পড়লাম। হাজার হলেও মানুষ তো বটে।

জুলী এন্‌ডেন্ আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন—"সেই মেয়েটি আমাকে বলে গেছে যে আবার তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

তোমার কথা সব বলে গেছে আমাকে, য়ু আর এ গ্রেট্ সেণ্ট্। পালিয়ে গেল সে, তার নিজের লোকেরা নাকি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, আমাদের কাছে তোমার কোনও কষ্ট হবে না। কয়েক দিন পরে তুমি একটু সুস্থ হলেই আমরা এখান থেকে ওপরে চলে যাব। আমার গুরু বলেছেন যে কেদারনাথ যেতে হবে। ওখানে আমি কিছুদিন থাকতে চাই।"

অতএব বুঝতে পারলাম যে কেদারনাথ আমায় সত্যিই টেনেছেন। কিন্তু যশোমতী? বাবা কেদারনাথ কৃপা করেছেন তো যশোমতীকে? তার যে ভয়ানক শখ ছিল কেদারনাথ দর্শন করবার।

বোধ হয় দিন আষ্টেক দশ উত্থানশক্তি ছিল না। তাঁবুর ভেতর তাঁবুর খাটে শুয়ে সাহেব মেমসাহেবের সেবাযত্ন গ্রহণ করলাম। বিস্তর বড়ি গেলালেন ওঁরা, সেই সঙ্গে টিনের ফল আর টিনের ক্ষীর আসল বিলেতী বিস্কুট সহযোগে উদরস্থ করতে লাগলাম। পায়ের তলায় ফাটাগুলোর ভেতর থেকে রাশীকৃত কাঁকর বার করল সাহেবের এক চাপরাসী ছোট চিমটে দিয়ে। কড়া ওষুধ ঢেলে ফাটাগুলো ধোয়া হল, একটা মলম দিয়ে ভরতি করা হল। তারপর দু পায়ের তলায় সেঁটে দেওয়া হল আটা-লাগানো শক্ত কাপড়। নিশ্চিন্ত, হাঁট চল যেমন খুশি, পায়ে আর কিছুই ফুটবে না। চোখের পাতায় ঘা হয়ে গিয়েছিল, দুখানা ঠোঁট ফেটে ফুলে উল্টে গিয়েছিল, হাতের আঙ্গুল-গুলোয় দগদগে ঘা হয়েছিল কুঠের মত, সব সেরে গেল। এককথায় নবকলেবর পেলাম, নবজন্ম লাভ করলাম বললেও অন্যায় বলা হয় না। তারপর একদিন রওয়ানা হওয়া গেল। লটবহর নিয়ে অন্ততঃ জনা ত্রিশেক লোক চলেছে এন্‌ডেন্‌ সাহেবের সঙ্গে, আরদালী বাবুর্চি খানসামা মায় একজোড়া থ্যাবড়ামুখো অদ্ভুতদর্শন কুকুরও চলেছে। বিরাট ব্যাপার, বাক্স বাক্স টিনভরতি মাছ মাংস দুধ ক্ষীর বিস্কুট চকোলেট ওষুধ ইন্‌জেকস্‌ন সর্বস্ব নিয়ে যাচ্ছেন সাহেব। ওঁর দলের কোনও মানুষ বাজার থেকে কিনে কিছুই খেতে পারবে না, এই হল আইন। আর একটি আইন হল, জল ফুটিয়ে খেতে হবে। একবার নাকি কলেরার প্রতাপে হিমালয় থেকে পালাতে হয় ওঁকে। জন দুই কুলীর কলেরা হয়। তাদের তো ফেলে যেতে পারেন না সাহেব। কুলীরা কিন্তু সবাই ভাগল। আরদালী খানসামা বাবুর্চি নিয়ে সাহেব সেই রুগী দুটোকে চাঙ্গা করে তুললেন। মালপত্র সব পড়ে রইল সেখানে, বইবে কে। সেবার সব পণ্ড হয়েছিল কলেরার দরুণ, তাই এত সাবধানতা।

গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে বাজার ধর্মশালা যেখানে সেখান থেকে অনেকটা তফাতে আমাদের তাঁবু পড়ল। ঠিক হল, মালপত্র নিয়ে লোকজন সব ওখানেই থাকবে, সাহেব মেমসাহেব আর আমি যাব ওপরে মানে কেদারনাথে। আরদালী দুজন অবশ্য সঙ্গে যাবে। ওদের একজন ওষুধপত্রের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে সাহেবের পেছনেই থাকে। আর একজন যাবে কিছু খাবার জিনিস নিয়ে। খুব ভোরে রওয়ানা দিলে দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাব কেদারনাথে, ঘণ্টা দুয়েক পরে নামতে শুরু করলে সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসা যাবে। ব্যবস্থা বন্দোবস্ত পাকা করে কম্বল মুড়ি দেওয়া হল। আগুন জ্বলছে প্রত্যেক তাঁবুর দরজায়। জ্বললে হবে কি, হাড়ের ভেতরে ছুঁচ ফুটতে লাগল। ঠাণ্ডা তো নয়, হলাহল। যে হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে আছেন নীলকণ্ঠ, সেই হলাহল হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সেই বিষাক্ত হাওয়া যাচ্ছে ভেতরে, হাড় পর্যন্ত জরজর হচ্ছে বিষে। আগুনে কি করবে?

সন্ধ্যা তখনও হয় নি বোধ হয়। হঠাৎ কোথায় যেন গোঁ গোঁ আওয়াজ উঠল। লোকজন সব ছুটোছুটি করতে লাগল। বড় বড় পাথর এনে তাঁবুগুলোর চার ধারে চাপাতে লাগল। জিনিসপত্র সমস্ত তেরপল দিয়ে ঢাকা হল। তেরপলের ওপরেও চাপানো হল পাথরের চাঁই। সামাল সামাল রব উঠল। এন্‌ডেন্ সাহেব অসুরের মত খাটতে লাগলেন। দেখতে দেখতে গোঁ গোঁ আওয়াজটা হুহুঙ্কারে পরিণত হল। হাজার হাজার দৈত্য রে-রে করে চতুর্দিক থেকে ছুটে আসছে যেন। আগুন নিভিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ তাঁবুর ভেতর আশ্রয় নিলে।

হল শুরু, মহারুদ্র খেপে উঠলেন। অনবরত কড়-কড়-কড়াৎ, কার সাধ্য কান খুলে থাকে। প্রতি মুহূর্তে বিদ্যুতের ঝলসানি, চোখ মেলে থাকাও সম্ভব নয়। চোখ কান ঢেকে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলাম। মনে হল, তাঁবুগুলো সুদ্ধ আমাদের সবাইকে দলে পিষে পিণ্ডি পাকিয়ে মন্দাকিনীতে বিসর্জন দেবেন বুঝি নীলকণ্ঠ। বিদেশী

বিধর্মী চলেছে মহামহিম কেদারনাথকে দর্শন করতে, এতখানি স্পর্ধা বুঝি নীলকণ্ঠের সহ্য হচ্ছে না।

সারারাত চলল সেই তাণ্ডব নৃত্য, ভোরের দিকে ঝড়ের দাপট একটু কমল বটে, বৃষ্টি কিন্তু থামল না। মিসেস্ এন্‌ডেন্ ভয়ানক রকম মুষড়ে পড়লেন। তাঁর গুরু সেই তিব্বতী লামা কেদারনাথ সম্বন্ধে যা কিছু শুনিয়েছিলেন তাঁকে সমস্ত তিনি বিশ্বাস করে বসে আছেন। কেদারনাথ নাকি জ্যোতির্ময় লিঙ্গ, কেদার দর্শন করলে জ্যোতিদর্শন হয়। ভয় পেয়ে গেলেন মেমসাহেব, তাঁর কপালে জ্যোতিদর্শনটা বুঝি ঘটল না। আমার কাছে এসে জানতে চাইলেন, তিনি হিন্দু নন বলে পূর্বজন্ম পরজন্ম মানেন না বলে কেদারনাথ দর্শন করতে পারবেন না নাকি? তাঁর গুরুদেব বলে দিয়েছেন যে পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে জ্যোতিদর্শন করা যায় না। কিন্তু ইহজন্মে তো তিনি কোনও অন্যায় করেন নি। তাহলে লর্ড কেদারনাথ তাঁর ওপর কৃপা করবেন না কেন?

ভাগ্যে মৌনব্রত নিয়েছিলাম, জবাব দেবার দায় থেকে মুক্তি পেলাম। মৌনব্রত না থাকলে কি জবাব দিতাম, তাই ভাবি এখনও। দুনিয়ার যাবতীয় প্রশ্নের কি জবাব দেওয়া যায়? বাবা কেদারনাথই জানেন।

তিন দিন তিন রাত সমানে সেই ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন রুদ্রদেব। মিলল রেহাই, উঠল রোদ। দুপুর নাগাদ সংবাদ এল ওপর থেকে, রাস্তা বন্ধ। বিরাট এক ধ্বস নেমে কেদার-নাথের তিন মাইল আগের রামওয়াড়া চটি লোপাট করে নিয়ে গেছে। বাঁচা গেছে। রাস্তা যতক্ষণ তৈরী না হচ্ছে ততক্ষণ কেদারনাথ মাথায় থাকুন। উত্তপ্ত গৌরীকুণ্ডে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে লাগলাম। হাতপায়ের খিলগুলো কেমন যেন আটকে গিয়েছিল, গৌরীকুণ্ডের মাহাত্ম্যে চালু হয়ে গেল। সাধু সন্ন্যাসী

যাত্রীতে ভরে উঠল গৌরীকুণ্ডের পান্থশালাগুলো। অনবরত নিচে থেকে উঠে আসছে মানুষ কেদারদর্শন মানসে, সাত আঁট মাইল আগে কেদারনাথ, এগোবার উপায় নেই। কি মর্মান্তিক অবস্থা। অনেকে বুক চাপড়াতে লাগল, কেদারনাথের উদ্দেশে পাথরের ওপর কপাল ঠুকতে লাগল। দয়া কর বাবা দয়া কর, এত কাছে এসে তোমাকে দর্শন না করে যদি ফিরে যেতে হয় তাহলে বেঁচে থেকে কি লাভ। বেঁচে থাকবার মত রসদেরও টানাটানি পড়ে গেল গৌরীকুণ্ডে, চটিওয়ালারা মওকা বুঝে চাল আটা আলু লকড়ির দাম তিন গুণ হাঁকতে লাগল। কোথা থেকে এক শেঠজী এসে উপস্থিত হলেন। দশগুণ দাম দিয়ে যাবতীয় চাল আটা কিনে নিয়ে ভাণ্ডারা চালাতে লাগলেন। গৃহস্থ তীর্থযাত্রীরা পড়লেন মুশকিলে, তীর্থপথে তাঁরা দান গ্রহণ করবেন কেন? সাধু সন্ন্যাসী মাঙনে-খানেওয়ালারা শেঠজীকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

মিসেস্ এন্ডেন্ ঠিক করে ফেললেন যে কেদারনাথ দর্শন না করেই তিনি ফিরে যাবেন।

কারণ?

এমনভাবে তাকালাম এন্ডেন্ সাহেবের চোখের পানে যে আমার প্রশ্নটা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন। একটু যেন লজ্জিত হয়ে পড়লেন জবাব দিতে গিয়ে। জবাবটি শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। খাস বিলেতী মেমসাহেবের এতখানি কুসংস্কার থাকতে পারে? পরম দয়াল প্রভু যীশু কি তাহলে ওঁকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন?

ঝড় জল বৃষ্টি বজ্রপাত তারপর ধ্বস নামা সমস্তই নাকি একটা মহা অমঙ্গলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর পরও যদি মেমসাহেব কেদার দর্শনে যান তাহলে একটা সাংঘাতিক রকমের বিপদ ঘটতে পারে। এন্ডেন্ সাহেব বললেন—"স্ত্রীলোকের মন, বুঝলেন স্বামী, স্ত্রীলোকের মন। ওর নিজের বিপদের জন্যে ও মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। জুলীর যত

ভাবনা আমাকে নিয়ে। সত্যিই তো আমি খুব ধার্মিক লোক নই। জুলী মনে করছে, লর্ড কেদারনাথকে দর্শন করতে হলে যতটা পবিত্র হওয়া উচিত, ততটা পবিত্র আমি নই। আমার কোনও ক্ষতি হয়ে বসবে, এই ভয়েই জুলী আর এগোতে চাচ্ছে না।"

বুঝলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বোঝালাম যে এইবার খসতে হবে। মিষ্টি রসে ডোবানো হরেকরকম ফল, টিনভরতি ক্ষীর আর আসল বিলেতী বিস্কুট খাওয়ার মেয়াদ ফুরিয়েছে। অতএব মন এবার তল্পি গোটাবার তরে প্রস্তুত হও।

মুশকিল বাধল সাজপোশাক নিয়ে। গেরুয়ার সঙ্গে সম্পর্ক কখন যে ঘুচে গিয়েছিল তা আমি জানতেও পারি নি। আমার অঙ্গে যা ছিল তা আগুনে সঁপে দিয়েমারাত্মক রক্তআমাশার জীবাণুদের ধ্বংস করেছেন সাহেব। হুঁশ হবার পরে দেখলাম দামী লিনেন্ রয়েছে অঙ্গে, রঙ দুগ্ধ-ফেননিভ। সেই লিনেন্ জড়িয়েই লজ্জা নিবারণ করছি তখন। লিনেনের ওপর পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলের এক কোট চাপাতে হয়েছে মেমসাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধের গুঁতোয়। ঐসব সামগ্রী না বলে নিয়ে পালালে নিশ্চয়ই চুরি করা হবে। তা ছাড়া ঐ সমস্ত পরে ঘুরতে থাকলে মানুষে মনে করবে কি! একখানা কম্বলও নিতে হবে, আপাদ-মস্তক কম্বল মুড়ি না দিলে চামড়া ফেটে রক্ত ঝরবে। উপায় কি! না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি তো সহজ কথা, তার চেয়ে ঢের ঢের বড় অন্যায় অপহরণ করা হয়।

পালাতেই বা যাব কেন? ওঁদের জানিয়ে চলে গেলে নিশ্চয়ই ওঁরা বাধা দেবেন না। তখন কাপড়-কম্বলেরও ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়ই। নিদারুণ ঠাণ্ডায় উলঙ্গ হয়ে রওয়ানা হব। মাত্র একখানা লিনেন্ থাকবে অঙ্গে। দেখাই যাক না, সাহেব মেমসাহেব কি করেন।

মতলবটি পাকা করে ফেললাম। পরদিন সকালে মাখন-মাখানো বিস্কুট আর কাফি খাবার পরে গরম কোটটি খুলে সাহেবের সামনে

রাখলাম। চাদর হিসেবে যে লিনেন্‌টা ব্যবহার করছিলাম, সেটাকেও ঝেরে পাট করে গুছিয়ে রাখলাম কোটের ওপর। মেমসাহেব হাউ-মাউ করে উঠলেন—"করছ কি? করছ কি? নিউমোনিয়া হবে যে!" শুনে খুবই উচ্চাঙ্গের একটু হাসি মুখে ফুটিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম তাঁর দিকে। মিষ্টার এন্‌ডেন্‌ পাইপ্‌ টানতে টানতে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। লাফিয়ে উঠলেন একেবারে।

"তার মানে? চলে যাচ্ছ নাকি তুমি?"

"লর্ড!" অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন মেমসাহেব। তাঁর চোখ দুটো তখন ফেটে বেরিয়ে পড়ে আর কি।

সাহেব চিৎকার করতে লাগলেন—"কম্বল লে আও জলদি, কম্বল লে আও।"

এক আরদালী দুখানা কম্বল নিয়ে উপস্থিত হল। তৎক্ষণাৎ একখানা কম্বল জড়িয়ে দিলেন আমার গায়ে সাহেব। উত্তেজনা খানিকটা কমেছে তখন। বললেন—"বস বস, আর একবার কফি খাওয়া যাক। যাচ্ছ কোথায় তুমি? কেন যাচ্ছ? ওপরে যেতে পারবে না, যতদিন না রাস্তা খুলছে এখানেই থাকতে হবে। কেদারনাথ দর্শন না করে নিশ্চয়ই তুমি অন্য কোথাও যাবে না, এটা আমরা ধরেই নিয়েছি। তাই ঠিক করেছি যে কিছু লোক এখানে থাকবে তোমার সঙ্গে, আমরা নেমে যাব। এখানে ভয়ানক ভিড় হয়ে পড়ল, হয়তো এপিডেমিক্‌ লেগে যাবে। আমার দলের লোকজন বেয়াড়াপনা করছে। হরদম যাচ্ছে আসছে মেলায়, হয়তো যা তা কিনে খাচ্ছেও। আটকাব কেমন করে, চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে ওদের মেজাজও বিগড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় এখানে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। আমরা থামতে থামতে যাব। দিন তিনেক পরেই বোধ হয় রাস্তা খুলে যাবে। কেদারনাথ দর্শন করে তাড়াতাড়ি ফিরবে তুমি, রুদ্রপ্রয়াগে আমরা বসে থাকব।"

মেমসাহেব বলে উঠলেন—"ঐ জায়গাটি হচ্ছে সবচেয়ে মনোরম।

মাসখানেক থাকব আমরা ওখানে। মাসখানেক ওখানে থাকলে অনেক সাধু মহাত্মার দর্শন পাওয়া যাবে। তারপর একটা মতলব করে অন্য কোনও দিকে যাওয়া যাবে।”

শুনলাম সব। হাঁ না কিছুই বলবার উপায় নেই। এন্‌ডেন্‌ ধরে নিলেন যে ওঁদের প্রস্তাব আমি মেনে নিয়েছি। হাঁক-ডাক করে দুজন লোককে খাড়া করলেন আমার সামনে। তারা থাকবে আমার সঙ্গে, ছোট তাঁবু একটা আর রসদপত্র কিছু থাকবে। দুজন লোকে বইতে পারে যতটা মাল ঠিক ততটাই থাকবে। তৎক্ষণাৎ কাগজ কলম নিয়ে কাজে লেগে গেলেন সাহেব, যেসব জিনিস রেখে যাবেন তিনি আমাদের কাছে ফর্দ করতে লাগলেন। মোট ওজন কতটা হবে সেটা আন্দাজ করা চাই।

অপহরণ নামক অপকর্মটি আর করতে হল না। ফর্দ করার সময় আমার ঘাড়ে যা চড়বে তাও ঠিক হয়ে গেল। বেশী কিছু নয়, কম্বল চারখানা লিনেন্‌ চারখানা আর কয়েকটা ওষুধপত্র। পাটের দড়ি দিয়ে বানানো তলাওয়ালা ক্যাম্বিশের জুতো এক জোড়া আর একটা ভয়ানক মোটা পশমী গেঞ্জি গছাবার জন্যে মেমসাহেব চূড়ান্ত চেষ্টা করে হার মানলেন। আমার জন্যে নির্দিষ্ট কাপড় কম্বলের কাছ থেকে জুতো জামা তফাতে সরিয়ে রাখলাম। মিস্টার এন্‌ডেন্‌ জামা জুতোর চেয়ে ঢের বেশী দরকারী একটা জিনিস দিলেন আমার হাতে, বারো শিকওয়ালা একটা ছাতা। ছাতাটি মুড়ে একটা খাপের ভেতর ঢুকিয়ে নিলে মোটা ছড়ির মত দেখতে হয়। লাঠির অভাবও ঘুচে গেল। ছাতার বাঁট এমন এক হাল্কা ধাতু দিয়ে বানানো যে সহজে ভাঙবে না। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলাম।

আর দেরি করার উপায় নেই। পরদিন সকালেই সাহেবরা তাঁবু গোটাবেন। তার আগে না সরতে পারলে দুটো লোক আর রাশীকৃত মালপত্র সামলাবার দায়ে পড়ব। একখানি কাপড় কোমরে আর একখানি গায়ে জড়ালাম, ওপরে চাপা দিলাম একখানি কম্বল।

ছাতাটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রোজ যে সময় গৌরীকুণ্ডে স্নান করতে যাই সেই সময় রওয়ানা হলাম। ওঁরা দেখলেন। বলবার কিছু নেই, উত্তপ্ত কুণ্ডে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকার মতলবটি সাহেবই আমাকে দিয়েছেন।

সোজা কেদারনাথ। বহুবার শুনেছি যে মাত্র ন-মাইল চড়াই ভাঙতে হবে। ধ্বস নেমেছে ছ-মাইল ওপরে রামওয়াড়ায়। ধ্বসের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়ে গেছে আমার। রাস্তা বানাবার হাকিমটিকে মনে পড়ল, হেঁটমুণ্ডে শূন্যে ভাসমান সেই মহাত্মাকেও মনে পড়ল। কাশীতে যাঁকে কেদারনাথ বলে দর্শন করেছি, স্পর্শ করেছি, তাঁকেই স্মরণ করলাম। দোহাই বাবা, পার লাগাও। তিন দিন পরে রাস্তা মেরামত হলে এই ভিড় ঠেলে গিয়ে উঠবে তোমার নিরালা আস্তানায়। তার আগেই যেন পৌঁছতে পারি আমি। অন্ততঃ তিনটে রাত যদি তিষ্ঠোতে না পারি তোমার দরবারে তাহলে যে আশায় যাচ্ছি সে আশায় ছাই পড়বে।

যাকে বলে উর্ধ্বশ্বাসে চলা। ডাইনে বাঁয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে প্রাণপণে উঠে যাচ্ছি। চড়াই ভেঙে উঠতে বেশী সময় লাগে, হাঁফ ধরে, তেষ্টা পায়। কে তখন খেয়াল করে ওসব। সন্ধ্যার আগেই ধ্বসটা পার হতে চাই। সাহেবের লোক হয়তো পেছনে ছুটে আসছে।

সময়ের হিসেব বলতে পারব না, দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে, পৌঁছলাম যেখানে ধ্বস নেমেছে। পৌঁছেই ভয়ানক ঘাবড়ে গেলাম। জনপ্রাণী নেই, অতি হিংস্র হিমেল হাওয়া অতি ভয়াবহ আর্তনাদ করতে করতে চতুর্দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। বুকের ভেতর কেঁপে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে শীত করছে। গৌরীকুণ্ড থেকে রওয়ানা হবার পর শীত গ্রীষ্ম সম্বন্ধে হুঁশ ছিল না। কোন রকমে রামওয়াড়া পৌঁছতে পারলে হয়, এইটুকুই ছিল ধ্যান-জ্ঞান। রামওয়াড়া পৌঁছতে

পারলে বিস্তর মানুষ দেখতে পাব। রাস্তা মেরামত করতে কত মানুষ জমা হয় তা আমি জানি। হয়তো এটাও আশা করেছিলাম যে আর একটি মনের মত রাস্তা বানাবার হাকিমও কপালে জুটে যাবে। তারপর কি হবে সেটা ভাবি নি। হবেই কিছু একটা, মানুষ যেখানে আছে সেখানে একটা না একটা উপায় হবেই।

কোথায় মানুষ!

বরফ, সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে মায় পায়ের তলায় সর্বত্র সাদা বরফ। অগুনতি উলঙ্গ সাদা পিশাচ পিশাচী বরফের ভেতর থেকে বেরিয়ে আমার চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে হাহা হিহি করে হাসি জুড়ে দিলে যেন। প্রাণপণে দু চোখ বুজে দু হাতে দু কান চেপে উবু হয়ে বসে পড়লাম।

"অলৌকিক কিছু ঘটেছে কি আপনার জীবনে?" অনেকবার এই প্রশ্নটি শুনতে হয়েছে আমাকে। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছি। কারণ হচ্ছে, আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারি না যে অলৌকিক বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু ব্যাপার ঘটতে পারে। আরও সোজা কথায় বলা যায় যে অলৌকিক কাণ্ড কি ব্যাপার তা আমি ধারণা করতেই পারি না।

এই সেদিন একটা নতুন কথা শুনলাম। এক মহাত্মা, নাম পরিচয় দিতে পারব না, বললেন আমাকে—"বাপু হে, তোমার ধাতটাই এমন যে এ পর্যন্ত যা তুমি দেখেছ শুনেছ জেনেছ তা তুমি নিজেই বিশ্বাস কর না।"

ঠিক তাই, ধাতই বটে। জীবনের একেবারে শেষ ভাগে পৌঁছে আজ বুঝতে পারছি যে আমার বদখত ধাতের জন্যেই সমস্ত ভেস্তে গেল। বহুবার নাকি সুবর্ণ সুযোগ এসেছে জীবনে আর ফসকে গেছে। বুঝতেই পারি নি কি ঘটছে। যা ঘটার তাই ঘটছে, অলৌকিক কিছুই ঘটছে না, আঁতকে উঠে আঁকুপাঁকু করবার মত ব্যাপার নয় কিছু, এই

রকমের একটা অসাড় অবস্থায় সারাটা জীবন কেটে গেল। এজন্যে দোষ দোব কাকে? ধাতই বটে।

এখন আমার পক্ষে যতটা সম্ভব গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করছি কি ঘটেছিল সেদিন সেই ধ্বসটার সামনে। এর মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার কিছু আছে কি না সে বিচার করুন তাঁরা যাঁরা অলৌকিকতা বিশ্বাস করেন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গেছি তখন আমি, কোনও কিছুই বুদ্ধি দিয়ে তলিয়ে বোঝার শক্তি ছিল না তখন। চরম নির্লিপ্ততা এসে গেছে, স্রেফ তাকিয়ে দেখেছি যা ঘটছে। ব্যাপারটার সঙ্গে যে বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ আছে আমার সে বোধটুকুও তখন ছিল না।

কার্য্যং যত্রবিভাব্যতে কিমপি তৎ স্পন্দেন সব্যাপকম,
স্পন্দশ্চাপি তথা জগৎসু বিদিতং শব্দান্বয়ী সর্বদা।

যেখানে কোনও রকম কর্ম হচ্ছে সেখানে কম্পন হবেই, যেখানে কম্পন হচ্ছে সেখানে শব্দও নিশ্চয়ই হচ্ছে। ঐ শব্দটুকুই টের পেলাম। শব্দটা শুনতে পেয়েছিলাম বললে ভুল বলা হবে, শুনতে পাই নি টেরই পেয়েছিলাম। অবিশ্রান্ত ঝড়ের গর্জন চলছে, সেই শব্দ থেকে রেহাই পাবার জন্যে দু হাতে দু কান চেপে মাথা হেঁট করে উবু হয়ে বসেছি, হঠাৎ অন্যরকম একটা শব্দ হল পেছনে। খুব ভারী একটা কিছু যেন ধপ্‌ করে পড়ল। মুখও তুললাম না, চোখও চাইলাম না, যেভাবে ছিলাম সেই ভাবেই রইলাম। যা হয় হোক, চরম ক্ষণটির জন্যে তৈরী হয়ে আছি। মরণটা কি ব্যাপার সঠিক ভাবে বোঝা চাই। দেহ ছেড়ে প্রাণটা যখন বেরিয়ে যাবে তখন কেমন লাগবে সেইটুকু জানতে হবে, কোনও মতেই অন্যমনস্ক হওয়া চলবে না।

অদ্ভুত কাণ্ড! হঠাৎ দেখি, একটা লোক উবু হয়ে বসে আছে আমার সামনে। এমনভাবে মুড়ি দিয়েছে কম্বল যে লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। ও আবার কে? কোথা থেকে কখন এল ও?

আরে ও আবার কে!

যে লোকটা বসে আছে কম্বল মুড়ি দিয়ে তার পেছনে আর একজন এসে দাঁড়িয়েছে। একটা বুড়ী, ছেঁড়াখোঁড়া কম্বলের একটা লম্বা জামা পরে আছে বুড়ীটা, কোমরে একটা কি জড়ানো রয়েছে। ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলাম বুড়ীর মুখটা। আরে একে তো চিনি আমি! কোথায় যেন দেখেছি!

কোথায় যে দেখেছি বুড়ীকে কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

দেখছি তখন বুড়ী কি করছে। যে লোকটা বসেছিল উবু হয়ে তাকে ধরে খাড়া করল বুড়ী। খাড়া করবার পরেও তার মুখের ওপর থেকে কম্বল সরে গেল না। তারপর বুড়ী তাকে টেনে নিয়ে চলল। টেনে নিয়ে যাবার জন্যে নিজের কোমরে জড়ানো কাপড়টা খুলে লোকটার কোমরে জড়ালে। সেইটে ধরেই টানতে টানতে নিয়ে চলল।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দেখতে হবে। আমিও চললাম ওদের পিছু পিছু। ধ্বস নেমে বিরাট এক খাদ তৈরী হয়েছে; নামলাম সেই খাদে। খাদটার তলায় নেমে আবার উঠতে লাগলাম। কোথায় পা দিচ্ছি, কিসের ওপর পা দিচ্ছি, দেখবার অবকাশ নেই তখন। নজর রাখছি সামনের সেই বুড়ীটা আর লোকটার ওপর। খাদ পার হয়েও বুড়ী সেই লোকটাকে ছাড়ল না, সমানে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

বেশ চলেছি। বরফের ওপর দিয়ে চলেছি। আলো কমে আসছে। কমলে হবে কি, বরফের ভেতর থেকে অন্য রকমের আলো বেরোচ্ছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু। দেখতে পাচ্ছি কয়েক হাত সামনে সেই লোকটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বুড়ী। আমিও যেন বাঁধা পড়েছি সেই লোকটার সঙ্গে। কিভাবে বাঁধা পড়েছি বুঝতে পারছি না।

ওরা থামল। আমিও থামলাম। ঘুরে দাঁড়াল বুড়ী। মুখটা আবার দেখতে পেলাম। আমার মুখপানে তাকিয়ে কি যেন বলল বুড়ীটা। একবার দুবার তিনবার বলল। তিনবার বলবার পরে সাংঘাতিক রকম চমকে উঠলাম। আরে ঠিক তো! এই বুড়ীই তো উত্তরকাশীতে আমার কাছ থেকে হালুয়া নিত!

ঐ চমকানিটাই হল কাল। সর্বনাশ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কি যে হল বুঝতেই পারলাম না। অসহ্য যন্ত্রণায় প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে কানে গেল মানুষের কণ্ঠস্বর। মানুষের না দেবতার তাও বুঝতে পারলাম না। বহুকষ্টে চোখ মেলে তাকালাম। দেখলাম একখানি মুখ, সত্যিকারের রক্ত-মাংসের মুখ। কানে গেল—"ডরো মৎ বেটা, ডরো মৎ, বাবা তুমকো পার লাগায়া।"

বাবা কি উপায়ে পার লাগালেন তার যথাযথ বর্ণনা দিলাম। কজন বিশ্বাস করবেন জানি না। ওর মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার কি আছে তা আমি নিজেও বলতে পারব না। মোটের ওপর এটা ঠিকই যে এই পঞ্চভৌতিক দেহটা সেই ধ্বস পার হয়ে কেদারনাথে গিয়ে পৌঁছেছিল। প্রায় দেড় বছর পরে আর একবার গিয়েছিলাম কেদারনাথে, গৌরীকুণ্ড থেকে রামওয়াড়া, রামওয়াড়া থেকে কেদারনাথ সজ্ঞানে সুস্থচিত্তে গিয়েছিলাম যেমন ভাবে সবাই যায়। ঠাণ্ডা বরফ ঝড় বৃষ্টি সবই ছিল ওখানে। হাজার হাজার যাত্রী প্রতি বছর যায় আসে, ঠাণ্ডা বরফ ঝড়বৃষ্টিকে কেউ পরোয়া করে না। কষ্ট তো খানিকটা আছেই, কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায়। কেদারনাথ দর্শন তো আর যার তার কপালে ঘটে ওঠে না।

দ্বিতীয়বার কেদারনাথে গিয়ে জানতে পারলাম, জানতে পারলাম বলাটা ঠিক হবে না, বলা উচিত শুনতে পেলাম প্রথমবার আমার দেহটা কি উপায়ে কেদারনাথে পৌঁছেছিল। মহাত্মা দেবীদাস বাবার সঙ্গী হয়েছিলাম সেবার। উনি চলেছিলেন কালীমঠে মহাকালী দর্শন করতে। কেদারনাথ দর্শন করে কালীমঠে গেলেন। দেবীদাসের সঙ্গে আমি কালীমঠের মহাকালী আর মদমহেশ্বর দর্শন করেছিলাম।

যাঁরা জুনাগড় গেছেন, গিরনার পাহাড়ে গুরু দত্তাত্রেয়র চরণছাপ দেখেছেন যাঁরা, তাঁরা হয়তো দেবীদাস বাবার আশ্রম দেখে থাকবেন। উজ্জয়িনীতে দত্তাত্রেয় মঠ আছে। সেই মঠের মহামণ্ডলেশ্বর ছিলেন

দেবীদাস। গদি ত্যাগ করে গিরনার চলে গেলেন। গুরু দত্তাত্রেয়র চরণছাপ যেখানে রয়েছে সেখানে থাকা চাই। ওটা হল একটা কথার কথা, কোথাও ঘর বেঁধে থাকবার পাত্র কি না দেবীদাস যে গিরনারে বসে থাকবেন। ব্রাহ্মাবধূত পরমহংস দেবীদাস হরদম ঘুরে বেড়াতেন। তিনবার দর্শন পেয়েছি আমি তাঁর। প্রথমবার কামাখ্যায়, দ্বিতীয়বার গোপেশ্বরে, তৃতীয়বার এই বাঙলা দেশে তারাপীঠে। গোপেশ্বরে পড়েছিলাম অনেক দিন। রুদ্রকেদার যাবার মতলবে ছিলাম। রুদ্রকেদার থেকে পাণ্ডুসেরা যাওয়া যায়। পাণ্ডুসেরা হল সেই জায়গা যেখানে দ্রৌপদী গায়ের গয়নাগুলো খুলে ফেলে দিয়ে গেছেন। রুদ্রকেদার পাণ্ডুসেরার কাহিনী সুবিধে পেলে পরে বলব। এখন দ্বিতীয়বার কেদার দর্শনের কাহিনীটি বলি।

রামওয়াড়া পৌঁছে দেবীদাস বললেন—"এইখানে তুমি একবার তোমার ঐ খোলসটা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলে।"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকিয়ে রইলাম ওঁর চোখের পানে। কি করে উনি জানতে পারলেন যে আর একবার আমি কেদারনাথে এসেছি!

"দেহটা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলে, দেখেছিলে যে তোমার দেহটাকে কেউ টেনে নিয়ে চলেছে। অসম্ভব সম্ভব হল, যে জায়গা কোনও মতেই মানুষ পার হতে পারে না, সেই জায়গা নির্বিঘ্নে পার্ হয়ে তোমার দেহ কেদারনাথে পৌঁছে গেল। তারপর তুমি আবার দেহের মধ্যে আশ্রয় নিলে। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল নিজে থেকে। কি করে যে ঘটল তা তুমি নিজেও জান না।" ঐটুকু বলে দেবীদাস নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। মাথমুণ্ড কিছুই বুঝলাম না।

কেদারে পৌঁছে দেবীদাস বললেন—"এইখানে তুমি সেবার নাদ শুনেছিলে। বহুদিন ধরে চেষ্টা করলে মন বুদ্ধি আজ্ঞাচক্রে লীন হয়ে যায়। তখন হয় আত্মদর্শন। আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নাদানুভূতি হয়।

আত্মদর্শনমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ন সংশয়।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন কর্তব্যং স্বাত্মদর্শনম্॥

এই আত্মদর্শন যে কার কিভাবে হবে তা কেউ বলতে পারে না। যোগশাস্ত্রে কত রকমের উপায় বলা হয়েছে। কিছুই তোমাকে করতে হয় নি, সবই হয়ে গেল।"

তারপর দেবীদাস নাদ সম্বন্ধে অনেক কথা শোনালেন। নাদ চার প্রকার—পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী। যোগী একেবারে শেষ অবস্থায় অর্থাৎ সাধনার সর্বোচ্চশিখরে পৌঁছে সহস্রার মধ্যে যে নাদ শোনেন তার নাম আদিনাদ বা পরানাদ। পশ্যন্তিনাদ আজ্ঞাচক্রে অনুভব করা যায়। মধ্যমানাদ অনাহতচক্রে শোনা যায়। আর বৈখরীনাদ শোনা যায় বা অনুভব করা যায় মূলাধার চক্রে। যে নাদ আমি শুনেছি তা আমার শরীরের মধ্যে মূলাধার থেকে নাভিতে উঠেছিল। এই নাদ দশ রকমের হতে পারে। পাখী ডাকছে বা ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে এই রকম ব্যাপার হলে সে নাদের নাম চেকিতান। ছোট ঘণ্টা বাজালে যেমন টুং টাং আওয়াজ হয় সেই রকম আওয়াজ শোনা যায়। অনবরত শাঁখ বাজার শব্দ শুনতে পাচ্ছি বলে অনেকে মনে করেন। অনেক দূরে কেউ যেন বীণায় ঝঙ্কার তুলেছে এ রকমও মনে হতে পারে। কিংবা বাঁশীর শব্দ বা মৃদঙ্গধ্বনি। সমুদ্রতীরে বসে যে গর্জন শোনা যায় সে রকমও হতে পারে। এমন কি মেঘডাকার শব্দও কেউ কেউ শোনেন। ঐ নাদ শুনতে শুরু করলে সাধকের মন বুদ্ধিনাদেই লয় হয়ে যায়। আত্মদর্শন আর নাদানুভূতিকে লয়-যোগ বলে।

যা বলে বলুক, আমি কিন্তু সত্যিই জানতাম না যে নাদানুভূতির মত সাংঘাতিক কাণ্ড একটা ঘটে গেছে আমার জীবনে। যা হয়েছিল তা এখন বলছি।

কাশীতে আমি যে কালীর পূজা করে পেট চালাতাম সেই কালী-বাড়িতে অনেকগুলি ভাড়াটে ছিল। একজন ছিলেন মিনুর মা, সেই মিনুর মা তাঁর অতি বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কাশীবাস করছিলেন। মিনুর মাকে আমি মা বলতাম। সুতরাং মিনুর মায়ের মা হলেন দিদিমা।

বুড়ী দিদিমা কেদার-বদরী করে এসেছিলেন। প্রায়ই তিনি

শোনাতেন আমাকে কেদারনাথের মহিমা। তিন রাত কেদারনাথে বাস করতে পারলে আর সত্যিকারের ভাগ্যবান হলে শুনতে পাওয়া যায় আরতির বাদ্যধ্বনি, গভীর রাতে দেবতারা আরতি করেন কেদার-নাথের, ঘড়ি ঘণ্টা কাঁসর বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্। সে এক অদ্ভুত বাজনা, অমন বাজনা শুধু দেবতারাই বাজাতে পারেন। বহু ভাগ্যে সেই বাজনা শুনতে পায় কেউ কেউ। একবার যদি শোনে তাহলে জীবনে কখনও ভুলতে পারে না।

ঐ কথা বহুবার শুনেছিলাম মিনুর মায়ের মুখে। বিশ্বাসও করি নি অবিশ্বাসও করি নি, কথাগুলো কিন্তু মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। নব্বুই বছরেরও বেশী তখন দিদিমার বয়েস, কেদারনাথের ঐ আরতির কথা বলতে বলতে কেমন যেন একটা জ্যোতি ফুটে উঠত বুড়ীর চোখে মুখে। ঐ জ্যোতিটা হল বিশুদ্ধ বিশ্বাসের জ্যোতি, ওটা এমন মারাত্মক ছোঁয়াচে ব্যাপার যে অতি অবিশ্বাস্য কথাও শ্রোতার মনে দাগ কাটে। অতি সঙ্গোপনে লুকিয়ে নিয়ে চলেছিলাম ঐ মনের দাগটাকে, কেদার-নাথে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে আমার ভাগ্যের দৌড় কতখানি। ভাগ্য ভাল হলে নিশ্চয়ই সেই অপার্থিব আরতির বাজনা শুনতে পাব।

পেয়েও ছিলাম। বছর দেড়েক বাদে দেবীদাস কেদারনাথে বসেই শোনালেন যে ওটা নাদ, ওটা নাকি আমার নাভিচক্রেই জন্মেছিল। বিস্তর যোগ অভ্যাসের ফলে সাধকরা নাকি ঐ নাদ শুনতে পান। ঐ নাদেই নাকি চিত্তবৃত্তির লয় হয়।

ভগবানই জানেন, চিত্তবৃত্তির লয় বলতে কি বোঝায়!

এখন শোনাই, প্রথমবার কেদারনাথে গিয়ে কি হয়েছিল এবং কি শুনেছিলাম।

যিনি আমাকে "ডরো মৎ বেটা" বলে অভয় দিয়েছিলেন তিনি কেদারে সারা বছর বাস করতেন। মন্দির যখন বন্ধ হয়ে যেত, এক প্রাণী থাকত না কেদারে, বরফের তলায় ঘর বাড়ি মন্দির ডুবে যেত,

তখনও সেই মহাত্মা কেদারে থাকতেন। যাঁরা কেদারে গেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁকে দেখেছেন। নাম ফলহারী বাবা। শুধু ফল খেয়ে জীবন যাপন করতেন, এবং সে ফল হচ্ছে আলু। শীতকালের জন্যে কিছু আলু আর কিছু কাঠ রাখতেন ফলহারী বাবা। ঐতেই ছমাস চলে যেত।

জানি না ফলহারী বাবা দেহরক্ষা করেছেন কিনা। ওঁর কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। প্রতি বছর দীর্ঘ ছমাস সারা দুনিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না কেদারের, বরফের তলায় সব কিছু তলিয়ে যায়। কল্পনা করতে গেলেও বুক কেঁপে ওঠে সেই নির্জনতা। সেইখানে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছেন একজন। কেন করছেন?

এই কেনটার জবাব কে দেবে!

যদি বলি দয়া মায়া ইত্যাদি গুণগুলো বা দোষগুলো বা দুর্বলতা-গুলো ধ্বংস করে ছেড়েছিলেন তিনি তাহলে ভুল বলা হবে। দু-দু-বার আমাকেই তিনি ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন বরফের ভেতর থেকে। তাঁর নিজের কাছে রেখে গনগনে কাঠকয়লার আগুনে সেঁকেছিলেন। ঐটুকু যদি না করতেন তাহলে আজ আমি থাকতাম কোথায়? এই কাহিনী লিখত কে? সুতরাং আমি অন্ততঃ মানতে রাজী নই যে ফলহারী বাবার দয়া মায়া মনুষ্যত্ব কিছুই ছিল না। সবই ছিল, সাধারণের চেয়ে হয়তো কিছু বেশী পরিমাণেই ছিল। ছিল বলেই হয়তো ফলহারী বাবা ঐরকম নির্মমভাবে নিজেকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। হয়তো তাও ঠিক নয়, নীলকণ্ঠের স্বরূপ যিনি ষোল আনা জানতে পারেন তাঁর পক্ষে হয়তো ঐভাবে একলা বেঁচে থাকা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নেই। বিলকুল যদি বিষময় বলে মনে হয় তাহলে কার সাধ্য সেই বিষময় সংসারে তিষ্ঠোতে পারে।

অথবা ও-সবও ভুল। ফলহারী বাবা আকণ্ঠ অমৃত পান করে বুঁদ হয়ে গিয়েছিলেন। যে আনন্দ থেকে চৈতন্য লাভ হয়, সেই আনন্দ-স্বরূপ চৈতন্যের নাগাল পেয়েছিলেন। সত্য শিব সুন্দরের নাগাল পেয়ে গেলে কে আর ধরণীর ধুলায় গড়াগড়ি খেতে আসে।

কেদারনাথে ধরণীর ধূলি পৌঁছতে পারে না। শুধু বরফ, দয়া মায়া মমতা যে বরফের ধারে কাছে পৌঁছতে পারে না, সেই বরফের ওপর কেদারনাথের মন্দিরের সামনে বেহুঁশ অবস্থায় নাকি খাড়া ছিলাম আমি। ফলহারী বাবা জানতে পেরেছিলেন। আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে আমাকে অভয় দিয়েছিলেন—"ডরো মৎ" বলে। ধরে এনে নিজের কাছে ফেলে রেখেছিলেন। ওখানে কালীকম্বলীর ছত্র ছিল তখন, সেই ছত্রটি যিনি পরিচালনা করতেন, তাঁকে শোনাচ্ছিলেন ফলহারী বাবা কোথায় পেলেন আমাকে। আমিও শুনলাম।

কদর বেড়ে গেল আমার। উখীমঠের তরফ থেকে যিনি পূজা করতেন কেদারনাথের, জানি না তিনিই স্বয়ং উখীমঠের মোহান্ত মহারাজ কি না, তিনি চলে এলেন ফলহারী বাবার আস্তানায়। এসে আমার মত একটা সাংঘাতিক জীবকে দেখে গেলেন। সবসুদ্ধ বোধহয় দশ জন লোকও ছিলেন না তখন কেদারে। যাঁরা ছিলেন তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলেন চাঙ্গা করে তোলবার জন্যে আমাকে। অতি বিশুদ্ধ শিলাজতু গরম ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো হতে লাগল আমাকে। গরম হল শরীর, রক্ত চলাচল ঠিকভাবে করতে লাগল। সন্ধ্যার সময় চলে গেলাম মন্দিরে। আরতি দেখলাম। একমাত্র আমিই দর্শক। যিনি আরতি করলেন তিনি বললেন, কেদারনাথকে বুক দিয়ে স্পর্শ করতে হয়। তাই করলাম, কম্বল খুলে নিচু হয়ে বুক চেপে রইলাম কিছুক্ষণ সেই হিমশিলার ওপর। পূজারী তখন বলছেন—"মাঙ্ লেও, যো কুছ মাঙ্না হায় মাঙ্ লেও আভি।"

কি চাওয়া যায়?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মিনুর মায়ের মায়ের কথা। ইস্—ভয়ানক ভুল হয়ে যাচ্ছিল তো!

চাইলাম। মনে মনে বললাম—"ভোলানাথ, সত্যিই যদি কিছু-মাত্র সুকৃতি থাকে আমার তাহলে সেই বাদ্যধ্বনি যেন আমি শুনতে পাই। দেবতারা যখন আরতি করেন তোমার তখন যে বাজনা বাজে

তাই আমি একটিবার শুনতে চাই। জীবন সার্থক হবে আমার, জন্ম সার্থক হবে।"

সোজা হয়ে দাঁড়ালাম ঐ প্রার্থনাটি নিবেদন করে। মস্ত বড় এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা কেদারের ওপর থেকে তুলে পূজারী আমার গলায় দিলেন। মালাটার পঁচিশ-ত্রিশটা দানা এখনও আমার কাছে রয়েছে। বাকীগুলো সব ফাটতে ফাটতে খসে গেছে।

ফিরে এলাম ফলহারী বাবার কাছে। কাঠের একখানি দোতলা। ওপরতলায় ছোট্ট একখানি ঘরে বাবা থাকতেন। ঘরের সামনে বারান্দা, বারান্দাও ঢাকা। বারান্দায় ঠিক দরজার পাশে আমার জন্যে অনেকগুলো কম্বল জড়ো হয়েছিল। কালীকম্বলী ছত্রের সন্ন্যাসী মহারাজ কম্বলগুলো দিয়েছিলেন।

ঢুকলাম কম্বলের গাদায়। একবাটি গরম ঘি গিলতে হল। রাস্তা বন্ধ, দুধ আসবার উপায় নেই নিচে থেকে। একমাত্র ঘি সম্বল। ফলহারী বাবার হুকুমে ছত্র থেকে ঘি আসতে লাগল।

কেদারনাথে দ্বিতীয় রাত! প্রথম রাতটি কেটেছিল সম্পূর্ণ বেহুঁশ অবস্থায়, দ্বিতীয় রাত কাটল ঘুমিয়ে। গরম ঘি, শিলাজতু, একগাদা কম্বল আর গনগনে কাঠকয়লার আগুন, এতগুলো উপচারকে অবজ্ঞা করে জেগে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ে গেল সেই আরতির কথা। হায় হায়, কি করলাম! কেন মরতে ঘুমোতে শুলাম! জেগে থাকলে নিশ্চয়ই শোনা যেত সেই অপার্থিব বাজনা। পোড়া কপাল আর কাকে বলে!

সারাটা দিন নিজের পোড়া কপালের জ্বালায় জ্বলে মলাম। সন্ধ্যা হল। দেখে এলাম আবার আরতি। মন্দিরেই প্রতিজ্ঞা করে এলাম যে কোনও মতেই ঘুমিয়ে পড়ব না। রাত্রে কিছুই খেলাম না, আগুনের আংটা তফাতে সরিয়ে রেখে দিলাম। একখানি মাত্র কম্বল

মুড়ি দিয়ে সোজা হয়ে বসে রইলাম। করুক শীত, দুর্দান্ত শীত করলে নিশ্চয়ই ঘুম আসবে না।

হায় ভগবান! সারা দুনিয়ার সমস্ত লোকের চোখের ঘুম এক সঙ্গে দলা পাকিয়ে আমার মাথায় চেপে বসল। উঠে পড়লাম, নিঃশব্দে ঘুরতে লাগলাম সেই ছোট্ট বারান্দায়। তাতেও কি রেহাই আছে? ঘুমের দাপটে টলে পড়বার উপক্রম। বসলাম আবার শিরদাঁড়া সোজা করে। কুম্ভক করে থাকলে ঘুম দূর হয় বলে শুনেছিলাম। অতএব লাগাও কুম্ভক।

কুম্ভকই মাথা খেলে। ফলহারী বাবার ডাকাডাকিতে চোখ মেলে দেখি দিনের আলো ফুটে উঠেছে। তারপর মালুম হল যে কম্বলের গাদায় ঢুকে শুয়ে আছি।

ফলহারী বাবা ধমকাতে লাগলেন একখানি মাত্র কম্বল গায়ে জড়িয়ে ঘুমোবার জন্যে। বললেন—"চালাকি করতে যেও না বরফের সঙ্গে। এ বড় বিষম স্থান, এখানে চালাকি করতে গেলে পঙ্গু হয়ে যাবে। ভাগ্যে আমি বেরিয়েছিলাম রাত্রে, বেরিয়ে দেখি একখানা কম্বল জড়িয়ে বসে বসে ঘুমোচ্ছ। তাড়াতাড়ি কম্বলের মধ্যে ফেলে কম্বল চাপা দিয়ে দিলাম। ঐভাবে সারারাত বসে থাকলে হাত-পা আর নাড়তে হত না।"

কেদারনাথে তৃতীয় রাত কাটল।

চতুর্থ রাত।

সন্ধ্যায় আরতি দেখতেও গেলাম না। কি লাভ ঐ মানুষের দ্বারা পাষাণের আরতি দেখে। প্রমাণ হয়ে গেছে যে কতখানি হতভাগ্য আমি। রাতটা কোনও মতে কাটলে হয়, সকাল হলেই পালাব। শুনতে পাচ্ছি রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে। রাস্তার জন্যে কিছুই আসবে যাবে না। এ জীবন থাকলেই বা কি গেলেই বা কি।

সারাটা দিন নিরম্বু উপোস করে কাটালাম। দু-তিনবার খাওয়াবার

জন্যে চেষ্টা করলেন ফলহারী বাবা, মাথা হেঁট করে বসে রইলাম, উনি হার মানলেন। সন্ধ্যার আগেই শুয়ে পড়লাম কম্বলের গাদায় ঢুকে। জেগে থাকবার চেষ্টা করেও লাভ নেই। আমার মত মহাপাপীকে কৃপা করবেন না কেদারনাথ, এমন কি তপস্যা করেছি আমি যে ঐ পাষাণের হৃদয় গলাতে পারব !

কি রকম যেন একটা জ্বালা ধরে গেল মাথার মধ্যে। জ্বলুনিটা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা শরীরে। অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করে শেষে শরীর ঝিমিয়ে এল। তারপর এক সময় জ্বালা-যন্ত্রণা সব ভুলে গেলাম।

কালনিদ্রা ! কালনিদ্রার কবলে পড়লে কি কেউ স্বপ্ন দেখতে পারে !

স্বপ্নটা স্বপ্ন না বাস্তব সেইটুকুই হল প্রশ্ন।

স্বপ্ন ভঙ্গ হল যখন তখন বুঝতে পারলাম যে খোলা আকাশের তলায় বরফের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি। কম্বল একখানা জড়ানো রয়েছে গায়ে, কম্বলের ওপর বরফ জমে উঠেছে। চুল দাড়ি সাদা হয়ে গেছে বরফে। ফলহারী বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক হাত সামনে, নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রয়েছেন আমার চোখের পানে।

চোখ দিয়েই দেখছি তখন সমস্ত, যা হচ্ছে বুঝতেও পারছি। কিন্তু সেই দেখা বোঝার সঙ্গে আমার যেন কোনও সম্বন্ধ নেই। আমার মন বুদ্ধি চৈতন্য তখন আটকে গেছে অন্য জায়গায়। শুনছি, অনবরত শুনছি এক বিচিত্র বাজনা। ঝম্ ঝম্ ঝম্, একতালে বাজছে ঘণ্টা ঘড়ি মৃদঙ্গ, খুবই বিলম্বিত লয়ে বাজছে। সেই তালে নাচছে যেন কারা ঝুমুর বেঁধে পায়ে। নাচছে নিশ্চয়ই, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ঝুমুরের শব্দ, না নাচলে ঝুমুরের শব্দ উঠবে কেন ?

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুললেন আমাকে ফলহারী বাবা। নিজের পায়েই উঠলাম। বসিয়ে দিলেন কম্বলগুলোর ওপর। সামনে পেছনে দুটো আংটা জ্বলতে লাগল। চুলদাড়িতে বরফ জমেছিল,

গলে জল হয়ে কাপড় কম্বল ভিজিয়ে দিলে। সমস্তই বুঝতে পারছি, নির্বিকারভাবে তাকিয়ে দেখছি। ঐ পর্যন্তই, শুনছি শুধু ঝম্ ঝম্ ঝম্, কোথায় হচ্ছে বাজনাটা সে প্রশ্নও মনে জাগছে না।

সকাল হল, সন্ধ্যা হল, ফের সকাল হল। কিছুই জানতে পারলাম না। সময় থেমে গিয়েছিল। অথবা এ কথাও বলা যায় যে কালের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। আমাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে সময় সকাল সন্ধ্যার সিঁড়ি বেয়ে নেমে অতলে তলিয়ে যেতে লাগল। ফের যখন পেঁচিয়ে ধরল আমাকে কাল, কালের টানে আবার যখন চলতে শুরু করলাম, তখন শুনতে পেলাম যে একটানা তিন রাত তিন দিন আমি বেহুঁশ অবস্থায় কাটিয়েছি।

দিন পাঁচেক পরে ফলহারী বাবা তাড়ালেন আমাকে। রাস্তা তখন খুলে গেছে। নেপালের এক মহামান্য রাণা সাহেব কেদার দর্শনে গিয়েছিলেন। ফলহারী বাবার ভক্ত তিনি। বাবা তাঁকে আদেশ করলেন আমাকে সঙ্গে নেবার জন্যে। আমি নাকি মহাসৌভাগ্যবান, কেদারনাথ কৃপা করেছেন নাকি আমাকে। অতএব খুব সাবধানে আমাকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণটিও বলে দিলেন রাণাকে। ঐ রকমই নাকি হয়, কেদারনাথের কৃপালাভ করলে কিছুদিন নাকি সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

যা ঘটেছিল কেদারনাথে প্রথমবার, সমস্তই বলা হয়ে গেল। ঐ ব্যাপারটার নাম যদি নাদানুভূতি হয় তাহলে মানতেই হবে যে তপস্যা যোগাভ্যাস সাধন-ভজন না করলেও নাদানুভূতি হয়। বিশ্বনাথের বিশ্বে কত কাণ্ডই যে ঘটে চলেছে নিজে থেকে! সমস্ত ব্যাপারই যে নির্দিষ্ট আইন-কানুন মাফিক ঘটবে এমনই বা কোন্ মাথার দিব্যি দেওয়া আছে!

শিরঃকপালবিবরে ধ্যায়েৎ দুগ্ধমহোদধিম্।

মাথার মধ্যে কপালের পেছনে যে ব্রহ্মরন্ধ্র আছে সেইখানে দুগ্ধ

মহাসমুদ্র চিন্তা করতে হবে। কালীমঠে মহাকালীর মন্দিরে দেবীদাস আমাকে শেখাচ্ছিলেন কি উপায়ে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়া যায়। সর্বপ্রথম জীবাত্মাকে নিজের কপালের মধ্যে স্থিরভাবে রাখতে হবে। ধ্যান করতে হবে দুধের মহাসমুদ্র যে সমুদ্র রয়েছে ব্রহ্মরন্ধ্রের ভেতর। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার যখন সেই দুধের সমুদ্রে লয় হয়ে গেল তখন—

অত্র স্থিত্বা সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ ॥

সহস্রদল-কমলের নিচে যে চন্দ্রমণ্ডল আছে সেই চন্দ্রমণ্ডলকে চিন্তা কর।

কে করবে চিন্তা? জীবাত্মা যদি লয় হয়েই যায় দুধ-মহাসমুদ্রে তখন আবার নতুন করে চন্দ্রমণ্ডলের চিন্তাটা করছে কে?

যাক গে বাবা, মৌন হয়ে আছি, কোনও প্রশ্ন করার উপায় নেই। যা বলছেন শুনে যাই।

শিরঃকপালবিবরে দ্বিরষ্টকলয়া যুতঃ।
পীযূষভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনম্ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে ষোড়শবালাযুক্ত যে পীযূষভানু আছেন, পীযূষভানু মানে অমৃতবর্ষী চন্দ্র, তিনিই হংসঃ, অর্থাৎ পরমাত্মা নিরঞ্জন। সেই নিরঞ্জনের ধ্যান করতে হবে।

ষোলটি বালার নাম হচ্ছে—কৃপা মৃদুতা ধৈর্য বৈরাগ্য ধৃতি সম্পৎ হাস্য রোমাঞ্চ বিনয় ধ্যান সুস্থিরতা গাম্ভীর্য উদ্যম আক্ষোভ ঔদার্য একাগ্রতা।

আবার সেই চক্র আর পদ্ম! ঐ ছাই হযবরল কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। অতগুলো পদ্ম, কোন্ পদ্মের কটি পাপড়ি, পাপড়িগুলোর রঙ কি, কোন্ পাপড়িতে কে অধিষ্ঠান করছেন, আস্ত এক মহাভারত মনে রাখতে হবে। মন যদি ঐ পদ্ম আর পাপড়ি নিয়েই খেপে রইল তাহলে মনের হাত থেকে রেহাই পাব কেমন করে!

মনোমূর্চ্ছাং সমাসাদ্য মন আত্মনি যোজয়েৎ।

আসল কথাটা হল মনকে মূর্ছিত করে ফেলা। কি করে ঐ কর্মটি করা যায় সেইটুকুই জানতে চাই। চক্র আর পদ্মের কুলজি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

দেবীদাস বুঝতে পারলেন। কি করে বুঝলেন তা জানি না। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন—"মন কি ?"

বেশ কিছুক্ষণ আমার চোখের পানে তাকিয়ে থেকে বললেন—"জানই না মন কি পদার্থ। যতক্ষণ না জানতে পারছ মন কি জিনিস বা মন কোথায় আছে ততক্ষণ মনকে জব্দ করবে কেমন করে ?"

হঠাৎ দেবীদাস হাত বাড়িয়ে আমার কপাল স্পর্শ করলেন। মনে হল, ত্নই ভুরুর মাঝখানে ছেঁকা লাগল। লাফিয়ে উঠতে গেলাম যেন, যন্ত্রণার চোটে চিৎকার করতে গেলাম। অনেক কিছুই করতে চেষ্টা করলাম একসঙ্গে। কিন্তু সে ঐ নিমেষের মধ্যে। তারপর একদম ফরসা, জ্বালা-যন্ত্রণা কিচ্ছু নেই।

জ্যোৎস্নায় ডুবে রয়েছি যেন। নিষ্কলঙ্ক জ্যোৎস্না, কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। একটিমাত্র নক্ষত্র জ্বলছে সেই জ্যোৎস্নায়, নক্ষত্রটি নীল। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি এত কাছে সেই নীল নক্ষত্রটি জ্বলছে। নীল নক্ষত্রটির দিকে তাকিয়ে আছি। একটু একটু করে নক্ষত্রটি সরে আসছে। সরে আসতে আসতে একেবারে চোখের ত্নই আঙ্গুল সামনে উপস্থিত হল। তখনও তাকিয়ে আছি, আরও কাছে এসে পড়ল নক্ষত্রটি, ঠেকে গেল বুঝি কপালের সঙ্গে। এ কি হল!

নক্ষত্রটি তখন কপালের মধ্যে ঢুকে গেছে।

সঠিক বুঝতে পারছি, নীল আলো জ্বলছে আমার কপালের ভেতরে। সেই আলোয় দেখতে পাচ্ছি সেখানে কি হচ্ছে। আর একজন, হুবহু আমারই মত একজন শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে চক্ষু বুজে আর অনবরত রঙ বদলাচ্ছে। প্রথমে দেখলাম সাদা আলো বেরুচ্ছে তার মাথার চারপাশ দিয়ে, একটু পরে দেখি আলোটা হলদে

হয়ে গেল। হলদেটা ক্রমে গাঢ় নীল হয়ে উঠল। তারপর,হল লাল। লাল আলোটা ফিকে হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল। তারপর দেখলাম অন্ধকার, অন্ধকারের মত কালো আলো ঘিরে রয়েছে তার মাথাটা। অন্ধকার রঙটা মিলিয়ে গিয়ে আবার সাদা আলো ফুটে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলাম সেই আলোর খেলা। দেখতে দেখতে ভুলেই গেছি তখন যে ব্যাপারটা আমারই কপালের মধ্যে ঘটছে।

হঠাৎ এক তাজ্জব কাণ্ড ঘটে গেল। সেই লোকটার ভেতর থেকে আলোয় তৈরী একজন বেরিয়ে এল। জ্যোৎস্নার মত ফিকে নীল আলোয় তৈরী সেই আর একজন চলল সটান জ্যোৎস্নায় ভাসতে ভাসতে। কোথায় চলল সে জানবার জন্যে আমিও তার পিছু নিলাম।

তারপর শুধু এইটুকুই মনে আছে যে অনেক উঁচু থেকে পড়ছি। সেই পড়ে যাবার অনুভূতিটা কিছুতেই বোঝাতে পারব না। বোধ হয় এক মুহূর্তও নয়, সেই সাংঘাতিক অনুভূতিটা ভোগ করেছিলাম। তারপর লাগল ধাক্কা কঠিন ধরিত্রীর সঙ্গে। আর একবার চীৎকার করে উঠলাম যেন। পরমুহূর্তে চোখ মেলে তাকালাম। সামনেই বসে আছেন দেবীদাস। অল্প একটু হেসে বললেন—"দেখলে তোমার মনটিকে। ঐ মন কোথায় কিভাবে রয়েছে তাও দেখলে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আর স্বপ্ন মনের ছটা বৃত্তি, ঐ বৃত্তিগুলোর রঙ হচ্ছে সাদা হলদে নীল লাল সিঁদুরে-লাল আর কালো। ঐ বৃত্তিগুলো বা ঐ রঙগুলো যদি ধ্বংস করা যায় তাহলে যা হয় তাও দেখলে। আসল তুমি এখন এই প্রাণময়কোষ আর মনোময়কোষ থেকে মুক্তি পেয়ে ভেসে বেড়াতে পার। মন কোথায় আছে, মনের পেশা কি, সবই দেখতে পেলে। এখন ঐ মনটিকে ধরবার জন্যে চেষ্টা কর।"

মনকে তাড়া করে ধরতে যাব কি এমন দায় পড়েছে আমার?

দেবীদাসের চরণে কপাল ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ পড়ে রইলাম। যে

মন নাকি আমার সবচেয়ে বড় দুশমন সেই মনকে বাগ মানিয়ে মনে মনে বললাম—"অতশত পারব না বাবা। ও সমস্ত উৎকট কাণ্ড আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কয়েকটা বছরের জন্যে এই ধরাধামে এসে পড়েছি। এখানে যেসব তাজ্জব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে, তাই দেখে শুনে মশগুল হয়ে থাকতে চাই।"

আশীর্বাদ করলেন দেবীদাস—"তোমার মনের ষোলকলা পূর্ণ হোক।"

পূর্ণাবধূত পরমহংস স্বামী দেবীদাস উজ্জয়িনীতে শিপ্রাতীরে শবাসনে সিদ্ধিলাভ করেন। মহাকবি কালিদাসও উজ্জয়িনীতে মহাকালের কৃপায় সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধিটির নাম বাক্‌সিদ্ধি। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ দেবীদাসের আশীর্বাদটি কিন্তু আমার কপালগুণে ফলল না। ষোলকলা দূরে থাক, মনের একটি কলাও পূর্ণ হয় নি। মন আমার যেমনটি ছিল ঠিক তেমনিটিই থেকে গেছে। ছুটে বেড়াচ্ছে সেই একটা কিছুর পেছনে, যে একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে। যে চক্ষু ছুটো আটকে রয়েছে কপালের নিচে, মুণ্ডটার ছু-পাশে যে কান ছুটো লটকে রয়েছে, শোভাবর্ধন করার জন্যে মুখের মাঝখানে খাড়া হয়ে রয়েছে যে নাক, সেই চোখ কান নাকের নাগালের বাইরে রয়েছে সেই একটা কিছু। কি সেটা? তা কি ছাই আমিই জানি। সেই একটা কিছুকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, বাক্য দিয়ে তাকে বোঝানোও যায় না। তবু সেই একটা কিছু আছে, নিশ্চয়ই আছে। তারই আকর্ষণে আশ্রয় নিয়েছিলাম নীলকণ্ঠের অন্তরে, সেইখানেই নাকি লুকিয়ে রয়েছে সেই একটা কিছু। যুগযুগান্ত ধরে বিশ্বাস করে আসছে মানুষ যে একমাত্র নীলকণ্ঠের কৃপা হলেই সেই একটা কিছুর নাগাল পাওয়া যায়। ঐ বিশ্বাস, ঐটুকু সম্বল করেই ছুটে যায় মানুষ নীলকণ্ঠের আশ্রয়ে। ঐ হল সেই হলাহল, যা কণ্ঠে ধারণ করে আছেন বলেই নীলকণ্ঠ মাথায় তুষারকিরীট পরে যুগযুগান্ত স্থির হয়ে আছেন।

উত্তুরে হাওয়ায় ভেসে আসে সেই হলাহলের গন্ধ, শ্বাসে-প্রশ্বাসে মানুষ সেই গন্ধ বুকের ভেতর ঢোকাতে বাধ্য হচ্ছে। বিষিয়ে উঠছে রক্ত। ঘর-সংসারের মুখে ঝাড়ু মেরে হিমালয়ের বুকে গিয়ে লুকিয়ে থাকবার জন্যে প্রাণের মধ্যে প্রচণ্ড আকুলিবিকুলি জন্মাচ্ছে। অনেকে সামলাতে পারছে সেই টান, কেউ কেউ পারছে না। যারা পারছে না

সামলাতে তারাই হল নীলকণ্ঠের বলি। সেই সমস্ত হতভাগা হতভাগীদের বুক নিঙ্ড়ে ঐ বিষাক্ত বিশ্বাসটুকু গ্রহণ করেন নীলকণ্ঠ, তারপর যা থাকে সেটা ছিবড়ে। সেই ছিবড়েয় ছিটেফোঁটা রসকষ থাকে না।

বিশ্বাসবিহীন বুক হচ্ছে শ্মশান, যেখানে শব পোড়ে। মন তখন শব, সেই শবের ষোলকলা পূর্ণ হবে কেমন করে! মরা গরুতে কি ঘাস খায়!

তাই আমি স্রেফ দেখেছি। দেখেছি তাদের, সেই সর্বনেশে একটা কিছু যাদের মন বুদ্ধি চৈতন্যকে গ্রাস করে ফেলেছে। সেই সব হতভাগা হতভাগীরা তীর্থ করতে যায় না হিমালয়ে, পুণ্য কামাবার মত পবিত্র সৌখীনতা তাদের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। তারা যায় খুঁজতে সেই একটা কিছুকে; খুঁজতে খুঁজতে ফতুর হয়ে পড়ে। জীবনের সবকটি শ্বাসপ্রশ্বাস হিমালয়ের হিমনিঃশ্বাসে আহুতি দিয়ে হিমালয়ের জঠরেই হজম হয়ে যায়।

ওদের কয়েকজনের ছবি হচ্ছে আমার এই নীলকণ্ঠ হিমালয়।

তখন চলেছি মানসসরোবরে। বজ্রগিরি বাবার সঙ্গী হয়েছি। বজ্রগিরি বাবার ওজন কমসে-কম চার মণ। সেই শরীরের আবরণ একখানি গালচে, বাবার ভুটানীভক্তরা গালচেখানি বুনে দিয়েছিল এমন মাপে যাতে শরীরটিকে ঢাকা যায়। সেখানির ওজনও প্রায় আধ মণটাক হবে। শরীর এবং শরীরের আবরণ মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চার মণ মাল নিয়ে বজ্রগিরি চললেন মানসসরোবরে। আমার মত দু-চারজন হতচ্ছাড়া হাভাতে সাধুকে সঙ্গে নিলেন। যে ভুটিয়া মহাজনটির ভেড়া ঝাব্বুর সামিল হয়ে চললাম, তিনি বজ্রগিরি বাবাকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন। গুরুর আদেশেই তিনি আমাদের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। একথা মানতেই হবে যে বজ্রগিরি বাবার কৃপাতেই মানসকৈলাস দর্শন সম্ভব হয়েছিল।

সেই সঙ্গে আর একটি সৌভাগ্যও হয়েছিল। লোধা সিংকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম। বন্ধু নিশ্চয়ই, বন্ধুকেই লোকে আত্মপরিচয় দেয়। আত্মপরিচয় না দিলে জানতেই পারতাম না সাধুটির আসল নাম লোধা সিং, কিসের জন্যে ও সাধু হয়েছে তাও আমার অজানা থেকে যেত।

প্রায় মাসখানেক কিংবা মাস দুয়েক পড়েছিলাম গারবেয়াংএ। ঐ একটি স্থান যেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থেকে জীবন ক্ষয় করা যায়। সকাল দুপুর সন্ধ্যে তিন বেলা চা আর ছাতু আসবেই। গৃহস্থরা মনে করেন সাধু-সন্ন্যাসীদের না খাইয়ে নিজেরা খেলে মহাপাপ হয়। প্রতি বছর বিস্তর সাধু-সন্ন্যাসী জড় হন গারবেয়াংএ, আষাঢ়-শ্রাবণ দু মাস গারবেয়াংবাসীরা মহানন্দে সেবা করেন সকলের। ঐ কর্মটি করার জন্যে সভা করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন না তাঁরা, চাঁদাও তোলেন না। ওটা এমনিই হয়ে যায়। গার্হস্থ্য ধর্ম, পালন না করে উপায় কি।

সাধু-সন্ন্যাসীরা ওখানে গিয়ে আশ্রয় নেবেন বলে গ্রামবাসীরা একটা পাথরের দালান বানিয়েছে গ্রামের বাইরে কালীনদীর তীরে। কালী বয়ে চলেছে যেখানে সেখান থেকে অন্ততঃ চল্লিশ-পঞ্চাশতলা উঁচুতে গারবেয়াং বস্তি। গারবেয়াংএ ভিক্ষা করতে হলে প্রত্যেক দিন চল্লিশ-পঞ্চাশতলা ওঠানামা করতে হয়। ঐটুকু কষ্ট যাঁরা করতেন তাঁরা রুটি-তরকারী ভিক্ষা পেতেন। যাঁরা সন্ন্যাসীদের জন্যে নির্দিষ্ট আস্তানা ছেড়ে ওপরে উঠতেন না তাঁদের জন্যে বরাদ্দ তিন বেলা নুন-মেশানো চা-পাতা সিদ্ধ গরম জল আর গম পোড়ানো ছাতু। নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামবাসিনী কয়েকজন নেমে এসে ঐখানেই চা-পাতা সিদ্ধ করে সাধুদের খাইয়ে যেতেন। সাধুদের মধ্যে একমাত্র আমিই মৌনীবাবা, তাই আমার ওপর ওঁদের বিশেষ রকম নজর দিতে হয়েছিল। অন্য সাধুরা ওঁদের কাছে গিয়ে পাত্র পেতে ভিক্ষা নিতেন, আমি আবার ঐটুকু কষ্টও করব না। সেই বিভীষণ অজগরব্রত রয়েছে, অজগর

সাপের মুখের কাছে খাদ্য এসে পৌঁছলে তবে সে খেতে পাবে। ঐ ব্রতটার আইনকানুন বোধ হয় জানতেন না ওঁরা, তাই প্রথম কয়েক দিন উপোস করতে হয়েছিল। শেষে অবশ্য কোনও কষ্ট হয় নি, চা ছাতু সামনে এসে পৌঁছেছে। পাছে আমি বাদ পড়ে যাই এজন্যে ওঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন।

লোধা সিং ওপরে থাকত বজ্রগিরি বাবার সঙ্গে। বাবার চেলা, বাবা যেখানে থাকবেন চেলাও সেখানে থাকবে। সাধুদের মধ্যে যাঁরা ভিপ্ তাঁরা তো আর কালীনদীর তীরে খোঁয়াড়ে থাকতে পারেন না, চেলা-চেলী নিয়ে বড়লোক মহাজনদের ঘরে জাঁকিয়ে বসতেন। লোধা সিং জানতে পারল যে নিচে একজন মৌনী সাধু রয়েছেন যাঁর মুখের সামনে খাবার জিনিস পৌঁছে না দিলে উপোস করে পড়ে থাকেন, আসন ত্যাগ করে এগিয়ে গিয়ে পাত্র বাড়িয়ে ভিক্ষা নেন না। ঐটুকু শুনেই ও নেমে এল মৌনী সাধুকে দেখবার জন্যে, এসে আমার সামনে গ্যাঁট হয়ে বসল।

মুশকিলে পড়ে গেলাম। ঠিক এক হাত সামনে একটা লোক শিরদাঁড়া সোজা করে চুপচাপ বসে আছে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মুখপানে, এ অবস্থায় কতক্ষণ স্থির থাকা যায়। কিছু একটা বলবে তো। বলা দূরে থাক, এতটুকু নড়েচড়েও না। ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড পুতুল, গাছ কুঁদিয়ে পুতুলটা গড়া হয়েছে। খুবই পাকা গাছ; রঙ্‌টা কালচে হয়ে গেছে। অল্পস্বল্প দাড়ি লাগানো হয়েছে পুতুলটার মুখে, মাথায় একরাশ লালচে চুল সাঁটা হয়েছে। অস্বাভাবিক টানা টানা দুই চোখ, চোখের পল্লবগুলোও অস্বাভাবিক লম্বা। প্রথমে মনে হয়েছিল যে কাজল পরানো হয়েছে বুঝি, শেষে বুঝতে পারলাম কাজল নয় পল্লবগুলোই কাজ করছে। আস্ত দুখানা কম্বল জোড়া লাগিয়ে আলখাল্লা তৈরী করে ঝোলানো হয়েছে পুতুলটার গায়ে তাই গলার তলা থেকে কিছুই দেখবার উপায় নেই। বসে রইল পুতুলটা এক হাত সামনে, শুয়ে পড়লাম আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে। থাকুক বসে

পাগলটা যতক্ষণ পারে। আধঘণ্টাটাক পরে মুখের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে দেখলাম, চলে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

রাত পোয়াবার সঙ্গে সঙ্গে আবার উপস্থিত। শুধু হাতে নয়, এক পুঁটলি পেস্তা বাদাম আখরোট খোবানি সঙ্গে এনেছে। পুঁটলিটা আমার সামনে রেখে বলল—"আমার গুরুজী এগুলো আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। আরও কিছুদিন এখানে থাকতে হবে আমাদের। শুধু নুন চা খাচ্ছেন আপনি, গায়ের জোর কমে গেলে কৈলাস যাবেন কেমন করে। এখান থেকে বেরিয়ে বিকট অবস্থায় পড়ব আমরা, হাওয়ার চোটে খুন শুখিয়ে যাবে। রোজ খাবেন এই মেওয়াগুলো, ফুরিয়ে গেলে আবার আমি এনে দেব, আমাদের কাছে অনেক আছে।"

বলতে বলতে বসে পড়ল সামনে। পুঁটলি খুলে আখরোট বার করে একটা পাথর দিয়ে ঠুকে ভাঙতে লাগল।

বিপদে পড়ে গেলাম। পক্ষীব্রতের মাহাত্ম্যটা ওকে বোঝাই কেমন করে? সন্ধ্যার আগেই মেওয়াগুলোকে বিদেয় করতে হবে, মেওয়াগুলোর জন্যে আমাকেই বা খোঁয়াড় ছেড়ে বাইরে রাত কাটাতে হয়। পাখির জীবনযাপন করছি, কাল সকালে কি খাব এটা চিন্তা করা যাবে না। পাখি কাল সকালের জন্যে কোনও কিছু নিজের বাসায় জমা করে রাখে না।

উঠে পড়লাম পোঁটলাটা নিয়ে, যেসব মহাত্মারা ছিলেন আমার সঙ্গে তাঁদের আসনে এক মুঠো করে রেখে এলাম। তবুও যা রইল তা খেয়ে শেষ করা যাবে না সন্ধ্যার আগে। দেখা যাক, কতদূর এগোনো যায়। এক মুঠো মুখে পুরে সজোরে চর্বণ শুরু করলাম। সমস্তই দেখলে লোধা সিং, একটি কথা বললে না। কিছুক্ষণ পরে চা-পাতা ফোটাবার জন্যে কয়েকজন মহিলা এলেন। লোধা সিংকে দেখে তাঁরা খুবই তটস্থ হয়ে পড়লেন। বুঝতে পারলাম যে সাধুটির কদর আছে।

যেখানে তাঁরা আগুন জ্বেলে জল ফোটাতে বসলেন সেখানে গিয়ে কি যেন পরামর্শ করতে লাগল লোধা সিং। চলে গেল তারপর

খোঁয়াড় ছেড়ে, আমার কাছে আর ফিরে এল না। যখন ওরা চা আর ছাতু দিতে এলেন আমায় তখন বাকী মেওয়াগুলো ওঁদের সামনে ঠেলে দিলাম। নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করলেন তাঁরা, তারপর আখরোটের খোলাগুলো পর্যন্ত তুলে নিয়ে আমার আসনের সামনেটা পরিষ্কার করে রেখে গেলেন।

তুপুরের পরে আবার এল লোধা জাঁদরেল এক কাঠের কমণ্ডলু হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে। এসে বসল না, খুবই মিনতি করে অনুরোধ করলে আমাকে তার সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্যে। ঠাণ্ডা জায়গায় দিন রাত বসে শুয়ে থাকলে হাত-পায়ের খিলগুলো সব জমে যেতে পারে, হাত-পাগুলোকে চালু রাখার জন্যে রোজ খানিকটা ঘুরে বেড়ানো উচিত।

উচিত তো অনেক কিছুই, কিন্তু উচিত-কর্ম কটা আর করতে পারছি। ঘুরে বেড়াবার জায়গাই বটে, দিনরাত অষ্টপ্রহর হা-হা শব্দে হাওয়া বইছে। শরীরের কোনও জায়গা খোলা রাখা সম্ভব নয়, যেখানে লাগবে সেই হাওয়া সেখানটা জ্বলতে থাকবে। খোঁয়াড়ের ভেতর হাওয়া ঢুকতে পায় না। কালীর অপর পারে নেপালের জঙ্গল, সেখান থেকে কাঠ নিয়ে এসে মহাত্মারা ধুনি লাগিয়েছেন। কার মন চায় খোঁয়াড়ের বাইরে গিয়ে সেই খুনে হাওয়ার কামড় খেতে।

যেতে কিন্তু হল। অনুরোধটি করে এমনভাবে আমার চোখের পানে তাকিয়ে রইল লোধা সিং যে উঠতেই হল আমাকে। কালীনদীর জল পায়ের গোছ ছাড়ায় না, কিন্তু তোড় এমন যে অসাবধানে জলে নামলে ধাক্কার চোটে ফেলে দেবে। জল পার হলাম তুজনে, উঠলাম গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে। খানিকটা যাবার পরে লোধা সিং থামল। কম্বলের আলখাল্লার ভেতর থেকে হাত দেড়েক লম্বা চকচকে এক কৃপাণ বার করল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—"কত রকমের জানোয়ার আছে জঙ্গলে তাই এটা হাতে নিয়ে হাঁটা ভাল।"

কৃপাণখানি দর্শন করা মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল

আমার। চক্ষু বুজে মধুসূদনকে স্মরণ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ডান হাতে সেই নঙ্গা কৃপাণ আর বাঁ হাতে জাঁদরেল কমণ্ডলুটা নিয়ে আমার সামনে হাঁটতে লাগল লোধা। অতবড় কমণ্ডলুটা খামকা বয়ে নিয়ে চলেছে কেন? কি আছে ওতে? চললই বা কোথায়? বহু রকমের প্রশ্ন তোলপাড় করতে লাগল বুকের ভেতর, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে আমার? ঠিক যে হচ্ছে না কাজটা এটুকু ভাল করে বুঝতে পেরেও পেছন ফিরতে পারলাম না। আমার চেয়ে অন্ততঃ এক বিঘত উঁচু সেই নঙ্গা কৃপাণধারীর পিছু পিছু বলির পশুর মত হাঁটতে লাগলাম।

জঙ্গলের মধ্যে সরু পায়ে চলা পথ বেয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক উঠে যাবার পর সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলাম। প্রকাণ্ড এক ত্রিশূল গাড়া রয়েছে পাথরের ভেতর, ত্রিশূলটার গায়ে নানা রঙের কাপড়ের ফালি বাঁধা রয়েছে। কমণ্ডলুটাকে ত্রিশূলের সামনে রেখে আমার সঙ্গীটি বসে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে বলল—"এ বড় বিকট স্থান, ছিন্নমস্তা দেবীর মহাপীঠ।" বলে ত্রিশূলটির সামনে পাথরের ওপর কপাল ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করল।

দেখাদেখি আমিও তাই করলাম। ছিন্নমস্তা নামটি কানে গেলে কেমন যেন ছাঁৎ করে ওঠে বুকের ভেতরে, সেটা ভয়ে না ভক্তিতে বলতে পারব না। তবে স্থানমাহাত্ম্য বলে একটা ব্যাপার আছে, কালীর ওপারে নেপালের জঙ্গলে যে স্থানটিকে ছিন্নমস্তা দেবীর মহাপীঠ বলে পরিচয় দিল আমার সঙ্গী সেই স্থানটির একমাত্র মাহাত্ম্য হল ভয়াবহতা। নির্জন স্থান বলতে যা বোঝায় তা ঠিক নয়। শ্মশানে-মশানে নির্জন স্থানে বহু রাত কাটিয়েছি আমি, বিভীষিকা চাখতে চাখতে মুখ মিষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু আজও যখন গারবেয়াং-এর অপর তীর-বাসিনী ছিন্নমস্তার কথা মনে জাগে তখন গা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। কেন যে এটা হয় তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার শক্তি আমার নেই।

প্রণাম সেরে মাথা তুলতেই বিশ্রী একটা গন্ধ পেলাম। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম গন্ধটা কিসের। যে গর্তে গাড়া রয়েছে ত্রিশূলটা সেটা ঠিক গামলার মত। কমণ্ডলুতে যা ছিল তাই ঢেলে পাথরের গামলাটা প্রায় বোঝাই করে ফেললে আমার সঙ্গী। পদার্থটির পরিচয় আমার জানা ছিল, গারবেয়াংবাসী প্রত্যেকটি পুরুষমানুষের সর্বাঙ্গ থেকে সদাসর্বক্ষণ ঐ গন্ধ বার হয়। ওর গুণ নাকি এমনই সাংঘাতিক যে খানিকটা পেটে থাকলে গারবেয়াংএর হাড়-চিবুনে হাওয়াকে আমাদের চৈতী রাতের উদাস হাওয়া বলে মনে হয়।

কমণ্ডলুটা খালি করে আলখাল্লার ভেতর থেকে ন্যাকড়ায় জড়ানো আর এক পদার্থ বার করল আমার সঙ্গী। ন্যাকড়ার ওপর রক্তের ছোপ। আবরণ উন্মোচনের পর চিনতে পারলাম, আস্ত একখানা ভেড়া বা বকরীর ঠ্যাং। কৃপাণ দিয়ে টুকরো টুকরো করা হল সেটাকে, টুকরোগুলোকে সেই মদের ভেতরে ফেলা হল। পুজা শেষ, ভোগ নিবেদন সমাপ্ত হয়ে গেল। তারপর প্রসাদ গ্রহণের পালা।

দেবী ছিন্নমস্তা আমাকে রক্ষা করলেন, সেই প্রসাদ খাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ পেলাম না। পূজারী স্বয়ং উপুড় হয়ে চোঁ চোঁ করে শুষে নিলেন খানিক মদ, সোজা হয়ে বসে হাত দিয়ে এক এক টুকরো মাংস মুখে পুরে কচমচ করে চিবোতে লাগলেন। মাংস শেষ হবার পর আবার উবুড় হয়ে পড়ে পাথরের খাদে মুখ চোবড়ালেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রসাদ ফুরিয়ে গেল। অবস্থা বুঝে কৃপাণখানি আমি হস্তগত করে ফেললাম। কে জানে, আবার যদি খানিকটা কাঁচা মাংস দিয়ে ছিন্নমস্তাকে তুষ্ট করার বাসনা ভক্তের মনে চাগাড় দিয়ে ওঠে।

হল কিন্তু ঠিক উল্টো ব্যাপার। কিংবা সোজা ব্যাপারটাই হয়তো ঘটে বসল। প্রসাদ গ্রহণের ফলে ভক্তের মনের কপাট খুলে গেল। সেই প্রথম জানতে পারলাম ওর নামটি—লোধা সিং। ছিন্নমস্তা মহাপীঠে বসে ওর পরিচয় শুনলাম। লোধা সিং কাঙ্গরার অধিবাসী।

পাঠানকোট থেকে জ্বালামুখী তীর্থে যেতে হয়। জ্বালামুখী মহাপীঠ, পাথরের গায়ে আগুন জ্বলে সেখানে। সেই জ্বালামুখী থেকে যাওয়া যায় লোধার জন্মস্থানে। উদয়অস্ত হেঁটে গেলে দু দিন লাগে। সেখানেও আছেন এক ছিন্নমস্তা, বছরে কয়েকবার নররক্ত পান করেন। কে বা কারা যে নরবলি দিয়ে যায় সেখানে তা কেউ জানতে পারে না।

সেদিন শুধু জানতে পারলাম ওর নামটি আর ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চল থেকে ও গিয়েছে। ঐ বয়েসে কোন্ দুঃখে চলেছে মানসসরোবরে সেটা আর জানা হল না। থাকুক গে, কালীনদীর ওপারে ফিরে যাওয়াটাই তখন ভয়ানক জরুরী হয়ে উঠেছে আমার কাছে। ছিন্নমস্তার ভক্তর সঙ্গে সেই বিকট স্থানে রাত কাটাবার শখ বিন্দুমাত্র ছিল না চিত্তে। কৃপাণখানি বাগিয়ে ধরে ফিরে চললাম। ফেরবার সময় লোধা সিং আমার পিছু পিছু এল।

রোজই আসতে লাগল লোধা সিং কিছু না কিছু হাতে নিয়ে। বুঝতে পেরেছিল যে যা আনবে তা তৎক্ষণাৎ শেষ করে ফেলব খেয়ে আর বিলিয়ে দিয়ে। অগত্যা পরিমাণটা কমিয়ে আনতে লাগল। নুন-চা আর ভাজা গম গুঁড়নো ছাতু খেতে খেতে সত্যিই খুব কাবু হয়ে পড়েছিলাম, পেট ভরে রুটি-তরকারী খাবার ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্থি ভাব, মস্ত বড় একটা অন্যায় করছি যেন প্রত্যেক দিন ওর কাছে ভিক্ষা নিয়ে, হয়তো এমন কিছু চেয়ে বসবে আমার কাছে যা আমি দিতে পারব না, কি আমার আছে যা দিয়ে ওকে একটু তুষ্ট করতে পারি, ইত্যাদি নানা রকমের দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসল আমাকে। ঠিক করে ফেললাম যে ও যা আনবে তা আর স্পর্শ করা হবে না। পড়ে থাকবে, নষ্ট হবে, দিন দুয়েক নষ্ট হতে দেখলে আর আনবে না।

হায়, কে তখন আমায় মনে করিয়ে দেবে যে সংকল্প-বিকল্প থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই মৌনব্রত ধারণ করেছি!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন বুদ্ধি নিঙ্ড়ে যা আমি ঠিক করে রাখলাম, পরদিন সেটা ভেস্তে গেল। লোধা সিং মোটে এলই না। যে সময় ও আসত সে সময়টা পার হয়ে গেল। আমার মন বুদ্ধি তখন রুটি-তরকারীর কথা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়ে একটু একটু করে কুঁকড়ে পড়তে লাগল। কি হল! আসছে না কেন! অন্য কোথাও গেল নাকি!

খুব বড় সাধু-সন্ন্যাসী কেউ এসেছেন হয়তো, কৈলাস যাবার জন্যে রোজই তো কেউ না কেউ এসে জমা হচ্ছেন। এমন কেউ এসেছেন নিশ্চয়ই যিনি অত্যাশ্চর্য বিভূতি দেখিয়ে তাজ্জব বানিয়ে ছেড়েছেন গারবেয়াংসুদ্ধ মানুষকে। সেখানেই গিয়ে হামড়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। সাধুগিরি করতে হলে সর্বাগ্রে জানতে হয় যে ভক্তের ভক্তি আর পদ্ম-পাতায় পানি এক জিনিস। আজ তুমি যে ভক্তটির জ্বালায় ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ছ কালই সেই ভক্তটির চিত্তে অরুচি ধরে যেতে পারে। ভক্তি-ক্ষুধাটাও একটা ক্ষুধা, কিন্তু সব ক্ষুধাই বিগড়ে যায় যদি সমানে একঘেয়ে খাদ্য খেতে হয়। তাই ভক্তরাও হরদম মুখ বদলান।

অতএব নিতান্ত নির্বিকার চিত্তে লোধা সিং ভক্তটিকে খরচের ঘরে জমা করে ফেলে আসল চিন্তায় মন দিলাম। রাস্তা খুলছে কবে? খোঁয়াড়ে পড়ে থাকতে হবে আর কত দিন?

রাস্তা খুলবে। ছাগল ভেড়া ঝাব্বুর পিঠে মালপত্র নিয়ে মহাজনরা যাত্রা করবেন, আমরা সঙ্গী হব। ওঁরা অবশ্য আহ্বান করবেন না কাউকে, কেউ সঙ্গে গেলে আপত্তিও করবেন না। তখনকার দিনে মাণ্ডনে-খানেওয়ালারা ভুটিয়া মহাজনদের সঙ্গে মানস-কৈলাস ঘুরে আসত। কারও দায়দায়িত্ব নিতেন না ওঁরা, সকাল দুপুর সন্ধ্যে তিন বেলা ঐ নুন-চা আর ছাতু দেওয়া ছাড়া করবারই বা কি আছে। তিব্বতের পথে স্বয়ং শয়তানও কারও ভার গ্রহণ করেন না। যদি রোগ হয়, চলতে যদি না পার, পড়ে থাক বরফের

বুকে। তোমার জন্যে কেউ থেমে থাকবে না। দয়া মায়া প্রেম করুণা ইত্যাদি সব মিষ্টি মিষ্টি কথা গারবেয়াং পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। গারবেয়াং পার হয়ে মানুষ মাত্র একটি মন্ত্র জপ করতে থাকে। মন্ত্রটি হল—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। সেই 'আপন প্রাণ বাঁচা' মন্ত্র জপতে জপতেও ভুটিয়া মহাজনরা দলসুদ্ধ মানুষকে নুন-চা আর ছাতু না খাইয়ে নিজেরা কিছু খেতেন না, এটা কি কম কথা!

এধারে তৈরী হয়ে আছেন সবাই। ওপরে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসছেন যাত্রা শুরু হবে কবে। কতগুলি মহাজন এসেছেন গারবেয়াং বস্তিতে, কোন্ মহাজনের সঙ্গে কতগুলি ঝাব্বু ভেড়া চাকর-বাকর আছে, কোন্ মহাজন ধনী, ইত্যাদি নানারকম আলাপ আলোচনা চলছে খোঁয়াড়ে। সব সাধুরাই অস্থির হয়ে উঠেছেন, কৈলাসনাথ টানছেন যে। খুব ভাল করেই জানেন সকলে যে অনেকের ভাগ্যে ফিরে আসাটা আর ঘটে উঠবে না। কিন্তু সেই ভাবনাটিকে বুকে আগলে নিয়ে কালীনদীর সেই খোঁয়াড়ে এক রাত্রিও কেউ বসে থাকতে রাজী নন।

কান পেতে সব শুনছি। শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে কতকগুলো জায়গার নাম। গারবেয়াং থেকে যাব কালাপানি তারপর লিপুধুরা। সেই লিপু পাস, স্কুলে যখন পড়তাম তখন ঐ লিপু পাসের নাম মুখস্থ করতে হয়েছিল। মনে মনে কৈলাসপতির কাছে মাথা খুঁড়ছি—হে দয়াময়, কোনও রকমে যেন এই শরীরটা নিয়ে লিপু পাস পার হতে পারি।

দিন তিন চার কাটল। একদিন সকালে দেখা গেল আমাদের মধ্যে কয়েকজন নেই। তাঁদের আসন অর্থাৎ লোটা কম্বল বলতে যা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি ছিল সমস্ত উধাও হয়েছে। তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম সকলে, দৌড়লেন কয়েকজন। যাঁরা গেলেন তাঁরাও আর ফিরলেন না। অতঃপর সেই খোঁয়াড়ে পড়ে থাকলাম শুধু আমি, সাধুরা চলে গেলেন ওপরে। যাত্রা শুরু হয়েছে, একে একে মহাজনরা

রওয়ানা হচ্ছেন। ঘাঁটি আগলে বসে থাকা চাই, যথাসময়ে যে কোনও দলে ভিড়ে পড়তে হবে।

আমার তাড়া নেই। রাতটা কাটুক, সকালে উঠে সোজা রওয়ানা হব। কালাপানি যাবার পথ একটাই, কালীনদীর উজানে উঠতে হবে খানিকটা। তখন শুরু হবে জঙ্গল, পথটা চলে গেছে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। নিশ্চয়ই পথ হারাব না, অতগুলো মানুষ আর জন্তু যে পথে চলেছে সে পথ চিনে বার করতে মোটেই কষ্ট হবে না। একলাই যাব, কোনও দলের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়াটা সহ্য হবে না আমার। ভিক্ষা অবশ্য নিতেই হবে, কেউ না কেউ দেবেই। আস্ত হিমালয়টা চষে বেড়ানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন। না খেয়ে মরি নি, খাবার জিনিস ঠিকই এসে পৌঁছেছে মুখের সামনে। মনে মনে একটা চুমকুড়ি দিলাম—আচ্ছা প্যাঁচে ফেলেছি বটে আমার সৃষ্টিকর্তাটিকে, মৌনব্রত অজগরব্রত পঞ্চীব্রত তিন তিনটে বাঘা বাঘা ব্রত ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অগত্যা বেচারা সৃষ্টিকর্তাকে আমার খাদ্য বয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে ছুটতে হচ্ছে।

হায় আমার সৃষ্টিকর্তা! মোটেই তখন জানতাম না যে খোদ সৃষ্টিকর্তাও তাঁর সৃষ্টিটির সঙ্গে তিব্বতের পথে পা বাড়ান না!

সেদিন বিকেলবেলা চা-পাতা ফোটাতে এলেন না কেউ। খুব সম্ভব গারবেয়াংবাসীরা ধরে নিয়েছিলেন যে সাধুদের আস্তানায় কেউ নেই। সন্ধ্যা হল, সব কটা ধুনির কাঠ একসঙ্গে করে মস্ত একটা আগুন জ্বালালাম ঘরের মাঝখানে। বেশ কিছুক্ষণ জ্বলল কাঠগুলো, যতক্ষণ জ্বলল ততক্ষণ ঘরে আলো রইল। ঐভাবে আগুন রাখতে হলে মাঝে মাঝে ছাই ঝেড়ে দিতে হয়, তাতে তাড়াতাড়ি পুড়ে শেষ হয় কাঠ। আমার তো আলোর দরকার নেই, তাপটুকু সারারাত থাকলেই হল। কাঠ শেষ হলে তাপও থাকবে না। তাই আর খোঁচাখুঁচি করলাম না ধুনিতে, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ভারী আশ্চর্য লাগল। এত রকমের আওয়াজ হয় ওখানে তা তো শুনি নি কোনও দিন। কয়েক হাত নিচে কালীনদী শোরগোল তুলে বয়ে চলেছে, কালীর চীৎকারই অবিরাম শুনতে হয়েছে। সেই রাত্রে একলা ঘরে শুয়ে বহু জাতের শব্দ কানে গেল। পোকা-মাকড় তো ডাকছেই, মাঝে মাঝে নদীর ওপর থেকে অতি উৎকট হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। কারা হাসছে তা জানি আমি। এক জাতের নেকড়ে, ওদের খিদে নাকি এমনই সাংঘাতিক যে দলসুদ্ধ সবাই পরামর্শ করে নিজেদের একজনকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। নেকড়েদের হাসি থামল তো শুরু হল নাকীসুরে কান্না। ঐ কান্নার শব্দ কানে যাওয়া নাকি ভয়ানক খারাপ, পাহাড়ীরা বিশ্বাস করে ঐ কান্না যে শুনবে, একটা না একটা অমঙ্গল তার হবেই। কাঁদছে কিন্তু পাখীর ছানা। ধনেশপাখীর মত প্রকাণ্ড ঠোঁটওয়ালা এক জাতের পাখী ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে থাকে। ঐ সময় ওরা ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবার পর বাচ্চা নিয়ে নিচে নেমে যায়। বৈশাখ মাস পড়লেই আবার ওপরে ওঠে। নিদারুণ ঠাণ্ডায় সদ্য ডিম ফোটা বাচ্চা চিঁচিঁ করে চেঁচায়। চেঁচানিটা সত্যিই খুব ভয়াবহ, মনে হয় কোনও প্রেতিনী ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে।

বহু জাতের আওয়াজ শুনতে শুনতে রাত কাবার হয়ে এল। ছাই ঝেড়ে আগুন চেতাবার জন্যে উঠে পড়লাম। বাকী কাঠগুলো পুড়িয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, আর একটা রাত যখন ওখানে থাকতে হচ্ছে না। কাঠগুলো গুছিয়ে দিয়ে নিচু হয়ে ফুঁ দিতে লাগলাম।

জ্বলে উঠল আগুন। সোজা হয়ে বসে সামনের দিকে তাকাতেই ধক্‌ করে উঠল বুকটা। ও আবার কে রে বাবা!

ধুনির ওপাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে এক মূর্তি টান টান হয়ে বসে আছে। ও কে? সোজা হয়ে বসলে কাকে এতখানি উঁচু দেখায়? তাহলে কি?

পাক্কা সাধু হয়েছি তখন। নীলকণ্ঠের কৃপায় হাড় মাংস জ্বলে

পুড়ে আঙার হয়ে গেছে। হ্যাংলা মন কিন্তু লকলকে জিভ বার করে হ্যাংলামি করতে লাগল।

খানিক পরে দেখি, খুবই সন্তর্পণে মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরানো হচ্ছে। দেখা গেল মাত্র চোখ দুটো। দম বন্ধ হয়ে এল আমার। কে ও! ঐ চোখ দুটো কার!

বীভৎস ব্যাপার। রক্তবর্ণ দুটো ডেলা বেরিয়ে আছে। মনে হল, জ্বলন্ত ধুনিতে ছিটকে পড়বে বুঝি ডেলা দুটো। গোঙানি শুনতে পেলাম যেন একটু, কি যেন বললে। বুঝতে পারলাম না কিছুই। কাঠ হয়ে বসে রইলাম সেই সাংঘাতিক চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে।

ঢাকা খসে গেল মুখের ওপর থেকে। তারপর আর কিছু শোনবার বা বোঝবার দরকারই হল না। লাফিয়ে উঠে ধুনিটা ডিঙিয়ে গিয়ে ওকে জাপটে ধরলাম।

এই সেই অতি বিষাক্ত একটা কিছুর আকর্ষণ। না, ওটাকে বলা উচিত ধাপ্পা। যে সর্বনেশে একটা কিছুর টানে ইহজীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে এসেছে লোধা সিং, সেই একটা কিছুকে বাগাবার বাসনায় সাক্ষাৎ যমের গ্রাসে সঁপে দিয়েছিল নিজেকে। যমে উগরে দিয়েছে তাই ফিরে আসতে পেরেছে। আজও আমি ভেবে উঠতে পারি না কি করে একটা মানুষ আর একটা মানুষকে জ্যান্ত কবর দিতে পারে। লোধা সিংকে যে লোকটা কবরে পুরে সেই কবরের ওপর বসে সাধনা করতে গিয়েছিল তার মনটা কি ধাতু দিয়ে তৈরী তাই আমি ভেবে মরছি আজও। সত্যিই কি সেই হতভাগা বিশ্বাস করত যে জ্যান্ত মানুষের কবরের ওপর বসে মন্ত্র জপ করলে দেবী ছিন্নমস্তা প্রসন্না হয়ে দুনিয়ার অধীশ্বর বানিয়ে দেবেন তাকে! তাই যদি হয় তাহলে এ কথা তো মানতেই হবে যে এই পৃথিবীতে ঐ একটা কিছুর চেয়ে বড় ধাপ্পা আর কিছুই নেই। ঐ ধাপ্পায় পড়ে গেলে মানুষ ভুলে যায় যে সে মানুষ, তখন সে পারে

না হেন কর্ম নেই। সাক্ষাৎ শয়তান যা কল্পনা করতেও ভয় পায়, ধীরে সুস্থে মতলব ভেঁজে মানুষ তাই করে বসে। লোধা সিংকে ভুলে গেলাম, যে ওকে জ্যান্ত কবর দিয়েছিল তার চিন্তাতেই পাগল হয়ে উঠলাম প্রায়। যে কোনও উপায়ে হোক সেই উন্মাদটাকে ধরে একেবারে শেষ করে দেওয়া দরকার। মহাধাপ্পায় পড়ে গিয়ে হন্যে হয়ে উঠেছে হতভাগা। হিংস্র জানোয়ারটাকে খতম করে না ফেললে আরও কত লোকের সর্বনাশ করে ছাড়বে কে জানে।

সেই দিনই প্রথম দেখলাম বজ্রগিরি বাবাকে। পড়ে রইল সেখানে লোধা সিং, ছুটলাম ওপরে ওর গুরুর কাছে। কোথায় থাকেন তিনি তা জানি না। কাউকে যে জিজ্ঞাসা করব সে উপায়ও নেই, মুখ বন্ধ। ওপরে উঠে সর্বপ্রথম যাকে দেখতে পেলাম তাকেই ধরে নামিয়ে নিয়ে এলাম খোঁয়াড়ে। আমার অবস্থা দেখে লোকটা বুঝতে পেরেছিল যে সাংঘাতিক ব্যাপার কিছু ঘটেছে। লোধার অবস্থা দেখে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল তার। বজ্রগিরি কোথায় থাকেন বলে দিল তাকে লোধা সিং। লোকটা তৎক্ষণাৎ ছুটল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে স্বয়ং বজ্রগিরি এসে প্রবেশ করলেন খোঁয়াড়ে। ঘাড় হেঁট করে আড় হয়ে ঢুকতে হল তাঁকে। বপুখানি দর্শন করে ভয়ে কেঁচো হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, মহাপুরুষ বটে। ঐ রকম বপু না হলে মহাপুরুষকে মহাপুরুষ বলে মনে হবে কেন? মহাপুরুষ এমন হওয়া চাই যিনি অনায়াসে যে কোন সাধারণ পুরুষকে শূন্যে নিক্ষেপ করে সশরীরে স্বর্গে পাঠাতে পারেন।

গুরু-শিষ্যে সামান্য একটু আলাপ হল। যে ভাষায় আলাপ করলেন ওঁরা তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। তারপর বজ্রগিরি নিচু হয়ে শিষ্যের হাত ধরে টেনে তুললেন। আমার দিকে তাকিয়ে বজ্রহুংকার ছাড়লেন—"আও।" ঐটুকুই যথেষ্ট, সেই আদেশ পালন না করবার মত হিম্মত ছিল না আমার বুকে। সুড়সুড় করে ওঁদের পেছন পেছন বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে বেরিয়ে শিষ্যটিকে কাঁধে নিলেন বজ্রগিরি। আমার চেয়ে এক বিঘত উঁচু লোধা সিংকে অনায়াসে কাঁধে নিয়ে এত জোরে উঠতে লাগলেন যে ওঁর সঙ্গে তাল রাখতে আমার হাঁফ ধরে গেল। ইতিমধ্যে ওঁর ভক্তরা ছুটে নেমে আসছে। কেউ স্পর্শ করতে সাহস পেল না গুরু-শিষ্যকে। সোজা ওপরে উঠে কাঁধ থেকে নামালেন শিষ্যকে বজ্রগিরি। শিষ্যটি তখন আমার গলা জড়িয়ে ধরে কোনও রকমে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে চলল।

কয়েক দিনের জন্যে কৈলাসযাত্রা স্থগিত হল। যতদিন না বজ্রগিরির শিষ্য সুস্থ হয়ে উঠছে ততদিন কার সাধ্য তাঁর সামনে যাত্রার কথা উত্থাপন করে।

এই ফাঁকে আমি বলে নিই কি রকম ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল লোধা। ছিন্নমস্তার স্থানে যেমন নিয়ে গিয়েছিল আমাকে তেমনি আর এক মহাপুরুষকেও নিয়ে গিয়েছিল। তিনি ওকে বাতলালেন কি উপায়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়। শবাসন চাই, শবাসনে বসে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করতে হবে। জপটি শেষ হলেই সাক্ষাৎ দর্শন দেবেন দেবী। তারপর যা ইচ্ছে করবে তাই হবে। এমন কি মরা মানুষকেও ইচ্ছেমাত্র জ্যান্ত করে তুলতে পারবে।

শব জুটবে কোথা থেকে?

তখন ঠিক হল এ ওর শবাসন হবে, ও এর শবাসন হবে। একজন সিদ্ধিলাভ করলে আর একজন সিদ্ধিলাভ করবে। সেই মহাপুরুষটিই আগে জপ করে সিদ্ধিলাভ করবেন, সিদ্ধিলাভ করে সর্বাগ্রে লোধাকে বাঁচিয়ে তুলবেন। তারপর সেই সিদ্ধমন্ত্রটি দেবেন লোধাকে। লোধা তখন জপ করবে, সিদ্ধিলাভ করে মহাপুরুষকে বাঁচাবে।

বরাত ভাল যে মুণ্ড কেটে শব হবার মতলবটা গজায় নি তাদের মগজে। মুণ্ড কাটার বদলে প্রমাণ মাপের এক গর্ত খোঁড়া হল যার ভেতর একটা লোক লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে পারে। প্রচুর পরিমাণে

মদ্য পান করে লোধা শুয়ে পড়ল সেই গর্তে। যিনি শবসাধনা করবেন তিনি তখন গাছের ডাল দিয়ে গর্তটার ওপর ছেয়ে ফেললেন। তারপর তার ওপর চাপালেন মাটি আর পাথর। দম বন্ধ হয়ে মরবেই লোকটা, পাক্কা শবাসন হয়ে যাবে।

শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতেই লোধার নেশা ছুটে গেল। তখন শুরু হল বাঁচবার জন্যে আকুলিবিকুলি। কতখানি অমানুষিক শক্তি থাকলে ওপরের ডালপালা মাটি পাথর ভেদ করে বাইরে বেরোতে পারে কেউ সেটা কল্পনা করাও যায় না। কোথা থেকে সেই শক্তি পেয়েছিল লোধা তাই বা কে বলবে। কতক্ষণ চেষ্টা করে গর্ত থেকে বেরোতে পেরেছিল সে তাও বলতে পারল না। গর্ত থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশের তলায় কতক্ষণ পড়েছিল হুঁশ হারিয়ে সে হিসেবই বা কে দেবে। হুঁশ ফিরে পাবার পরে আবার নেমেছিল সেই গর্তে, কম্বলখানি বার করে নিয়ে সোজা আমার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তখন শরীরে এমন সামর্থ্য ছিল না যে চল্লিশ-পঞ্চাশতলা পাহাড় ভেঙে গুরুর কাছে পৌঁছয়।

একটা কিছু, সেই সর্বনেশে একটা কিছু, যে একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে, যাকে চোখে দেখা যায় না কানে শোনা যায় না বুদ্ধিতে যার নাগাল পাওয়া যায় না, সেই একটা কিছু বাগাবার জন্যে লোধা সিং জীবন দিতে গিয়েছিল।

কেন ? কেন মানুষে যুগযুগান্ত ধরে ঐ আলেয়ার পেছনে ছুটছে ?

একমাত্র সদুত্তর, ওরাই হল নীলকণ্ঠের বলি। ওদের বুকের ঐ বিষাক্ত বিশ্বাসটুকু হরণ করেন নীলকণ্ঠ। ঐ বিষ কণ্ঠে ধারণ করে আছেন বলেই মাথায় তুষারকিরীট পরে নীলকণ্ঠ সদাসর্বক্ষণ সজাগ হয়ে আছেন। শিষ্যের মুখে আগাগোড়া সমস্ত কাহিনীটা শুনে বজ্রগিরি বাবাও হঠাৎ যেন ভয়ানক রকম সজাগ হয়ে উঠলেন। মাঝে মাঝে একটা কথা উচ্চারণ করতে লাগলেন—"পাব, নিশ্চয়ই আমি ধরতে পারব তাকে, কিছুতেই সে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না

কে সে? কে পারবে না পালাতে? কাকে ধরতে পারবেন ঠিক বজ্রগিরি?

কে জিজ্ঞাসা করবে ওঁকে। জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি, যে কোনও মুহূর্তে বজ্রবমন শুরু হয়ে যেতে পারে।

যাত্রার দিন এগিয়ে আসতে লাগল। বজ্রগিরি হুকুম করলেন আমাকে সঙ্গে যাবার জন্যে। লোধা সিং কানে কানে বলল—"ছেড়ে যেও না আমাকে। তুমি যদি ছেড়ে যাও তাহলে আর বাঁচব না।"

প্রথমে চলল একপাল ঝাব্বু, তাদের পিঠে চলল মাল, যে মাল তিব্বতের বাজারে বিক্রি হবে। মাল পাহারা দেবার জন্যে স্বয়ং মহাজন কয়েকজন লোক নিয়ে সেই সঙ্গে চললেন। তারপর তাঁবু আর ঘর-সংসার। মহাজনের দুটি পত্নী তিনটি পুত্র, পুত্রদের পত্নীরা কাচ্চাবাচ্চা সহ চললেন। ঘোড়া ভেড়া ছাগল, এককথায় দুনিয়ায় নিজের বলতে যা কিছু আছে সর্বস্ব নিয়ে ব্যবসা করতে চললেন মহাজন। বড়লোক মহাজনরা ঐভাবেই যান, কম বড়লোকেরা ঘর-ঘরণী ছেড়ে কম লোক নিয়ে যান। তবে পত্নী দু-একটি সকলেরই সঙ্গে থাকেন। ওঁরা না থাকলে চা-পাতা ফুটিয়ে দেবে কে?

যাত্রা আরম্ভ হল দুপুরের আগে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সমানে চলে যেখানে থামলাম সেখানে খোঁয়াড় আছে। খোঁয়াড় কথাটা আমি বার বার ব্যবহার করছি। পাথর আর মাটি দিয়ে গাঁথা দরজা জানলা বিহীন অন্ধকার গহ্বর, মনুষ্যবাসের জন্যে ঐরকম আস্তানা দুনিয়ার আর কোথাও বানানো হয় কিনা তা আমার জানা নেই। এ দেশে ঐরকম ঘরে লোকে ছাগল গোরুও রাখে না। সেই খোঁয়াড়গুলোর নাম পান্থশালা, পুণ্য কামাবার আশায় কোনও বড়লোক ভুটিয়া মহাজন ঐ পান্থশালা বানিয়েছেন। তাঁর নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয়েছে। হোক, আমি হিংসে করছি না। কিন্তু চাক্ষুষ দেখলাম সেই পান্থশালায় ছাগল ভেড়া ঝাব্বুদেরও ঢোকানো হল না। পান্থশালার সামনে তাঁবু

খাটানো হল। সর্বাগ্রে ছাগল ভেড়াদের একটা তাঁবুতে ঢোকানে হল। তাদের পিঠ থেকে মাল নামিয়ে বস্তা বস্তা দানা খেতে দেওয়া হল। ঝাব্বুদেরও ভারমুক্ত করা হল। তারা কিন্তু বাইরে রইল। একদম বেপরোয়া ওরা, ঠাণ্ডা তা সে যেমন ঠাণ্ডাই হোক, ঝাব্বুদের কিছুতে কাবু করতে পারে না।

যে কটি ঘোড়া ছিল দলে তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। আলাদা তাঁবুতে স্থান পেল তারা, আলাদা খাদ্য পেল। শুখনো ঘাস চাই, শুধু দানা খেয়ে ঘোড়া বাঁচতে পারে না।

জন্তু-জানোয়ারদের ব্যবস্থা হবার পরে মানুষের ব্যবস্থা। সর্বপ্রথম যে তাঁবুটি খাড়া হল মানুষদের জন্যে সেটি মহাজনের গদি। গদি চাই, গদিয়ান হয়ে হাত দেড়েক লম্বা রূপার নলে মুখ লাগিয়ে পেতলের হুঁকো হাতে নিয়ে তামাক না টানলে লোকে মহাজন বলবে কেন। মাত্র এক রাত্রির আশ্রয় তা হোক, তা বলে জাঁকজমক এতটুকু খাটো হলেই সর্বনাশ। অতএব ভয়ঙ্কর দামী ভয়ঙ্কর পুরু তাঁবু জোরা গালচে পাতা হল। সেই গালচের একধারে ছোট আর একটা গালচে চড়ানো হল। তার ওপর চড়ল মোটা মোটা কম্বল। অন্ততঃ আধ হাত উঁচুতে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে আসীন হলেন মহাজন। সঙ্গে সঙ্গে কারুকার্যখচিত মহামূল্যবান হুকোটি দেওয়া হল তাঁর হাতে। নিশ্চিন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিলকুল মাল আবার বেঁধেছেঁদে তোলা হচ্ছে জানোয়ারদের পিঠে ততক্ষণ ঐ গদি থাকবে। সর্বশেষে উঠবেন মহাজন, তারপর তাঁর গদি উঠবে, তাঁবু গোটানো হবে।

ইলাহী কাণ্ড যাকে বলে। প্রত্যেকটি দিন সকালে বিকেলে কম-সে-কম তিন তিন ছ ঘণ্টা সহ্য করতে হবে ঐ হুজ্জত। চেঁচামেচি তর্ক গালাগাল এমন কি মারপিট পর্যন্ত বেধে যাবে তাঁবু ফেলবার সময় একবার তোলবার সময় একবার। রেওয়াজ, খানদানী আদবকায়দা। ভয়ানক বড়মানুষ মহাজন কি চোরের মত চুপি চুপি যেতে পারেন। ইজ্জত বজায় রাখতে হলে ঐ বিরাট কাণ্ডকারখানা করাই চাই।

আমরা হচ্ছি ফালতু। ফালতুরা মুখ বুজে বসে থাকবে বা দাঁড়িয়ে থাকবে একধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাঁবু গোটানো হলে সকলের সঙ্গে হাঁটতে থাকবে। হাঁটা শেষ হলে আবার সেই অপেক্ষা, ঘণ্টা তিনেক পরে সব কিছু গোছানো হলে পর ফালতুদের জন্যে নির্দিষ্ট তাঁবুটি খাড়া হবে। তারপর অবশ্য সত্যিকারের বিশ্রাম, শুয়ে বসে থাক যেভাবে খুশি, গতর নাড়তে হবে না। অন্য সবাই খেটে মরছে তুষারঝড়ের মধ্যে, সামলাচ্ছে তাঁবু, জন্তু-জানোয়ারদের·তোয়াজ করছে, আগুন জ্বালিয়ে জল ফোটাবার চেষ্টা করছে, এমন কি মেয়েরা পর্যন্ত বসে নেই। তাঁরাও চা-পাতা জ্বাল দিচ্ছেন, গম ভাজা ছাতু মিশিয়ে সেই গরম গরম চা-সিদ্ধ জল প্রত্যেকের মুখের সামনে পৌঁছে দিচ্ছেন। কিন্তু ফালতুদের কোনও কাজ নেই। ফালতুরা যে তীর্থ করতে যাচ্ছে, তাদের একমাত্র কাজ ভজন করা। ভজন কর, ভোজন নাও, ঘুমাও। ঘুম অবশ্য বাপের ঠাকুর, লিপুধুরার পর ঝাব্বুরাও ঘুমায় না। ভুটিয়া মদ ছটাকখানেক পেটে গেলে গারবেয়াংএর মাঘ মাসকে বাঙলা দেশের ফাগুন মাস বলে মনে হয়। সেই অমৃত ঢক ঢক করে গিলেও খোদ মহাজন পর্যন্ত কার্পেটের তলায় পড়ে সারারাত দাঁতে দাঁতে ঠক্কর লাগান যেখানে, সেই লিপুধুরার দিকে এগিয়ে চললাম আমরা প্রথম রাত কালাপানিতে কাটিয়ে। চড়ছি, একটু একটু করে উঠে যাচ্ছি ওপর দিকে। যত উঠছি ততই মাথা কামড়ানি বাড়ছে। ঐ মাথা কামড়ানি, ঐ জিনিসটি তিব্বতের পথে গারবেয়াংএর পর আগাগোড়া সঙ্গের সাথী। কিবা দিন কিবা রাত মাথা কামড়াচ্ছে। ছিঁড়ে যাচ্ছে দুই রগ, বুকের ভেতরটা শুখিয়ে কাঠ হয়ে আছে। সাধে কি আর কৈলাসবাসী সবাই গাঁজা টেনে বুঁদ হয়ে থাকেন।

· মাথা কামড়ানি আর তেষ্টা ঐ দুই দুশমনকে দাবিয়ে যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে কৈলাসযাত্রায় তাহলে বুঝতে হবে যে সশরীরে তার কৈলাসপ্রাপ্তি ঘটে গেল। সেই কালঘুম ভাঙাবার সাধ্য স্বয়ং কৈলাস-পতির পিতৃদেবেরও নেই।

যাক, মাথা গরম করলে চলবে না আমার। কৈলাসযাত্রার বছর ত্রিশেক পরে লিখতে বসেছি, তবু মাথা গরম হয়ে উঠছে কেন খামকা! মানানসই মোলায়েম করে সেই শয়তান ক্ষেত্রটির সৌন্দর্য বর্ণনা করা চাই যা পড়ে আরও পাঁচটা মানুষ জ্যান্ত অবস্থাতেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে ছুটবে। তবেই না আমার এই বই লেখা সার্থক হবে।

অতএব বলুন—জয় কৈলাসপতি হরে। তারপর শুনুন—সাক্ষাৎ নীলকণ্ঠের অকপট পরিচয়।

প্রথম রাত কালাপানিতে কাটল। গারবেয়াং থেকে কালাপানি পৌঁছতে কোনও কষ্ট হল না। কালীনদীর কূলে কূলে চলতে হয়, নদীর কূল ধরে হাঁটলে খাড়ি পার হতে হবেই, অনেকগুলো খাড়ি পার হতে হল আমাদের। কালীর চেয়ে কালীর খাড়িদের তেজ অহঙ্কার অনেক বেশী। মালপত্র সমেত জানোয়ারগুলোকে পার করবার সময় যথেষ্ট সাবধান হতে হল। তারপর শুরু হল জঙ্গল, জঙ্গলময় গোলাপ ফুটে রয়েছে। তবে কাঁটা নেই। কাঁটা যেমন নেই তেমনি একরত্তি গন্ধও নেই। শুধুই রূপ, রূপ আর রঙ্, চোখ জুড়োলেও মন ভরে ওঠে না। এই জন্যেই বোধ হয় নারী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কবিরা নারীর রূপের সঙ্গে হুলেরও প্রশংসা করে থাকেন। যে নারীর হুল নেই, কাঁটা ফোটাতে পারে না, তার রূপ যতই থাকুক না কেন, দুদিনেই সে পুরুষের নজরে পুরনো হয়ে যায়।

জঙ্গল পার হবার পর সাক্ষাৎ হল সাক্ষাৎ পাষাণের সঙ্গে। যার নাম প্রাণহীন পাষাণ তাই। নীলকণ্ঠের শ্রীঅঙ্গের শ্রীরূপ। উঃ কি বীভৎস দৃশ্য! যুগযুগান্ত বরফের তলায় চাপা থাকতে থাকতে আস্ত আস্ত পাহাড়গুলো মরে একদম পাষাণ হয়ে গেছে। কঙ্কাল মাংস চামড়া শ্রী ছাঁদ কিচ্ছু নেই। সেই কঙ্কালের বর্ণনা দেবার শক্তি নেই আমার, সাক্ষাৎ শুকদেব গোস্বামীরও নেই বোধ হয়। মায়াহীন শুকদেবেরও নিঃশ্বাস পড়বে সেই মৃত্যুপুরে পৌঁছে। চতুর্দিকে আকাশ-

ছোঁয়া কঙ্কালগুলো দাঁড়িয়ে আছে, তার মাঝখানে কালাপানির পান্থশালা। কালাপানিতে পৌঁছে চারিদিকে তাকিয়ে যদি কোনও কবির চিত্তে সৌন্দর্যের দোলা লাগে তাহলে বুঝতে হবে তাঁর চেয়ে নৃশংস জীব দুনিয়ায় দুটি নেই। একটি মাত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে চিত্ত, অনুভূতিটি হল হাহাকার। নশ্বর সংসারে অবিরাম মৃত্যু দেখেও মানুষ জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে অচেতন থাকে। কিন্তু কালাপানিতে যে মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় হয় সেই মৃত্যুর স্পর্শে পর্বতও কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। মরবার পরে পর্বতের দশাটা কি রকম দাঁড়ায় তাই যদি দেখতে চান তাহলে গারবেয়াং পার হয়ে কালাপানি ঘুরে আসুন।

সেই মৃত্যুপুরীতে রাত কাটিয়ে পরদিন আবার যখন যাত্রা শুরু হল তখন বজ্রগিরি বাবা আমাকে ডেকে দু-টুকরো কম্বল আর দুগাছা দড়ি দিয়ে বললেন—"সঙ্গে রাখ, কাজে লাগবে।" যথা আজ্ঞা। লোধা সিং একটা ঘোড়ার পিঠে চলেছে। হাঁটবার মত শক্তি হয় নি তার তখনও। বজ্রগিরি যা রাখতে দিলেন সেগুলো নিয়ে লোধা সিংকে দিলাম। কে বইবে, নিজের হাত-পাগুলোকেই তখন কেটে বাদ দেবার জন্যে ইচ্ছে করছে।

শুরু হয়ে গেছে শ্বাসকষ্ট, তেষ্টায় ছাতি ফাটছে। চলেছি ঢেউ-খেলানো মাঠের মাঝখান দিয়ে। গাছপালা লতাগুল্ম কিচ্ছু নেই, শুধুই পাথর। এবং বিলকুল মরা পাথর। সেই মরা পাথরের ফাটলে তুষার গলে একটু আধটু জল জমে আছে। ছাগল ভেড়া ঝাব্বু ঘোড়া সবাই জিভ বার করে চাটছে সেই জল। একমাত্র মানুষই অসহায়, ছাতি ফাটলেও জিভ দিয়ে তুষার চাটতে পারে না। বাটি ডোবে এমন একটু জল যেখানে মিলছিল সেখানে জানোয়ারদের খেদিয়ে হামড়ি খেয়ে পড়ছিল মানুষরা। দু-একবার আমার ভাগেও এক আধ বাটি জল মিলল। জল না হলাহল, গলা দিয়ে নামবার পর তেষ্টাটা হাজার গুণ বেড়ে গেল। ঠিক করে ফেললাম, জান যায় সেও ভি আচ্ছা, ঐ জল আর ঠোঁটে ছোঁয়াব না।

দু মাইল পার হতে ঘণ্টা তিনেক লাগল।

বরফ শুরু হয়ে গেছে। খালি পায়ে হাঁটছি বরফের ওপর দিয়ে, কোনও কষ্ট নেই। মন একেবারে মাথায় চড়ে গেছে। বুক থেকে মাথা, মাথা থেকে বুক ওঠানামা করছে মন। বুকের তলায় কোনও অনুভূতিই নেই। ঠ্যাং দুখানা তখন কেটে নিলেও টের পেতাম না।

প্রায় চোখ বুজে হাঁটছি। চোখ মেলে থাকলেও কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। বরফ থেকে উঠছে বাষ্প, কিংবা সেই বাষ্প জমেই বরফ হচ্ছে। মোদ্দা কথাটা হল কুয়াশা, সেই কুয়াশা কালো নয়, সাদা মেঘের মত সেই কুয়াশা প্রচণ্ড বেগে দৌড়চ্ছে। এক হাত সামনে কিছুই দেখবার উপায় নেই। ঘোড়ায় চড়া লোধা সিংকে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে শুধু, খুব ঝাপসা একটা আয়নায় ওর ছায়াটা দেখছি যেন। বিলকুল সব কিছুই অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। ইহলোকের সঙ্গে সর্ব-সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, শরীর নেই, আমরা সবাই অশরীরী প্রেত। ছায়া দিয়ে তৈরী প্রেতলোকে বিচরণ করছি। কোথায় যাচ্ছি তা যেমন জানি না, কেন যাচ্ছি তাও তেমনি মনে নেই। শুধু তেষ্টা আর মাথা কামড়ানি ঐ দুই দুশমনকে মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারছি না।

সারাটা দিন সেইভাবে কাটল। পরে জানতে পেরেছিলাম যে মাত্র ছ-সাত মাইল চলেই উঠে পড়েছিলাম লিপুর মাথায়। সেই ছ-সাত মাইল সবটাই চড়াই, তবে সে চড়াই বোঝা যায় না। লিপুর মাথায় চড়ে বোঝা যায় কোথায় উঠে এসেছি। সেইখানে দাঁড়িয়ে যা দেখা যায় এবং যতদূর দেখা যায় তার বর্ণনা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে লিপুর মাথায় চড়ে সামনের দিকে তাকালে, বিস্ময়ের ধাক্কায় মাথা কামড়ানি তেষ্টা বিলকুল যায় উবে। মনে হয়, ডানা মেলে উড়ে যেতে পারি। তিব্বতকে এক নজরে যিনি দেখতে চান, তাঁকে লিপুর মাথায় দাঁড়িয়ে চোখ মেলে তাকাতে হবে শুধু। আমাদের এই চোখ দুটোর দৃষ্টি কোথায় কতদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তা আমরা জানিও না। জন্ম থেকে অনবরত বাধা পাচ্ছে

আমাদের দৃষ্টি, দিগন্ত বলতে যা বুঝি আমরা, সে দিগন্ত একেবারে নাগালের মধ্যে। আমাদের কাছে অনন্ত আকাশটা শুধু কথার কথা। লিপুর মাথায় দাঁড়িয়ে প্রথম বুঝতে পারলাম যে চক্রবাল কথাটা একদম বাজে কথা, আকাশ কোথাও মাটির সঙ্গে মিশে নেই। আকাশ যদি মিশেই যায় মাটির সঙ্গে তাহলে অনন্ত আকাশের অনন্ত মহিমা যে ধূলায় লুটোবে।

বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে পেলাম না। ইতিমধ্যেই অবতরণ শুরু হয়ে গেছে। ওপরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, দলের মাথাটা মাইল দুয়েক নেমে গেছে। লোধা সিংকে নিয়ে তার ঘোড়াটাও চলে গেছে প্রায় সিকি মাইল সামনে। তীরবেগে নামতে লাগলাম। নামতে নামতে পেঁাছে গেলাম এক নদীর ধারে। নদীতে বইছে জল, সত্যিকারের জল। নদীর কূলে রয়েছে শুখনো ঝোপ। ভেড়া ছাগল ঝাব্বু ঘোড়া পিঠে মোট নিয়েই জল খেতে লাগল। জল খেয়ে ঝোপ ছিঁড়ে চিবোতে লাগল। মানুষগুলো ওদের খাতিরে সেখানেই সেদিন বিশ্রাম পেল। মহাজন তাঁবু গাড়বার হুকুম দিলেন।

জায়গাটার নাম পুরাং। পুরাং হচ্ছে তিব্বতী শহর। লিপুর চূড়া থেকে সোজা উড়ে গেলে মাত্র সাত মাইল যেতে হবে। তিব্বতী শহর পুরাং তাহলে লিপু থেকে সাত মাইল। সাত মাইলের প্রথম দু মাইল নেমে নদীর ধারে আমরা আড্ডা গাড়লাম। মিছামিছি একটা রাত ওখানে কাটাতে হল, তুলকালাম কাণ্ড করে তাঁবু খাটাতে হল। রাতটা কাটিয়ে আবার সেই তুলকালাম কাণ্ড করে তাঁবু গোটাতে হল। কোনও প্রয়োজন ছিল না, লিপু পার হয়ে সেইদিন সন্ধ্যার আগেই অনায়াসে পুরাং পেঁাছনো যেত। আমাদের মহাজনটি যদি একটু কম বড়মানুষ হতেন তাহলে সোজা পুরাং পেঁাছে রাত কাটাতেন। বড়লোক মহাজনের সঙ্গে ভিড়ে কি মুশকিলেই না পড়েছিলাম।

সেই রাত্রেই বজ্রগিরি বুঝিয়ে দিলেন পুরাং পেঁাছে কি করতে হবে

আমাদের। যে মহাজনটির সঙ্গে আমরা চলেছি তিনি ওখান থেকে যাত্রা করে যেখানে থামবেন সেটা একটা গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে এক নদী বইছে, নদীর নাম মাপ চু। মাপ চু নদী পার হলেই পুরাং। পুরাং শহরে প্রকাণ্ড বাজার আছে, তিব্বতের এক শাসনকর্তা থাকেন পুরাংএ, পাহাড়ের মাথায় দুর্গ আছে, লামাদের মঠ তো আছেই। মাপ চু নদীর এপারের গ্রামে মহাজনের এক বাড়ি আছে, ঘর-সংসার সেখানে রেখে পুরাং বাজারে দোকান খুলবেন তিনি। বজ্রগিরি মহাজনের সঙ্গে নদীর এপারে গ্রামে থাকবেন, আমি আর লোধা সিং নদী পেরিয়ে পুরাং চলে যাব। সেখানে আমরা লুকিয়ে থাকব একটি মঠে, মঠে যাতে আশ্রয় পাই আমরা সে ব্যবস্থা মহাজন করে দেবেন। কৈলাসযাত্রার সময় বজ্রগিরি আমাদের ডেকে নেবেন।

লোধা সিং বজ্রগিরির দু পা জড়িয়ে ধরে কান্না জুড়ে দিলে। তখন গুরু-শিষ্যে আমার অবোধ্য ভাষায় বিস্তর আলাপ আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হল লোধা সিং। আমাকে বলল যে রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করতে হবে। অর্থাৎ জন্তু জানোয়ার মানুষজন নিয়ে যখন যাত্রা করবেন মহাজন তখন আমরা মাপ চু পেরিয়ে পুরাং বাজারে পৌঁছে যাব। পুরাং পৌঁছে লামাদের মঠটি খুঁজে বার করতে মোটেই কষ্ট হবে না। মঠটি পাহাড়ের ওপর পুরাং কেল্লার পাশে, কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই আমরা মঠে পৌঁছতে পারব।

ব্যাপারটা যেন ভাল বলে মনে হল না। কি দরকার অত লুকোচুরির? কিসের জন্যে লুকিয়ে থাকব আমরা লামাদের মঠে? ওখানে লুকিয়ে থাকব যে কদিন সে কদিন বজ্রগিরি কি করবেন?

আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম পুরাং পৌঁছে লোধা সিংকে ত্যাগ করতে হবে। চলেছি কৈলাসে, একটিবার কৈলাস মানসসরোবর পরিক্রমা করতে পারলেই ইহজন্মের মত ঐ হাঙ্গামাটা চুকে যাবে। কোনও রকমে একটা পাক দিতে পারলেই হল। আপদের শান্তি. কৈলাস মানসসরোবর দেখা হল না

বলে মনটা আর খচখচ করবে না। এক আপদের শাস্তি করবার জন্যে আমি চলেছি, মাঝখানে রহস্যময় আর এক আপদ যেন ঘনিয়ে উঠল। না, কিছুতেই এই উড়ো আপদে জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না। যে কোনও উপায়ে হোক পুরাং পৌঁছেই ওঁদের কাছ থেকে কেটে পড়তে হবে।

ভোররাতে বজ্রগিরি আমাদের ডেকে তুললেন। অন্ধকার থাকতে থাকতে আমরা রওয়ানা হলাম। ছোট্ট একটা থলিতে কিছু তিব্বতী টাকাপয়সা দিলেন লোধাকে। আমাকে বললেন, "পালিও না। পালালে প্রাণে বাঁচবে না। তোমার হাতে আমার এই শিষ্যটির ভার রইল। ও ভয়ানক বোকা, যে কেউ ধাপ্পা দিয়ে ওর মাথা খেতে পারে। দেখলে তো, কিভাবে মরছিল এক দুশমনের পাল্লায় পড়ে। শান্তিতে থাকগে কয়েকটা দিন, আমি যাচ্ছি। পথের কাঁটা সাফ করে তবে আমি যাব। পুরাং থেকে যাত্রা করে আবার যাতে কোনও বিপদে না পড়তে হয় সে ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।"

যথা আজ্ঞা। মনে যা আছে তা তো করবই। সর্বাগ্রে বজ্রগিরির নাগালের বাইরে তো পৌঁছনো যাক।

ভাল করে আলো ফোটে নি তখনও। সোজা চলেছি একটা জল-ধারার পাশ দিয়ে। চড়াই উৎরাই নেই, পথ ভুল হবারও সম্ভাবনা নেই। ডানপাশে সেই জলধারা বা নদী বাঁপাশে আকাশছোঁয়া পাষাণ-প্রাচীর। অনবরত জল পার হতে হচ্ছে, সেই পাষাণ-প্রাচীরের ভেতর থেকে অসংখ্য ঝরনা নেমে ডানপাশের সেই নদীতে মিশেছে। সেই নদীটির বা বড় ঝরনাটির তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড় এক নদীর সামনে হাজির হলাম। মাপ চু হল সেই নদীর তিব্বতী নাম, অন্য একটা নামও আছে। যতদূর মনে হচ্ছে অন্য নামটি কর্ণালী, যদি ভুল হয় তাহলে আমার স্মরণশক্তিকে ক্ষমা করা উচিত। কর্ণালী বা মাপ চু নদীর কূলে পৌঁছে মুখ তুলে তাকালেই ঠিক সামনে পুরাং বাজার

দেখা যায়। নদী থেকে অন্ততঃ দশ-বারোতলা ওপরে শহর। কর্ণালী পার হবার জন্যে কাঠের পোল রয়েছে। পোলে পা দেবার আগে পেছন ফিরে তাকালাম। সেই গ্রাম কই! বজ্রগিরি বললেন, নদীর এপারে এক গ্রাম আছে, সেই গ্রামে মহাজন থাকবেন। কিন্তু গ্রাম তো দেখতে পেলাম না। ধাঁধা লেগে গেল, বজ্রগিরি কি ফাঁকি দিলেন আমাদের? পরে অবশ্য দেখতে পেয়েছিলাম সেই গ্রাম। নদী পেরিয়ে পুরাং বাজারে উঠে ওপারে তাকাতেই দেখা গেল গ্রামখানি। ওপারেও ঐ এক অবস্থা, নদী থেকে দশতলা উঁচুতে রয়েছে গ্রামখানি, নদী-গর্ভে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। ধিক্কার দিলাম নিজেকে, পাপ মন বজ্রগিরি বাবার মত মহাপুরুষকেও সন্দেহ করছে। কুকুরের লেজ, হাজার বছর ধরে ঘি দিয়ে ডললেও কিছুতে সোজা হবে না।

যাক, পৌঁছে গেছি তিব্বতের প্রথম শহরে। দুঃখের বিষয় বাজারটা ঘুরে দেখতে পাব না। সোজা আমাদের চলে যেতে হবে মঠে। অর্থাৎ ওঠ আবার ত্রিশ-চল্লিশতলা পাহাড়ের গা বেয়ে। পুরাং কেল্লা পুরাং মঠ পুরাংবাসী সম্ভ্রান্ত গৃহস্থদের অট্টালিকা সমস্ত সেই পাহাড়ের মাথায়। সম্ভ্রান্তরা তো আর বাজারে থাকতে পারেন না।

লোধা সিং কিন্তু সোজা মঠে গিয়ে সেঁধুতে নারাজ। বাজারে পান-ভোজন করে তবে সে মঠে যাবে। মৌনব্রত না থাকলে ওকে বোঝাতে পারতাম যে গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা প্রয়োজন। বাজারে ঘুরে বেড়ালে প্রত্যেকেই দেখবে আমাদের। তারপর মঠে গিয়ে লুকিয়ে থাকলে কি ফল হবে। বজ্রগিরি বাবা যে উদ্দেশ্যে মঠে লুকিয়ে থাকতে হুকুম দিয়েছেন সে উদ্দেশ্যটাই সিদ্ধ হবে না।

উদ্দেশ্যটি কিন্তু আমি জানি না, লোধা সিং জানে। আমাকে বোঝাতে লাগল সে, একটিবার বাজারে গিয়ে কোথাও বসে কিছু খেয়ে নিলে কোনও ক্ষতি হবে না। সাতসকালে লোকজনও নেই বাজারে, মহাজনরা দোকান খোলে নি। সবাই তখন খাওয়াদাওয়া করছে। কোনও মহাজনের কাছে গিয়ে কিছু পয়সা দিলেই রুটি পাওয়া যাবে।

চট্ করে কিছু খেয়ে নিয়ে মঠে যাওয়া উচিত। মঠওয়ালারা কি খেতে দেবে কে জানে। তাছাড়া একটিবার মঠে গিয়ে সেঁধুলে আর তো বেরিয়ে আসা যাবে না।

অগত্যা যেতে হল ওর সঙ্গে। বজ্রগিরি বলে দিয়েছেন, তাঁর বোকা শিষ্যটিকে সামলাতে হবে। নয়ত আবার কোন দুশমনের পাল্লায় পড়ে বেঘোরে মারা যাবে বেচারা। মৌন হচ্ছে সম্মতির লক্ষণ। মৌন হয়ে শুনেছি আমি বজ্রগিরির আদেশ, অর্থাৎ সম্মত হয়েছি। সুতরাং কি করে লোধা সিংকে একলা ছেড়ে দোব !

মৌন যেমন সম্মতির লক্ষণ তেমনি অনেক সময় সর্বনাশের লক্ষণও হয়ে দাঁড়ায়। পরে সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলাম। লোধার সঙ্গে যদি না যেতাম বাজারে, লোধাকে টেনে নিয়ে সটাং যদি মঠে চলে যেতাম তাহলে—

যাক, এখন আমি পুরাং মঠ সম্বন্ধে কিছু শোনাই। লামাদের মঠে বাস করার সৌভাগ্য কজনেরই বা হয়েছে। বিচিত্র সেই জগৎ, সেখানকার আইনকানুন একদম আলাদা। সেই রহস্যময় জগৎ সম্বন্ধে কিছু শোনবার লোভ সংবরণ করা সত্যিই সহজ নয় আমার পক্ষে। বজ্রগিরি বাবার জন্যেই পুরাং শহরের শিম্পি লিং গোম্পায় আশ্রয় পেয়েছিলাম। ঐ সৌভাগ্যটির জন্যে বজ্রগিরিকে স্মরণ করে আজও আমি প্রণাম করি।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ ঐ তিনটি গুণের কবল থেকে নিস্তার পাবার উপায় কি ?

এক কথায় জবাব—একদম নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া। ঐ সাধনাই করা হয় তিব্বতের মঠে, নিস্ত্রৈগুণ্য হবার জন্যে নিস্তব্ধতার সাধনা করেন ওঁরা। বলেন—যে শক্তিগুলো তরঙ্গ তুলছে তোমার ভেতরে সেই শক্তিই মায়া। অনবরত বিভ্রম ঘটাচ্ছে ঐ মায়া, ঐ মায়ার প্রভাবে অবিরাম জন্ম-মৃত্যুর ঘূর্ণিতে পড়ে পাক খাচ্ছ। নিস্তরঙ্গ হও, ঘূর্ণিটা বন্ধ হোক, তাহলেই হাঙ্গামা চুকে যাবে। উপলব্ধি করতে পারবে সেই মহাশূন্যতা, আদিতে ছিল যে মহাশূন্যতা, যা থেকে সব কিছুই জন্মাল। যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা ছিল না, কিছুই ছিল না যখন, তখন যা ছিল তার নাম মহাশূন্যতা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন লোপ পাবে, যখন কিছুই থাকবে না, তখন যা থাকবে তার নামও মহাশূন্যতা। কোন শক্তির প্রভাবে এই সৃষ্টিকর্মটি শুরু হয়েছে তা জেনে লাভ কি। যে মহাশক্তির প্রভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা চালু রয়েছে সেই শক্তির অধীশ্বর হতে চাও কেন। ঐ শক্তিটা কিছুই নয়, এক সময় ওটা ছিল না, আবার এক সময় ওটা থাকবে না। যখন ঐ শক্তি জন্মায় নি তখন যা ছিল, যখন ঐ শক্তির খেলা থেমে যাবে তখন যা থাকবে, সেই একমাত্র সত্য সুন্দর শাশ্বতের সাধনা কর। সেই দেবতাটির নাম মহাশূন্যতা, মহাশূন্যতার শক্তি হচ্ছেন প্রজ্ঞা—প্রজ্ঞাপারমিতা। প্রজ্ঞাপারমিতা বৌদ্ধতন্ত্রের একমাত্র উপাস্যা মহাশক্তি।

আমরা সাধনা করি সেই মহাশক্তির যিনি সৃষ্টি করছেন পালন করছেন সংহার করছেন। শিবশক্তির সংযোগ হলে যা হয় সেইটি আমরা উপলব্ধি করতে চাই, শিবশক্তির সংযোগের ফলে যে মহা-শক্তির স্ফুরণ হয় সেই মহাশক্তির অধীশ্বর হতে চাই আমরা। আমরা জানি ঐ মহাশক্তির অধীশ্বর যদি হতে পারি, তাহলে জন্ম-মৃত্যুর কব

থেকে মুক্তি পাব। কালীসাধনা করে আমরা কালী হয়ে যেতে চাই, যে কালীর কোনও বর্ণ নেই। সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনটি গুণ হচ্ছে তিনটি বর্ণ। কালো রঙের মধ্যে যে কোনও রঙ্ ঢাললে সেটা কালো হয়ে যায়। তাই আমাদের আরাধ্যা মহাশক্তি কালী ত্রিগুণাতীতা।

আর ঐ কালী হচ্ছেন মহাকালের শক্তি। মহাকালের বুকে যখন শক্তির খেলা শুরু হয় তখন সৃষ্টি শুরু হল। যতক্ষণ ঐ শক্তির খেলা চলল মহাকালের বুকে ততক্ষণ সৃষ্টিটা চলল। যেদিন থামল ঐ মহা-শক্তির খেলা সেদিন সব শেষ। পড়ে রইল সেই মহাকাল, যে কালের আদি নেই অন্ত নেই।

আমাদের উপাস্য দেবতা মহাকাল, বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতা মহাশূন্যতা।

মহাকাল আর মহাশূন্যতার মধ্যে তফাৎটা কোথায়?

আমাদের মহাকালকে উপলব্ধি করতে হলে কালশক্তি কালীর সাধনা করতে হবে। মহাশক্তি কালী সাক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপ। মহা-শূন্যতাকে উপলব্ধি করতে হলে প্রজ্ঞাশক্তির সাধনা করতে হবে। প্রজ্ঞাশক্তির সাধনা করতে করতে সাধক এবং সেই প্রজ্ঞাশক্তি এক হয়ে যাবে।

সাধক হলেন বুদ্ধ, যিনি জানতে চাচ্ছেন। যা জানতে চাচ্ছেন তার নাম প্রজ্ঞা। জানবার জন্যে যে শক্তির সাধনা করছেন তার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। জানা হয়ে যাবার পরে যা হবেন তা হল ধ্যানী বুদ্ধ, জানবার আগে যা থাকেন তার নাম ধ্যানী বোধিসত্ত্ব। ধ্যানী বোধি-সত্ত্বের মধ্যে মূর্ত হয়ে রয়েছে প্রেম এবং সমবেদনা। ধ্যানী বুদ্ধ প্রেম এবং সমবেদনারও ঊর্ধ্বে। ধ্যানী বুদ্ধ মহাশূন্যতার মূর্ত প্রতীক, সাক্ষাৎ মহাকাল, সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনটি গুণ তাঁর নাগাল পায় না।

তফাৎটা কোথায়?

শিম্পি লিং গোম্পায় যে কটা দিন থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই কদিন বোঝবার চেষ্টা করেছিলাম, হিন্দুতন্ত্রে আর বৌদ্ধতন্ত্রে

তফাৎ কোথায়। যা বুঝতে পেরেছি তার নামটিও ঐ—শূন্যতা। তফাৎ কোথাও নেই। তবে ঐ শূন্যতায় বিলীন হবার জন্যে তিব্বতী মঠে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হয়, সেই উপায়গুলোর সঙ্গে আমাদের তন্ত্রের উপায়গুলোর আকাশ-পাতাল ফরক আছে। থাকতে বাধ্য। ষোল হাজার থেকে বিশ হাজার ফুট ওপরের জল বাতাস যেমন হাল্কা বা সূক্ষ্ম, সেখানকার উপায়গুলিও তেমনি সূক্ষ্ম হবে। তাই হওয়াই স্বাভাবিক। এখন সেই সূক্ষ্ম উপায়গুলি সম্বন্ধে যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি তাই পেশ করছি। তার আগে শিম্পি লিং গোম্পা সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া দরকার।

নৈস্ত্রৈগুণ্য হবার পরেও এই পাঞ্চভৌতিক দেহ বার বার ধারণ করা যায়—যেমন দালাই লামা, তিব্বতের রাজধানী লাসার পোটালা প্রাসাদে যিনি বাস করেন, যিনি তিব্বতের এক এবং অদ্বিতীয় অধিপতি। দালাই লামা সাক্ষাৎ বুদ্ধ, দালাই লামা অবতার, দালাই লামা এক দেহ ত্যাগ করে আবার জন্মগ্রহণ করেন। তিব্বতের সিংহাসন শূন্য থাকতে পারে না। এক দালাই লামা দেহত্যাগ করলে আর এক দালাই লামাকে খুঁজে বার করা হয়। লক্ষণ মিলিয়ে চার-পাঁচ বছরের একটা বাচ্চাকে ধরে আনা হয় দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে। তোলা হয় পোটালা প্রাসাদে। তারপর সেই সাক্ষাৎ ভগবানটিকে গড়েপিটে সাক্ষাৎ বুদ্ধ বানিয়ে ফেলা হয়।

আমার মত ঘন ঘিলুওয়ালাদের বিশ্বাস করতে আটকাবে ব্যাপারটা। প্রশ্ন উঠবে—ওটি আবার ঘটতে যাবে কেন? বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবার পরে, প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিয়ে যাবার পরে, জন্ম-মৃত্যুর আদিতে যা ছিল সেই মহাশূন্যতায় লীন হবার পরে বার বার দেহধারণ করা! কেমন যেন সোনার পাথরবাটি গোছের কিছু বলে মনে হচ্ছে না!

আজ্ঞে না, কোনও রকমে ঢোঁক গিলে ঐ সোনার পাথরবাটিকে মেনে নিন, তাহলেই লেঠা চুকে গেল। সমস্যা বলতে কিছুই রইল

না। সাক্ষাৎ বুদ্ধ, জলজ্যান্ত বুদ্ধ, পোটালা প্রাসাদের সন্ন্যাসী রাজা দালাই লামাকে স্বয়ং ভগবান বলে মেনে নিন। আপত্তি কিসের? যে ভগবানকে ধরাছোঁওয়া তো বহুদূরের কথা, যার সম্বন্ধে সঠিক করে কিছু কল্পনাও করা যায় না, সেই ভগবান রক্তমাংসের দেহধারণ করে পোটালা প্রাসাদে বিরাজ করছেন, এটা বিশ্বাস করতে পারলে লাভ ছাড়া লোকসানটা কোথায়? নেই—মামার চেয়ে একটি কানা-মামা থাকা নিশ্চয়ই ভাল।

শিম্পি লিং গোম্পার যিনি প্রধান লামা তিনিও সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের অবতার। তিব্বতে অজস্র মঠ আছে, দেশের শতকরা ষাটজন মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে মঠে বাস করেন। শিম্পি লিং তিব্বতের নামকরা মঠ। স্বয়ং দালাই লামা লাসা থেকে শিম্পি লিং মঠের মোহন্তকে প্রেরণ করেন। শিম্পি লিং মঠের মোহন্ত হয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। আমাদের সৌভাগ্য, মঠের সিংদরজার সামনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান লামার সামনে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। হাঁটু গেড়ে পাথরের মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে তাঁর আসনের সামনে আমরা প্রণাম করলাম। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই একটি আদেশ শুনিয়ে দেওয়া হল আমাদের। মোহন্ত মহারাজের ডান পাশে একজন মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী খাড়া ছিলেন, পরিষ্কার হিন্দীতে তিনি বললেন—"এই মুহূর্তে তোমাদের লুকিয়ে ফেলা হবে। বজ্রগিরি মহারাজ যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ ছাড়া পাবে না। সাবধানে থাকবে, নিঃশব্দে থাকবে, এই মঠের লোকরাও জানতে পারবে না তোমরা কোথায় আছ।"

বেঁকে দাঁড়াল লোধা সিং। জিজ্ঞাসা করল—"কেন আমরা লুকিয়ে থাকব চোরের মত? কি করেছি আমরা?"

লোধার প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ মোহন্ত মহারাজের চোখে মুখে অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল যেন। যে সন্ন্যাসীটি হিন্দীতে কথা বলছিলেন তাঁর কানে ফিসফিস করে কি বলে দিলেন। তখন তিনি লোধার পাশে এসে দাঁড়িয়ে খুবই চাপা গলায় বললেন—"তুমি তোমার গুরু বজ্রগিরির

আদেশ অমান্য করে বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছ। অনেকে তোমায় দেখে ফেলেছে। তার ফল খারাপ দাঁড়াতে পারে। তোমার গুরুজীকে তো তুমি ভাল করেই চেন।"

জোঁকের মুখে নুন পড়ল, লোধা সিং কুঁকড়ে গেল। হাত তুলে মোহন্ত মহারাজ ওকে কাছে ডাকলেন। আসনের পাশে গিয়ে নিচু হয়ে দাঁড়াল লোধা। বৃদ্ধ লামার একখানা হাত ওর মাথার ওপর স্থির হয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে শুনতে পেলাম একটি অদ্ভুত মন্ত্র, বার বার তিনবার উচ্চারিত হল সেই মন্ত্রটি, কিন্তু কে উচ্চারণ করল তা বুঝতে পারলাম না।

হিন্দীজানা লামাটি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"আপনার বন্ধুটি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, এখন নির্ভয় হলেন। চলুন, কোথায় থাকবেন আপনারা দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনি তো মৌনী, আপনার বন্ধুকেও মৌন অবলম্বন করতে হবে। এই মঠের সর্বপ্রধান আইন নিঃশব্দ হয়ে যাওয়া। শান্তিতে কয়েক দিন নিঃশব্দ হবার জন্যে সাধনা করুন। ভগবান তথাগত আপনাদের কৃপা করবেন।"

তথাগত কৃপা করলেন। কৃপাটি কিন্তু আলোবাতাস-বর্জিত। এমন একটা গর্তে ঢোকানো হল আমাদের যার ভেতর হাওয়া আলোর প্রবেশ নিষেধ। ও দেশে হাওয়াকে সবাই দুশমন জ্ঞান করে। যেখানে হাওয়া চলাচল করতে পারে না সেখানে মানুষের মাংস চামড়া শুখিয়ে যায় না, তাই বাস করবার জন্যে মানুষে পাহাড়ের গা খুদে গর্ত বানায়। শিম্পি সিং গোম্পাটা বানানো হয়েছে পাহাড় খুদে। শত শত ঘর-দালান, বড় বড় উপাসনার ঘর, বিলকুল তৈরী হয়েছে পাহাড়ের ভেতর সুড়ঙ্গ কেটে। কোনও রকমে একটা মানুষ চলতে পারে এই রকম সরু গলি আর সিঁড়ি কত যে আছে সেই মঠে তার হিসেব বোধ হয় স্বয়ং মোহন্ত মহারাজও জানেন না। চমরী গরুর দুধ জমলে মাখম হয়ে যায়, সেই মাখম দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়। সেই প্রদীপ যতটুকু

আলো দিতে পারে তার হাজার গুণ দিতে পারে ধোঁয়া আর দুর্গন্ধ। সারা তিব্বতে অসংখ্য মঠ মন্দিরে প্রত্যেক দিন কত হাজার টন মাখম পোড়ে সে হিসেব ভগবান তথাগতও নিশ্চয়ই জানেন না। অবশ্য তথাগত ভগবানটি আলোর পরোয়া করেন না, প্রজ্ঞার আলোকে তাঁর অন্তর উদ্ভাসিত। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ জীবের পক্ষে দিবা-রাত্র অন্ধকার সহ্য করাটা ভয়ানক রকম শাস্তি হয়ে দাঁড়াল। প্রধান লামাকে দর্শন করে হিন্দীভাষী লামার পিছু পিছু আমরা হাঁটতে লাগলাম। গলির পর গলি পার হয়ে গেলাম প্রায় চক্ষু বুজে, কারণ চোখ মেলে থাকলেও কিচ্ছু দেখবার উপায় নেই এমন অন্ধকার। চলতে চলতে কতবার যে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলাম নিচে নামলাম, কতবার ডান পাশের বাঁ পাশের পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেলাম তা তখন কে মনে করে রাখতে যাচ্ছে। এক সময় চলার শেষ হল। আমাদের পথপ্রদর্শকটি ফিসফিস করে বললেন—"এই আপনাদের থাকবার জায়গা। দাঁড়ান একটু, আলো জ্বালাচ্ছি।"

কিছুক্ষণ দম আটকে দাঁড়িয়ে রইলাম। খট্‌খট্ করে কয়েকটা শব্দ হল। চকমকি ঠোকা হল নিশ্চয়ই। সেই ভয়াবহ পাতাল-পুরীর গর্ভে ফুঁ দেওয়ার আওয়াজ শুনতে লাগলাম। জ্বলে উঠল আলো, অর্থাৎ সেই মাখম-প্রদীপ। আলো দেখে দম ফেলে বাঁচলাম।

ঘরখানি নেহাত ছোট নয়। দুজন মানুষ শুয়ে থাকবার পরেও আরও জনাদুয়েক শুয়ে থাকবার মত জায়গা পড়ে থাকবে। সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথার ওপর থেকে ছাত পর্যন্ত পাকা দু বিঘত ফাঁক থাকে। লম্বা মানুষ লোধা সিংকে অবশ্য একটু কোমর ভেঙে দাঁড়াতে হল। দেওয়াল মেঝে ছাত সবই এক রঙের মিসমিসে কালো। প্রদীপের ভুসো পড়ে পড়ে ঐ রকম রঙটা দাঁড়িয়ে গেছে।

তা যাক, রঙ্ নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অবস্থা নয় তখন আমাদের। লোধা সিং বেচারার মুখের অবস্থা বড়ই করুণ হয়ে উঠল। মুখ ফুটে

জিজ্ঞাসা করে ফেললে সেই লামাকে—"যদি দরকার পড়ে তাহলে বাইরে যাব কেমন করে?"

আশ্চর্য হয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন—"বাইরে যাবার দরকার পড়বে কেন?"

লোধা মুখ নিচু করে রইল। বুদ্ধের অসীম করুণা, লামাটি আন্দাজ করতে পারলেন ব্যাপারটা। বললেন—"আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক ডান পাশেই আর একটি কামরা আছে, সেখানে যা করার করবেন। সমস্ত শুখিয়ে যাবে, গন্ধটন্ধ হবে না। তবে অসুবিধে বোধ করবেন আপনারা, আপনাদের অভ্যাস জল ব্যবহার করা। এখানে ঐটি চলবে না। জল আমরা স্পর্শ করি না।"

আঁতকে উঠল লোধা সিং—"জল ছুঁতে পাব না! যদি তেষ্টা পায়!"

"চা খাবেন। দিনেরাতে অন্ততঃ বার দশেক আপনাদের কাছে চা পৌঁছে যাবে।" কথাটা বলে লামা নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন।

হাসবার ব্যাপারটা কি ঘটল? বোকার মত আমরা দুজন ওঁর মুখপানে তাকিয়ে রইলাম। এবং সেই প্রথম মর্মে মর্মে বুঝতে পারলাম আসল হাসি কাকে বলে। মুণ্ডিত-মস্তকপ্রায় প্রৌঢ় একটি পুরুষ, মুখচোখের না আছে শ্রী না আছে সৌন্দর্য, নিঃশব্দে হাসছে। মুখটা কুঁচকে উঠেছে, চোখ দুটো প্রায় বুজে এসেছে। আর কিছুই নয়, ঐটুকুতেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে লোকটি খুবই খুশি হয়ে পড়েছে। বিনা কারণে আনন্দ উথলে উঠেছে লোকটার ভেতরে, তারই অভিব্যক্তি ঐ অহেতুক হাসি। কিন্তু সেই নির্ভেজাল হাসির শক্তি সাংঘাতিক। স্থান কাল ভুলে আমরা দুজনেও খুশি হয়ে পড়লাম। বিস্তর বাজে দুশ্চিন্তা মগজের ভেতর তোলপাড় করছিল, হঠাৎ সেই তরঙ্গটা স্তব্ধ হল। লোধা সিং বলল—"যাক—কয়েকটা দিন শান্তিতে থাকতে পাব আমরা। কিন্তু এত ভাল হিন্দী বলতে শিখলেন কোথায় আপনি? তিব্বতে কি হিন্দীতে কথাবার্তা চলে?"

"আমি তিব্বতী নই। রাজগীর নলান্দা বুদ্ধগয়া ঘুরে এসেছি

বেনারস ইউনিভারসিটিতে পড়েছি। এখন থাকুক এসব কথা। আবার আমি আসব। আপনারা বিশ্রাম করুন। একটু পরে চা খাবার আর কম্বল দিয়ে যাবে। দেখবেন, কোনও কষ্ট হবে না।" বলতে বলতে লামা আমার দিকে ফিরে বললেন—"আপনি মৌনব্রতী, আপনার কাছে এ জায়গা স্বর্গ। শান্তিতে থাকুন, ভগবান তথাগত আপনার সহায় হোন।"

কথাটা ভাল করে শেষ করবার আগেই লামাটি অন্তর্ধান করলেন।

জ্বলতে লাগল সেই মাখম-প্রদীপ কুলুঙ্গিতে। ইটের মত শক্ত গোটাকতক মাখমের ডেলা জমা রইল সেই গহ্বরের কোণে। মাঝে মাঝে সেই মাখম প্রদীপে চাপানো ছাড়া কোনও কাজ নেই। কম্বল মিলেছে এন্তার, শয্যা মেঝের ওপর এক বিঘত উঁচু হয়ে উঠেছে। চুপচাপ দুজনে হয় শুয়ে আছি নয় বসে আছি। দু তিন ঘণ্টা অন্তর চায়ের পাতা সিদ্ধ জল আর গম ভাজা ছাতু আসছে। পদার্থটা গেলা যায়, কিন্তু ঐ চমরীর দুধ জমানো মাখমই করেছে সর্বনাশ। মাননীয় অতিথি দুজনকে বেশীরকম খাতির করার জন্যেই বোধ হয় বেশী করে মাখম দেওয়া হচ্ছে চা সিদ্ধ গরম জলে। খুব সম্ভব ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে একেবারে ধ্বংস করার দরুণই সাধকদের একমাত্র খাদ্য-পানীয়র সঙ্গে সেই অতি ভয়ঙ্কর সুগন্ধযুক্ত মাখম দেওয়া হয়। তলায় খুরো লাগানো দুই বাটিও দেওয়া হয়েছে আমাদের। বাটির মাপ এক পোয়ার বেশী নয়। সেই বাটি বসাবার জন্যে বিঘতখানেক উঁচু ছোট ছোট দুখানি জলচৌকিও সমুপস্থিত হয়েছে দুজনের শয্যার পাশে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি একদম নেই। বরং আদর-আপ্যায়নটা খুবই বাড়াবাড়ি রকম চালানো হচ্ছে বলেই মনে হল। লোধ সিং বেচারা খুবই মুষড়ে পড়ল যেন। মুষড়ে পড়ার কারণ—জল নেই। ভোরবেলা অন্ততঃ এক লোটা জল চাই ওর। আর প্রত্যেকবার চা খাবার সময় বাটি ধোয়ার

জন্যে জল চাই। যে লামাটি আমাদের চা পরিবেশন করতে লাগলেন তিনি ভগবান তথাগতের কৃপায় দু-দুটি ইন্দ্রিয়কে ধ্বংস করে ফেলেছেন। শুনতে পান না এবং কথা বলতে পারেন না। অর্থাৎ একাধারে বোবা এবং কালা। প্রত্যেকবার চা খাওয়াতে এসে বিশুদ্ধ তিব্বতী পন্থায় তিনি আমাদের বাটি দুটি মার্জন করে চা ঢেলে দিতেন। প্রণালীটি এক কথায় অনবদ্য। লামা তাঁর জোব্বার ভেতর থেকে একখানি রুমাল বার করতেন, যে রুমালে তাঁর নাকঝাড়া এবং থুতু ফেলা কর্ম দুটিও সম্পন্ন হত। সেই রুমাল দিয়ে আমাদের বাটি দুটি অতি যত্নে মার্জন করে চা ঢালতেন, চায়ের ওপর দিতেন এক মুঠো করে ছাতু। কয়েকবার চেষ্টা করেছিল লোধা বাধা দিতে, ঐভাবে বাটি মোছাটা কিছুতেই সে বরদাস্ত করতে পারছিল না। বাধা দিতে গিয়ে উল্টো ফল ফলল। বৃদ্ধ কালা লামা বুঝলেন বাটি মোছা কর্মটিতে খুঁত থেকে যাচ্ছে। সুতরাং প্রত্যেক বাটিতে আগে এক ধেবড়া থুতু দিয়ে তবে বিশেষ যত্নপ্রয়োগে মার্জন করতে লাগলেন।

আসল কথা, বিকার বর্জন করা চাই। বিকার বর্জন করার যদি বাসনা থাকে সোজা তিব্বতে চলে যান। মহাত্মা বশিষ্ঠদেব কম দুঃখে কি আর তারা সাধনা করার জন্যে তিব্বতে গিয়েছিলেন?

আমরা অবশ্য সাধনভজনের তাগিদে তিব্বতে যাই নি। আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের আকাঙ্ক্ষাটিও ছিল ক্ষুদ্র। শুধু একটিবার মানস-কৈলাস পরিক্রমা করে আসা।

কোথায় কৈলাস? কৈলাসনাথ কি তিব্বতী গোম্পায় সেঁধুতে সাহস করবেন? কিছুতেই নয়। অষ্টপ্রহর তিনশ-পঁয়ষট্টি দিন যাঁর মাথায় গঙ্গাজল ঢেলেও আমরা তুষ্ট করতে পারি না, তিনি ঢুকবেন সেই জলহীন দুর্গে? ওঁ মণিপদ্মে হুং—বাঙলায় বলতে হলে বলুন—রামশ্চন্দ্রঃ।

অবলোকিতেশ্বরই জানেন কটা দিন কটা রাত কাবার হয়ে গেল

বহির্জগতে। অন্তর্জগতে বসে সে হিসাবটা আমরা রাখতে পারলাম না—লোধা সিং ওধারে ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। মতলব ভাঁজতে লাগল কি উপায়ে চম্পট দেওয়া যায়। একলা যাবে না, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আমি সাধুমানুষ, তার জন্যেই আমাকে দুর্গতি ভোগ করতে হচ্ছে। নিজের জন্যে মোটেই সে ভাবছে না, আমার দুঃখ দেখে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। অতএব পালাতেই হবে আমাকে তার সঙ্গে। কোনও চিন্তা নেই, মঠ থেকে কোনও রকমে বেরুতে পারলে আর আমাদের পায় কে। সোজা কৈলাস, বিস্তর লোক এখন চলেছে কৈলাসে, কোনও একটা দলে ভিড়ে পড়তে পারলেই হল।

কাকে ভয়? ঐ বজ্রগিরি বাবাকে? কি করতে পারেন উনি?

স্বেচ্ছায় লোধা সিং ওঁর শাগরেদি করছে, যেদিন খুশি যখন খুশি ওঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। কি করে উনি বাধা দেবেন? উনি কে, ওঁর সত্যিকারের পরিচয় কি, সমস্ত লোধা জানে। লোধার সঙ্গে যদি চালাকি করতে চান বজ্রগিরি তাহলে সকলের কাছে ওঁর আসল পরিচয়টি জানিয়ে দেবে। তাতে অবশ্য ওর নিজেরও বিপদ ঘটবে। ঘটুক, দশ বছর জেল খাটতে হয় সেও ভি আচ্ছা, তবু লোধা দশটা দিন জলহীন নরকে পচে মরতে পারবে না।

শুনতে শুনতে সোজা হয়ে উঠে বসলাম। পাহাড়ের গর্ভে সেই নিঃশব্দ গহ্বরে বসে চমরী গায়ের জমানো দুধ দিয়ে জ্বালানো প্রদীপ-শিখার পানে তাকিয়ে খুব সম্ভব ভগবান অমোঘসিদ্ধিকেই মনেপ্রাণে প্রণাম নিবেদন করলাম। বললাম—"হে ভয়শূন্যতার মূর্ত প্রতীক, একমাত্র তোমার কৃপাতেই অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হতে পারে। দেখো বাপু, বজ্রগিরি আর লোধাকে ঘিরে রয়েছে যে রহস্য সেই রহস্যের অন্তরে যেন প্রবেশ করতে পারি।"

অমোঘসিদ্ধি কৃপা করলেন। লোধা সিং অকপটে আত্মকাহিনী শোনাতে লাগল।

পাতিয়ালা লুধিয়ানা লাহোর রয়ালপিণ্ডি এন্তার নামজাদা সব জায়গা। সেই সব নামজাদা জায়গায় বজ্রগিরি বাবা তাঁর বজ্রশাসন চালাতেন। রাজা মহারাজাদের ওপর ওঁর নেকনজর ছিল বেশী। মাঝে মধ্যে কোনও কুমার বাহাদুরকে বা কোন ছোট রাজাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করে রাখতেন। মোটা মুক্তিপণ আদায় হত। দিব্যি রাজার হালে চলে যেত। সমস্ত কাথিওয়াড় বজ্রগিরি বাবার ভক্ত। জুনাগড় ভেরাওল জামনগর ইত্যাদি গোটা পাঁচ সাত নেটিভ স্টেট নিয়ে কাথিওয়াড়। প্রত্যেক স্টেটের আলাদা আলাদা রেলওয়ে। হাতি তলোয়ার নিশান ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ আর বাঈজী নিয়ে নেটিভ স্টেটের অধিপতিরা মশগুল, প্রজারা খায় বাজরার রুটি আর গুড়ের ডেলা। সেই হতভাগা হতভাগীদের কাছে বজ্রগিরি সাক্ষাৎ ভগবান। অন্ন বস্ত্র। শিক্ষা চিকিৎসা কোনও কিছুর সংস্থান নেই যাদের লক্ষ লক্ষ টাকা বিলিয়ে বজ্রগিরি তাদের কিনে নিয়েছেন। ঐ টাকাটা কোথা থেকে আসত কেউ জানতে পারত না। কাথিওয়াড়ের স্টেটগুলোর যাঁরা অধিপতি তাঁরা স্বেচ্ছায় কিছু কিছু দিতেন। প্রত্যেকেই মনে করতেন যে তাঁর চেয়ে অনেক বেশী অপরে দান করেছেন। নয়ত অত টাকা খরচা করেন কি করে বজ্রগিরি।

প্রজাপতির নির্বন্ধ, পোরবন্দরের রাজকন্যার সঙ্গে রাজস্থানের এক রাজকুমারের বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেছে। খবরটি বজ্রগিরি জানতেন না। তিনি বহুদিন ধরে তোড়জোড় করছিলেন রাজস্থানের সেই কুমারটিকে বাগাবার জন্যে। মওকা পেয়ে বজ্রগিরির চেলারা কুমার বাহাদুরকে গুম করে ফেললে।

শিকার জালে পড়েছে—এই সংবাদটি যখন পৌঁছল বজ্রগিরির কাছে তখন তাঁর ভক্ত পোরবন্দর অধিপতিও সকন্যা হাজির হয়েছেন। বেশ একটি বড় গোছের ভুল চাল চাললেন বজ্রগিরি। পোরবন্দর অধিপতিকেবললেন—"কোনও ভয় নেই, তোমার ভবিষ্যৎ জামাতা বাবাজী বাহাল তবিয়তে আছে। মা ভবানীর কৃপায় শীগ্‌গির সে ফিরে আসবে।"

যথাসময়ে সেই কুমার যথাস্থানে ফিরে গেল, পোরবন্দরের কন্যার সঙ্গে তার বিয়েও হয় গেল। বিয়ের আগে ভবানীর পূজার জন্যে পোরবন্দর অধিপতি নগদ পঁচিশ হাজার বজ্রগিরির পায়ে ঢেলে দিলেন। কিন্তু ঐ সঙ্গে আর একটি কর্মও করে ফেললেন আর পাঁচ-জন রাজা-মহারাজার পরামর্শে। ইংরেজ বড়লাটকে অনুরোধ করলেন বজ্রগিরি বাবার ওপর নজর রাখবার জন্যে। লক্ষ কোটি টাকা পায় কোথায় সাধু? সত্যিই কি স্রেফ ভবানীর কৃপার জোরেই ভবিষ্যৎ জামাতা বাবাজীটি মুক্তি পেয়ে গেল? তীর্থ করতে যাচ্ছি বলে হঠাৎ যখন অন্তর্ধান হন সাধু তখন তিনি যান কোথায়?

মাস পাঁচ ছয় পরে আবার একটি ঘটনা ঘটল। খাস দিল্লী শহরের ভয়ানক নামজাদা এক মহাজনের ছোট ভাই বিকানীর থেকে চুরি হয়ে গেল। বজ্রগিরি তখন তীর্থ করছেন। ধরা পড়লেন লাহোরে। হাতে পায়ে শিকল বেঁধে বিরাট তোড়জোড় করে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে কাথিওয়াড়ে। লোহার খাঁচায় পুরে হাতিতে চাপিয়ে প্রত্যেক স্টেটে ঘুরিয়ে প্রজাদের দেখানো হল।

তারপর বিচার। ইংরেজ জজ বিচার করে বজ্রগিরির ফাঁসির হুকুম দিলেন। কাথিওয়াড়ের গরীব প্রজারা সেই ভয়ঙ্কর সংবাদটি জানতেও পারল না।

লাহোর জেলে মাটির তলায় ফাঁসির আসামীদের রাখবার জন্যে চমৎকার ব্যবস্থা আছে। সেখানে বন্দী রইলেন বজ্রগিরি। লোকে তাঁর কথা ভুলে গেল।

ওধারে সেই মাটির তলার সেলে থাকতে থাকতে বজ্রগিরি ঐ রকম মুটিয়ে গেলেন।

ফাঁসির দিন এগিয়ে আসছে। বজ্রগিরি খাচ্ছেন আর নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন। কোনও চিন্তা নেই তাঁর, ফাঁসিটা যে কার হবে তা যেন তিনি জানেনই না। হঠাৎ একদিন ভোরবেলা দারুণ হৈ চৈ লেগে গেল লাহোর জেলে। ছুটোছুটি দৌড়দৌড়ি হুংকার চিৎকার

পাগলাঘন্টি, জেলসুদ্ধ বন্দী দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল কি হয়েছে জানবার জন্যে। আর কি হবে, যা হবার তাই হয়েছে। একজন ফাঁসির আসামী ছিল জেলে, পরদিন ভোরেই তার ফাঁসি হত। সমস্ত ব্যবস্থা তৈরী, দড়ি পর্যন্ত খাটানো হয়ে গেছে। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ পাখি উধাও। যার বিয়ে তাকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফাঁসির আসামী লাহোর জেলের মাটির নিচের সেল থেকে অন্তর্ধান করেছে। বল—তখন ইংরেজের মহামূল্য প্রেস্টিজটা থাকে কোথায় !

ঐ পর্যন্ত বলে থেমে গেল লোধা সিং। দেখলাম, ভয়ানক রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। চোখ মুখ সর্বাঙ্গ দিয়ে আগুন ছুটছে যেন। অনেকক্ষণ অগ্নিজ্বলন্ত নেত্রে তাকিয়ে রইল আমার মুখপানে। তারপর আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—"আমার একটা বউ ছিল একটা বাচ্চা ছিল আর আমার বুড়ো বাপ ছিল। তাদের কি হল জানেন মহারাজ ?"

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে চুপিচুপি বলল—"না, আমার কোনও দুঃখ নেই। আমার গুরুজী তার প্রতিশোধ নিয়েছেন। সামান্য একটা ওয়ার্ডার ছিলাম আমি, ওরা আমার বউকে আমার বাচ্চাকে আমার বুড়ো বাপকে নাশ করল আমার অপরাধের দরুণ। আমার গুরু বজ্রগিরি আবার সেই অপরাধের দরুণ ইংরেজ জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তার মেমসাহেব তার ছেলেমেয়ে সব নিকেশ করেছেন। লাহোর জেলের জেলর সাহেব থেকে শুরু করে বড় জমাদার পর্যন্ত এক প্রাণী বেঁচে নেই। আমার গুরু বজ্রগিরি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর দয়ামায়া থাকতে নেই। কেমন কি না মহারাজ ?"

কে জবাব দেয়। আমি মৌনী, ইশারা পর্যন্ত করতে পারি না। দু-হাতে জাপটে ধরলাম লোধাকে। জাপটে ধরলে কি ইশারা করা হয় !

লামা জঙ্গ-চুপ-সেম্পা শুধু হিন্দীই জানতেন না, অনর্গল ইংরেজীতে কথা বলতে পারতেন। প্রায়ই আসতেন আমাদের কাছে, যখনই আসতেন মুখে সেই আশ্চর্য হাসিটি লেগে থাকত। লোধার সঙ্গে তাঁর ভয়ানক রকম বন্ধুত্ব হয়ে গেল। লোধা জানতে চেয়েছিল তাঁর নামটি, ঐ জঙ্গ-চুপ-সেম্পা গোছের কিছু বলেছিলেন। যতদুর মনে পড়ছে ঐ নামটির অর্থও বলেছিলেন তিনি। অর্থটি কিন্তু ইংরেজীতে বলেছিলেন—এন্‌লাইটেন্‌মেণ্ট কন্‌শাস্‌নেস্‌। বাঙলায় কি হবে? খুব সম্ভব—সংস্কৃতি চৈতন্য অর্থাৎ যে চৈতন্য দ্বারা দেহ মন হৃদয় আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা যায়। নামটি ভাল, কিন্তু ঠিকভাবে উচ্চারণ করা মুশকিল। তিব্বতী ভাষায় আলাপ করার কায়দাটি হচ্ছে জিভকে তালুর সঙ্গে ঠেকিয়ে কথা বলতে হবে। দুঃসাধ্য ব্যাপার, ষোল হাজার ফুট ওপরে না চড়লে ঐভাবে কথা বলা মোটেই সম্ভব নয়। উৎকট ঠাণ্ডায় সর্বেন্দ্রিয় আড়ষ্ট হয় যেখানে সেখানেই ঐভাবে জিভকে নিস্পন্দ রেখে কথা বলা যায়।

সৌভাগ্য আমাদের যে হিন্দীতে আলাপ করতেন লামা, কিন্তু খুবই চুপিচুপি। হরদম ফুসফুস শুনতে শুনতে লোধা জিজ্ঞাসা করে বসল, অত আস্তে কথা বলার হেতুটা কি। স্বাভাবিক ভাবে আলাপ করলেই বা শুনছে কে। শুনলেও কেউ কিছু বুঝবে না, কারণ হিন্দী ভাষা কেউ জানেই না।

আমার পানে তাকিয়ে লামা বললেন—"ওঁর মত মৌনী হয়ে থাকতে থাকতে আমার গলার জোর কমে গেছে। বহুদিন আমি নিঃশব্দ অবস্থায় ছিলাম। আমাদের এখানে সর্বপ্রথম কায়মনোবাক্যে নিঃশব্দ হবার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। মঠে যত সাধু বাস করছেন তার অধিকাংশই বছরের পর বছর কথা বলেন না। এত বড় মঠ, এত লোক বাস করছে মঠে, সাড়া পাচ্ছেন কিছু?"

সত্যিই তাই, ঠিক যেন মৃত্যুপুরী, কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। দিনে রাতে কয়েকবার ঘং ঘং করে কাঁসর বাজে, এমন বিদকুটে

আওয়াজ হয় যে সজোরে চমকে উঠি আমরা। পরমুহূর্তে আবার সব চুপ, চুপ মানে এমনই চুপ যে কোথাও এক প্রাণী বেঁচে আছে বলে মনে হয় না। বোবা কালা লামাটি চা ছাতু নিয়ে আসে, এতটুকু শব্দ হয় না। একেবারে সামনে সমুপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত টেরই পাই না আমরা যে কেউ আসছে। লামা জঙ্গ-চুপ-সেম্পার বেলাও ঠিক ঐ ব্যাপারটি ঘটে। এমনই নিঃশব্দে আসেন যে মনে হয় পাথরের মেঝে ফুঁড়ে উদয় হলেন বুঝি। যাবার সময় ঠিক চোখের সামনে অন্তর্ধান করেন। গুহার দরজা পার হলেন তো নেই, সঙ্গে সঙ্গে যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল। লামা জঙ্গ-চুপ-সেম্পা আসল রহস্যটি ভেঙে বললেন।

সর্বাগ্রে নিঃশব্দ হতে হবে। নিঃশব্দ হতে যিনি চেষ্টা করবেন নিস্পন্দ তাঁকে হতেই হবে। স্পন্দন যেখানে হচ্ছে সেখানে শব্দ হচ্ছেই। স্পন্দন যেখানে নেই সেখানে শব্দও নেই। ঐ নিস্পন্দ অবস্থায় পৌঁছতে পারলে ধারণা করা যাবে অস্পন্দ ব্যাপারটা কি। একমাত্র অস্পন্দ হচ্ছেন মহাশূন্যতা, মহাশূন্যতার প্রতীক অক্ষোভ। মহাশূন্যতা হল দর্পণ, যে দর্পণের ওপর সমগ্র সৃষ্টিটা প্রতিফলিত হচ্ছে, কিন্তু তার ফলে দর্পণের কোনও বিকার ঘটছে না। সুন্দর মুখ বা কুশ্রী মুখ যে কোনও রকমের মুখ দর্পণের সামনে যাক হুবহু তার ছবি দেখা যাবে, দর্পণ কিছুতেই ক্ষুব্ধ হবে না। মহাশূন্যতা দর্পণ, দর্পণ অক্ষোভ বুদ্ধ, অক্ষোভ বুদ্ধ অস্পন্দ। সেই অস্পন্দতা সম্বন্ধে কোনও কিছু ধারণা করতে হলে নিস্পন্দ হতেই হবে।

নিস্পন্দ না হলে খাদোমাদের কৃপালাভ করা যাবে না।

খাদোমা! সে আবার কি!

খাদোমা হচ্ছে তাই যাকে আমরা বলি ডাকিনী বা যোগিনী বা বিদ্যা বা সিদ্ধি। শ্মশানেমশানে নির্জন নিঃশব্দ স্থানে ঐ খাদোমারা বাস করেন। যোগীরা শ্মশানেমশানে যোগ অভ্যাস করতে যান কেন? ঐসব স্থানে তাঁরা নীরবতার ভাষা শুনতে পান, ঐ ভাষা শুনতে পেলে

জাগতিক ভয় পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। খাদোমারা উলঙ্গিনী, তাঁরাই হচ্ছেন সেই জ্ঞান বা সেই প্রজ্ঞাশক্তি যা উলঙ্গ সত্যকে দেখিয়ে দিতে পারে। ঐ খাদোমারা বা ডাকিনীরা প্রকৃতির অন্ধ শক্তি নয়। ওরা হল সেই গুণগুলো যেগুলো থাকার দরুণ প্রকৃতির বুকে অনবরত জন্ম মৃত্যু রূপান্তর ঘটে চলেছে। সর্বাগ্রে সাধক ঐ খাদোমাদের তুষ্ট করেন, খাদোমারা তুষ্ট হয়ে সাধককে সিদ্ধি লাভ করার শক্তি দান করেন।

বৌদ্ধতন্ত্রের খাদোমাদের কথা শুনতে শুনতে আমাদের যোগিনীদের কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের মহাপূজায় দেবীর দক্ষিণে যোগিনীর পূজা করতে হয়। দেবীর পূজার আগে যোগিনী পূজা যোগিনীর বলি দিতে হয়। আমরা বলি—ওঁ যোগিন্যঃ কামরূপাঃ সকলগুণযুতাস্তপ্তকার্ত্তস্বরাভা মত্তাঃ কঙ্কালমালাকলিতগলতটীরক্তবস্ত্রোত্তরীয়াঃ। শূলং পাশং কপালং শৃণিমপি বিধৃতাঃ সুস্মিতাঃ সুপ্রসন্না ভক্তানাং সাধকানামভিলষিতফলং দীয়মানাঃ সুবেশাঃ। ওঁ উর্দ্ধং ব্রহ্মাণ্ডতো বা দিবি গগনতলে ভূতলে নিষ্কলে বা পাতালে বা বনে বা সলিলপবনয়োর্যত্র কুত্র স্থিতা বা। ক্ষেত্রে পীঠোপপীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপদীপাদিকেন প্রীতা দেব্যঃ সদা নঃ শুভবলিবিধিনা পান্তু বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ॥

তফাৎটা কোথায়! বৌদ্ধতন্ত্রে হিন্দুতন্ত্রে তফাৎটা কোথায়! বৌদ্ধতন্ত্রের বজ্রযোগিনীটি কে!

·খাদোমারাই শেষ পর্যন্ত লোধাকে ঠাণ্ডা করে রাখল। খাদোমারা যখন সিদ্ধি দান করতে সিদ্ধহস্তা তখন একটি আধটি সিদ্ধি লোধাকে লাভ করতেই হবে। প্রাণপণে খোশামোদ করতে লাগল লামার—অন্ততঃ ঐ সিদ্ধিটি লাভ করিয়ে দাও যাতে ইচ্ছে করলেই অদৃশ্য হওয়া যায়। লামাও প্রাণপণে বোঝাতে লাগলেন—নিঃশব্দ হবার মাহাত্ম্য। ওপর ভেতর সব যখন নিঃশব্দ হয়ে যাবে তখন আর তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না। তোমার নিজের ভেতরে তরঙ্গ উঠছে, সেই তরঙ্গের

আঘাত লাগছে মনোময়কোষে। সঙ্গে সঙ্গে অপরে সেটা বুঝতে পারছে। মন একটা, মনোময়কোষও একটা। তাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা জুড়ে একটি মাত্র মনোময়কোষ রয়েছে, তুমি আমি সেই মনোময়কোষের মধ্যে ডুবে আছি। তোমার মন আমার মন আলাদা মন নয়, একই মন তোমার ভেতরে রয়েছে তোমার চতুর্দিকে রয়েছে, আমার ভেতরে রয়েছে আমার চতুর্দিকে রয়েছে। বিরাট এক কড়াইতে রয়েছে রস, তার মধ্যে ভিয়ানকার রসগোল্লা পান্তুয়া লেডিকেনী ল্যাংচা ছেড়ে দিয়েছে। রসগোল্লা মনে করছে আমার ভেতরের রস রসগোল্লার রস, পান্তুয়া মনে করছে আমার ভেতরের রস পান্তুয়ার রস। ঐ মনে করাটা হল রোগ। ঐটিকে সর্বাগ্রে নাশ কর। মন যখন কিছুতে কিছু করবে না তখন মনোময়কোষে স্পন্দন উঠবে না। স্পন্দনের আঘাতে অন্য মনও জাগবে না। ঐ অবস্থায় না পৌঁছতে পারলে ইচ্ছে মাত্র অন্তর্ধান করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কে শোনে মনোময়কোষের কেচ্ছা। লোধার অত সময় নেই, ধৈর্য তো নেই-ই। সদ্য সদ্য হাতে হাতে একটা কিছু পাওয়া চাই তার। কবে এসে উপস্থিত হবেন বজ্রগিরি তার ঠিক নেই। তিনি এলেই তৎক্ষণাৎ আমরা রওয়ানা হব কৈলাসের পথে। এ হেন অবস্থায় নিঃশব্দ হওয়ার জন্যে গুম মেরে বসে থাকবার অবকাশ কই। অতএব লামা জঙ্গ-চুপ-সেম্পার কাছ থেকে একটা কিছু তড়িঘড়ি আদায় করে নিতেই হবে লোধাকে। অন্য কিছু নয়, ঐ অদৃশ্য হওয়ার সিদ্ধাইটা পেলেই হল। ঐটে লাভ করতে পারলেই—

"আবার ফিরে যাব আমি লাহোরে—" ঐটুকু বলবার সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠত ওর চক্ষু দুটিতে। থেমে থেমে কয়েকবার উচ্চারণ করত—"লাহোরে ফিরে যাব আমি, আবার আমি ফিরে যাব।" তখন সেই জ্বলন্ত চোখের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে উঠত পাষাণ, গহ্বর, বিরাট বিপুল বিশাল নীলকণ্ঠের গর্ভে ছোট্ট একটু গর্তের মধ্যে সামান্য মানুষ লোধা সিংএর চোখের আগুনে যেটুকু উত্তাপ জন্মাত তাতে কতটুকু

উত্তপ্ত হতেন নীলকণ্ঠ ! মোটেই নয়, সৃষ্টির হলাহল যিনি কণ্ঠে ধারণ করে আছেন কি হবে তাঁর ঐটুকু হলাহলে। বোকা লোধা সিং ওয়ার্ডারের রক্তে যেটুকু হলাহল জন্মেছে তা দিয়ে কি নীলকণ্ঠের তর্পণ হয় ?

না, লোধা সিং পারবে না নীলকণ্ঠকে তৃপ্ত করতে, তাই তার গুরু বজ্রগিরিকে হাত লাগাতে হয়।

শেষ পর্যন্ত সামলে রেখেছিলাম বজ্রগিরির শিষ্যটিকে। যেদিন শিম্পি লিং গোম্পায় সশরীরে উপস্থিত হলেন বজ্রগিরি সেদিন তাঁর শিষ্যটিকে নিয়ে হাজির হয়েছিলাম তাঁর সামনে। কয়েক মুহূর্ত বজ্রগিরি তাকিয়েছিলেন আমার চোখের পানে। তারপর খুবই শান্ত গলায় বলেছিলেন—"ঠিক হ্যায়, তুমি যখন জানতে পেরেছ আমার পরিচয় তখন বিবেচনা কর আমার সঙ্গে চলা উচিত কি না। এখানে তাদের ধরতে পারলাম না, বোকামি করে লোধা সব ভেস্তে দিয়েছে। তারা দেখেছে লোধাকে, জেনেছে যে ও বেঁচে গেছে। সাবধান হয়ে গেছে। হয় লুকিয়ে আছে এখানে কোথাও, নয়ত এগিয়ে গেছে। যাই হোক, আমরা রওয়ানা হচ্ছি। ঠিক হ্যায়, নিশ্চয়ই দেখা পাব তাদের। আমার সঙ্গে দুশমনি করার লোভ কিছুতে তারা ছাড়তে পারবে না। এখন তুমি বিবেচনা কর, সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে আমার সঙ্গে যাবে কি না।"

হাঁ না কিছুই বলতে পারলাম না। বজ্রগিরি বুঝলেন। বললেন—"চল তাহলে, লামার সঙ্গে দেখা করে বিদেয় নেওয়া যাক। অনেক লোক চলেছে কৈলাসে আমরা তাদের দলে ভিড়ে যাব। শয়তানের দেশ, এখানে কিছুতেই কেউ একলা পথ চলতে পারে না।"

লামা জঙ্গ-চুপ-সেম্পা খাড়া ছিলেন পুরাং মঠের প্রধান লামার ডান পাশে। বিদায় নেবার জন্যে আমরা তিনজন উপস্থিত হলাম।

প্রধান লামা বাণী দান করলেন। দুটি মাত্র ইংরেজী কথা উচ্চারণ

করে লামা জঙ্গ চুপ সেম্পা সেই বাণীকে রূপদান করলেন—"**লাভ্ এণ্ড্ কম্প্যাশন্**।"

বজ্রগিরি মহারাজ জানতে চাইলেন—"যারা আজও দুশমনি করছে আমার সঙ্গে তাদের ধ্বংস না করলে—"

প্রশ্নটা শেষ করতে পারলেন না। প্রধান লামা ডান হাত ওপরে তুলে কি একটা মুদ্রা দেখালেন। লামা জঙ্গ-চুপ-সেম্পা আর একবার উচ্চারণ করলেন—"**লাভ্ এণ্ড্ কম্প্যাশন্**।"

তারপর এগিয়ে এসে হিন্দীতে বললেন—"চলুন, সামান্য কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখেছি, কৈলাসের পথে কাজে লাগবে।"

লামা জঙ্গ-চুপ-সেম্পা শেষবারের মত চা আর ছাতু খাওয়ালেন। তারপর আমরা দেবতা দর্শন করার সুযোগ পেলাম। পুরাং মঠে অনেকগুলি অতি বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি আছে। প্রতিটি মূর্তি সোনার পাত দিয়ে মোড়া। একসঙ্গে কম-সে-কম পাঁচ-সাতশ লোক বসতে পারে এত বড় দালান প্রতিটি মূর্তির সামনে, সেই দালানে লামাদের জন্যে সারবন্দী বসবার আসন, প্রতিটি আসনের সামনে চা খাবার জন্যে ছোট্ট জলচৌকী। উপাসনা এবং চা খাওয়া দুটি কাজই এক জায়গায় বসে সম্পন্ন করা হয়। ভগবান বুদ্ধ অন্ধকারে থাকতে ভালবাসেন, তাই মূর্তিগুলিকে খুব ভাল করে দেখা গেল না। চমরী দুধ জমানো প্রদীপে যেটুকু আলো হয় তাও ঝাপসা ধুপের ধোঁয়ায়। ডাকিনী যোগিনী সাধনা করবার উপযুক্ত গন্ধ ছড়াচ্ছে সেই ধুপ। অমিতাভ সহায় হোন, কিন্তু এ কথা আমি বলবই যে তিব্বতের মঠে যে ধুপ পোড়ানো হয় তার গন্ধে মাথায় খুন চাপতে বাধ্য। সেই খুনী মেজাজকে লাভ্ এণ্ড্ কম্প্যাশন্ দ্বারা জয় করাটাই বোধ করি ওঁদের সাধনার চরম লক্ষ্য।

এখন শুনুন কয়েকটি মূর্তির নাম আর পরিচয়। মূর্তিগুলি যে কত সুন্দর, কি চমৎকার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে মূর্তিগুলি থেকে তা নিশ্চয়ই বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না। আমি শুধু নাম আর পরিচয় দিয়ে ক্ষান্ত হব।

প্রথম—অবলোকিতেশ্বর। এঁর হাত চারখানি। দুখানি হাত বুকের ওপর জোড় করে আছেন। আর দুখানি হাত দু কাঁধের ওপর। কি মুদ্রা প্রদর্শন করছেন সেই হাতে? ঐ লাভ্ এণ্ড্ কম্প্যাশন্ মুদ্রা। মহামন্ত্র ওঁ মণিপদ্মে হুঁ অবলোকিতেশ্বরকে নিবেদিত।

দ্বিতীয়—অমোঘসিদ্ধি। ভয়শূন্যতার প্রতীক। এঁর পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সত্যিই যেন নির্ভয় হওয়া যায়।

তৃতীয়—অক্ষোভ। দর্পণ—যাতে সব কিছুই প্রতিফলিত হয় কিন্তু দর্পণ নিজে অক্ষোভিত থাকে।

চতুর্থ—অমিতাভ। ইনি হলেন সেই দৃষ্টিসম্পন্ন যে দৃষ্টি দিয়ে ভেদাভেদ বিচার করা যায়।

পঞ্চম—রত্নসম্ভব। যতগুলি বুদ্ধমূর্তি আমি দেখেছি তার মধ্যে রত্নসম্ভব মূর্তিটি এখনও পর্যন্ত আমার চোখের সামনে ভাসছে। উনি হচ্ছেন সেই জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক যে জ্ঞানে সমভাব জন্মায়।

আরও অনেক বুদ্ধ দর্শন হল। লামা জঙ্গ-চুপ-সেম্পা প্রতিটি মূর্তির অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। সাধক যতই চরম সত্যের কাছে গিয়ে পৌঁছান ততই তাঁর পরিবর্তন হয়। পরিবর্তনগুলির সঙ্গে যিনি পরিচিত হতে চান, তাঁকে বিভিন্ন বুদ্ধমূর্তিগুলি দেখতে অনুরোধ করব। তবে অর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্যে জঙ্গ-চুপ-সেম্পা লামার মত একজন পাশে থাকা চাই।

শেষ পর্যন্ত সেই এক কথাই দাঁড়ায় কিন্তু—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥

না, এ কথাটা মানতেই হবে যে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে দিয়ে ভগ্নী-পতির কোচোয়ান সেজে হৃদিস্থিত হৃষীকেশ যা বলেছিলেন, তার ওপর

আপিল চলে না। সাধে কি আর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মশায়ের একখানা মাত্র বইয়ের বিক্রি আজও রেকর্ড ব্রেক করে চলেছে।

নিঃশব্দ হও, নিস্তরঙ্গ হও, নিস্পন্দ হও। বলি উদ্দেশ্যটা কি? ঐ "লাভ্ এণ্ড কম্প্যাশন্" অর্থাৎ ঐ "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং"। এদিকে মাথা দিয়েই শোও বা ওদিকে মাথা দিয়েই শোও, মোদ্দা কথাটা হল পায়ের দিকেই পা থাকে। যে কোনও সাধনাই কর না কেন ঐ "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" পর্যন্ত পৌঁছানো চাই। আমাদের তন্ত্রে প্রথমে পশ্বাচার তারপর বীরাচার, সবশেষে দিব্যাচার। পশ্বাচারী নিজের ছেলের জ্বর সারাবার জন্যে মা কালীর সামনে পাঁঠার ছেলেকে কাটে। বীরাচারী মহাশ্মশানে নরবলি দিয়ে সেই শবে বসে জন্মমৃত্যুর রহস্য জানবার চেষ্টা করে। তারপর একদিন সে জানতে পারে—আমি কে। এই "আমি কে" জানা পর্যন্ত বীরাচার, তারপর দিব্যাচার। যে মুহূর্তে বীরাচারী জানতে পারে যে এই আমি প্রত্যেকের মধ্যে আছি, এই আমি আর ঐ ওর মধ্যে যে ওর আমি রয়েছে তারা দুজনে এক, সেই মুহূর্তে সে কার ওপর দ্বেষ করবে! 'আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু'—মহামন্ত্রে কে তর্পণ করতে পারে? দিব্যাচারী, একমাত্র দিব্যাচারী পারেন, যিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন। যে বীরাচারী নরবলি দিয়েছেন, পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, সেই সিদ্ধমন্ত্র জপ করে মহামায়ার মায়াকে জ্ঞানাগ্নিতে ভস্ম করতে পেরেছেন, একমাত্র তিনিই পৌঁছেছেন—হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্ত অবস্থায়। ইংরেজীতে যাকে বলে—লাভ্ এণ্ড কম্প্যাশন্—সেটা ঠিক কথার কথা নয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ ঐ অবস্থায় পৌঁছবার জন্যে তপস্যা করে চলেছে, বহু তপস্যার ফলে এই দেহকে দেহের অন্তর্গত মনবুদ্ধিকে নিস্তরঙ্গ করা যায়। এ কি ছেলের হাতের মোয়া যে নাক টিপলেই বা গলায় কণ্ঠী পরে কপালে রসকলি আঁকলেই—

যাগ গে, হক কথা বলার বিপদ আছে। কৃষ্ণানন্দজী একবার কন্যাকুমারীতে হক কথা বলতে গিয়ে দারুণ ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলেন। প্রকাশ্যে চরম তন্ত্র সাধনা করতেন কৃষ্ণানন্দ, আবার কৃষ্ণকথা বলতে বলতে কেঁদে আকুল হতেন। মস্ত বড় এক ভক্ত সমাবেশে কৃষ্ণকথা

শোনাচ্ছিলেন উনি, দিনের পর দিন শুনছে মানুষ আর পাগল হয়ে উঠছে। হঠাৎ এক দিন এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করে বলল—"স্বামীজী, পরম বৈষ্ণব হয়ে ঐসব অনাচার করেন কেন আপনি? মদ্য মাংস ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি সহযোগে—"

কৃষ্ণানন্দজী বললেন—"বাবা, এখনও আমি বৈষ্ণব হতে পারি নি, বৈষ্ণব হবার চেষ্টা করছি। বৈষ্ণব হবার একমাত্র পন্থা তন্ত্রসাধনা।"

আর বিশেষ কিছু বলতে হল না স্বামীজীকে। রাত না প্রভাত হতেই পাততাড়ি গুটোতে হল।

আমরাও পাততাড়ি গোটালাম।

আপাদমস্তক আবৃত করে মঠের সিংদরজা পার হয়ে খোলা আকাশের তলায় দাঁড়ালাম যখন, আবার তখন নীলকণ্ঠ কালো কম্বল মুড়ি দেবার আয়োজন করছেন। লামা জঙ্গ-চুপ-সেম্পা এমনভাবে সাজিয়ে দিলেন আমাদের যে নীলকণ্ঠের বিষাক্ত নিশ্বাস চর্ম স্পর্শ করতে পারবে না। মোটা কম্বল দিয়ে বানানো পাজামা, সে পাজামা আবার এমন যে অঙ্গের সঙ্গে লেপ্টে রইল। তার ওপর হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুলের আংরাখা, তাও ঐ কম্বল দিয়ে তৈরী। তার ওপর চড়ল কমলা রঙের জোব্বা, জোব্বা চৈনিক সিল্কে বানানো। মাথায় চাপানো হল লোমওয়ালা চামড়ার টুপি, টুপি না বলে টোপর বলাই উচিত। তারপর চরণের আবরণ, সে এক কিম্ভূতকিমাকার কাণ্ড। আগে কম্বল জড়ানো হল দুই চরণের গোছ পর্যন্ত। তারপর দুখানা চৌকো চামড়ার উপর দাঁড়ালাম। এমনভাবে দাঁড়ালাম যে চামড়ার চার কোণ বেরিয়ে রইল পায়ের চতুর্দিকে। সেই কোণ চারটে ওপর দিকে মুচড়ে দিয়ে চামড়ার দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হল। হয়ে গেল পাদুকা, সোজা হেঁটে যাও তুষারের ভেতর দিয়ে, সে চামড়া এমন চামড়া যে কিছুতেই ভিজবে না। কিন্তু চলতে হবে তো। হঠাৎ যদি দুপায়ে কেঁদো কেঁদো গোদ গজায় তাহলে সেই কেঁদো গোদ নিয়ে চলতে কেমন লাগে!

যেমনই লাগুক, নিতে হবে সমস্ত। লামা জঙ্গ-চুপ-সেম্পার সামনে অঙ্গে চড়িয়ে নিতে হবে। আহা—নিছক লাভ্ এণ্ড কম্প্যাশনের দান। এতটা বেল্লিক নই আমরা যে সে দান প্রত্যাখ্যান করব।

পাহাড়ের ওপর থেকে পুরাং বাজারে নেমে এলাম। লোধা সিং তখনই সব খুলে ফেলে স্নান করবে। কোনও কথা শুনবে না সে, আগে স্নান করবে তবে অন্য কথা। কর্ণালী নদীতে গিয়ে সর্বাগ্রে অধঃঅঙ্গ প্রক্ষালন করে আসা চাই। ছি ছি ছি, অধঃপাতে যাক বেটারা, জীবনে জলস্পর্শ করে না এমন পিশাচ!

বজ্রগিরি মহারাজও মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। লোধার বকুনি তাঁর কানেই ঢুকল না। বাজার পার হলাম আমরা, সোজা চলতে লাগলাম তুষারক্ষেত্রের ওপর দিয়ে। ওঠা নামা নেই, প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে হাঁটছি। আমি আর লোধা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি তখন। এ কি হল! ভরসন্ধ্যেবেলা চললাম কোথায়?

সেই পিশাচস্থানের মাহাত্ম্য এমন যে সন্ধ্যার পরেও অন্ধকার হয় না। গাছপালা নেই, ছায়া বলতে কিছুই নেই, অন্ধকার জমবে কোথায়। সমানে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হাঁটলাম আমরা, তারপর দেখি এক গ্রামের মধ্যে পৌঁছে গেছি। হ্যাঁ, মনুষ্যবসতি নিশ্চয়ই, দস্তুরমত চাষ আবাদ চলছে। এ আবার কোথায় এলাম রে বাপু!

মুখ খুললেন বজ্রগিরি। বললেন—"এইখানেই আমরা রাতটা কাটাব। পুরাং থেকে খুব বেশী দূরে আমরা আসি নি, অনেকটা ঘুরে এসেছি বলে এত দেরি হল। এই জায়গাটার নাম দেলারাঙ্, আমাদের তাঁবু এখানে পৌঁছে গেছে। খুঁজে দেখতে হবে, কৈলাস-যাত্রীরা তাঁবু গেড়েছে কোথায়।"

অতএব আবার ঘোর।

ঘোরবার আগে বজ্রগিরি শিষ্যটিকে সাবধান করে দিলেন সোজা ভাষায়—"প্রাণে যদি বাঁচতে চাও বাপু তাহলে দয়া করে মুখ বন্ধ করে থাক।"

অতএব এ কথা বলা অন্যায় হবে না যে প্রাণ হাতে করে পরদিন প্রভাতে যাত্রা করলাম আমরা। মস্ত বড় একটা দলের সঙ্গে চলেছি। ঝাব্বু ঘোড়া তাঁবু সমস্তই চলেছে। অন্ততঃ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন মানুষ যাচ্ছে। বুড়ো-বুড়ী যুবক-যুবতী সাধু-সন্ন্যাসী আর আমার মত মাঙ্‌নে-খানেওয়ালারা সবাই তীর্থযাত্রী। মানসসরোবর আর কৈলাস পরিক্রমা করে জন্ম সার্থক করার বাসনা নিয়ে চলেছি সবাই। আর কোনও কষ্ট নেই। মাথা কামড়ানি বরদাস্ত হয়ে গেছে। শুধুই শ্বাসকষ্ট, হাওয়া এত পাতলা যে বুক ভরে নিশ্বাস নিলেও দম আটকে আসে। পাতলা হলে হবে কি, সে হাওয়ার দাপট সহ্য করবার শক্তি বোধ হয় গণ্ডারেরও নেই। অবিরাম এলোপাতাড়ি ঝড়, উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম চারিদিক থেকে একসঙ্গে ছুটে আসছে হাওয়া, মুখোমুখি ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে। যাকে বলে তুলকালাম কাণ্ড। চামড়ার টোপরে কান ঢাকা পড়েছে, তবু কানের পর্দা ফাটবার উপক্রম। অগুনতি লামা রয়েছেন তিব্বতে, সকলের সমবেত তপস্যার শক্তিতে তিব্বতী হাওয়াকে যদি নিস্তব্ধ করা যেত তাহলে বোধ হয় কৈলাস যাত্রাটা অনেক শান্তির ব্যাপার হত। দিবারাত্র অষ্টপ্রহর সেই তুমুল গর্জন কাঁহাতক সহ্য করা যায়।

এখানে একটা কথা বলে রাখি—পুরাং থেকে যাত্রা করে কৈলাস মানসসরোবর পরিক্রমার পর পুরাং পর্যন্ত আসতে মোট তের বা চোদ্দ দিন লেগেছিল আমাদের। ঐ তের-চোদ্দ দিনের রসদ বয়ে নিয়ে যেতে হয়। পুরাং ছাড়বার পরে আর কোথাও কিছু পাওয়া যায় না।

যাঁরা ধীরে সুস্থে যান তাঁদেরও ষোল-সতের দিনের বেশী লাগে না। রসদ আর বন্দুক সঙ্গে থাকলেই হল। বন্দুক থাকা চাই-ই চাই। কারণ কৈলাসনাথের অনুচরেরা সদাসর্বক্ষণ ওৎ পেতে আছে। তাঁদের পরিচয় পরে দিচ্ছি।

আর একটি কথা—কৈলাসযাত্রার যত আপদবিপদ সমস্তই ভোগ করতে হয় পুরাং পৌঁছবার আগে। পুরাং থেকে যাত্রা করার পরে

সত্যিই আর কোনও কষ্ট সহ্য করতে হয় না। অবশ্য ষোল হাজার ফিট ওপরে শ্বাসকষ্ট হবেই, ওটাকে যিনি ভয় করবেন তাঁর পক্ষে আমাদের দীঘায় তীর্থ করতে যাওয়াই একান্ত কর্তব্য।

এইবার আমাদের যাত্রার কথা।

প্রথম দিনটি ভালয় ভালয় কাটল। প্রায় সারাটা দিন একটানা চলবার ফলে যেখানে পেঁাছলাম আমরা, সেখান থেকে মান্ধাতা দেখা যায়। ঐ মান্ধাতা পাহাড়কে ডাইনে রেখে পরদিন চলতে হবে। চলতে চলতে আমরা মানসসরোবরে পেঁাছে যাব।

তাঁবু পড়ল। প্রাণ হাতে নিয়ে চলেছি এ কথাটা ভুলে মেরে দিয়েছি ইতিমধ্যে। তখন এক চিন্তা, মানসসরোবরকে একটিবার দর্শন করে যেন মরি। হে কৈলাসপতি—দোহাই বাবা!

কৈলাসনাথের কাছে ক্ষমা চেয়ে নির্জলা সত্যি কথাটি বলে ফেলি এখন। কৈলাসযাত্রায় শান্তি স্বস্তি সুখ কিচ্ছু নেই। কেউ কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় করারও সুযোগ পায় না। যখন পথ চলে তখন পবন দেবের জ্বালায় চোখ বুজে থাকতে বাধ্য হয়। যাঁদের চোখে কালো চশমা থাকে তাঁরা চোখ মেলতে পারেন। কিন্তু চশমাটি এমন হওয়া চাই যে ভেতরে হাওয়া ঢুকতে না পারে। অতি বিষাক্ত হাওয়া, চোখে লাগলেই চোখ ফুলবে, জবা ফুলের মত টকটকে লাল হয়ে উঠবে, দিনরাত পিচুটি তো পড়বেই। সাক্ষাৎ কিন্নরীরাও যদি সাক্ষাৎ দর্শন দেন মানসকৈলাসে তাহলেও আপনার আমার মত নিচের তলার মানুষ তাঁদের পানে তাকাতে পারবে না। চোখের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে উঠলে কে কার পানে তাকাতে পারে।

ঐ তো গেল দিনের বেলার অবস্থা। দিনান্তে একটিবার তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে পারলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে কুপোকাত। তাঁবুতে আগুন লাগলেও কেউ কম্বলের তলা থেকে মুখ বার করবে কিনা সন্দেহ।

তবু মানুষ যায়। অদৃশ্য দড়ি নাকে গলিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যান কৈলাসনাথ। কৈলাসনাথের আর এক নাম ভূতনাথ এইটি মনে রাখতে হবে। ভূতনাথের ভূতদের বেগার খাটাই হল কৈলাসযাত্রা।

পুরাং মঠ থেকে রওয়ানা হয়ে প্রথম রাত কাটল দেলারাঙ্‌ গ্রামে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল চোখ কান বুজে হাঁটুনি। দিনান্তে যেখানে তাঁবু পড়ল সেখান থেকে মান্ধাতা দেখা যাচ্ছে। অকপটে স্বীকার করছি, মান্ধাতা পাহাড় দেখেও বুকে একটু বল পেলাম না। এতটুকু আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না কেউ, যে যার তাঁবুতে ঢুকে কম্বলের তলায় আশ্রয় নিলে।

এক সময় খাদ্যদ্রব্য এসে পৌঁছল মুখের কাছে। কে দিলে কোথা

থেকে এল জানবার দরকার কি। কোনও রকমে গিলে ফেলতে পারলে আপদ চুকে যায়। সেই চা-সিদ্ধ গরমজলে গমের ছাতু গোলা অপরূপ পদার্থ। তা হোক, সেই পদার্থ পেটে স্থানলাভ করবার পর ধড়ে প্রাণ এল যেন। উঠে বসলাম। ঠ্যাং দুখানাকে বন্ধনমুক্ত করতে হবে। আগের দিন যে সময় বাঁধা হয়েছিল ঠ্যাং তারপর আবার সেই সময়টা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টার ওপর দু ঠ্যাং সহ্য করছে সেই বিচিত্র বন্ধন, রাতের মত ওদের রেহাই দেওয়া যাক।

তাঁবুর ভেতর নীরন্ধ্র অন্ধকার। কে কোথায় শুয়েছে জানা নেই। এইটুকুই জানি যে লোধা সিং আমার কাছাকাছি আছে। দুজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও আছেন তাঁবুতে, মাঝে মাঝে তাঁদের কাশি শুনছি। বজ্রগিরি কোথায় কোন্ তাঁবুতে আছেন কে জানে। দেলারাঙ্ থেকে যাত্রা করার সময় দেখেছিলাম বজ্রগিরির প্রতাপ। দলসুদ্ধ সবাই ওঁর কাছে জোড়হস্ত। মেয়েপুরুষ প্রত্যেকে ওঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করল। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে বজ্রগিরিই দলপতি। দলপতির জন্যে নিশ্চয়ই আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা হয়েছে।

অনেকগুলো চামড়ার ফালি দিয়ে সেই বিচিত্র পাদুকা বাঁধা হয়েছিল, লামা জঙ্গ-চুপ-সেম্পা সামনে দাঁড়িয়ে সেই বন্ধন-কর্ম পরিচালনা করেছিলেন। সাক্ষাৎ যমের মত দেখতে দুই তিব্বতী বেঁধেছিল। গিঁট আলগা করার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম। একটা ঠ্যাং মুখের সামনে তুলে দাঁত দিয়ে গিঁট আলগা করতে গেলাম। গোটাকতক দাঁত উপড়ে আসার উপক্রম হল, একটি গিঁটও এতটুকু নড়ল না।

কাটতে হবে। ধারালো কিছু একটা চাই, প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু গো-চর্মের ফিতে কাটা সহজ কথা নয়। কাটতে কিন্তু হবেই এবং তৎক্ষণাৎ কাটতে হবে। অসহ্য—আর এক মুহূর্ত কোনমতেই সহ্য করা হবে না। কেন তখন বাঁধতে দিয়েছিলাম ঠ্যাং দুখানা। ঐ তো শুধু পায়ে চলেছেন সাধুরা, কার ঠ্যাং ক্ষয়ে যাচ্ছে। যার যা খুশি

বেঁধে দেবে আমার শরীরে এত বড় আস্পর্ধা ! চলেছি কৈলাস পরিক্রমা করতে পাঁচ সাত সের কাঁচা গোচর্ম বয়ে নিয়ে। কেন—কি হয়েছে আমার ? ঐ বজ্রগিরি ঐ লোধা ওরা ভেবেছে কি আমাকে ? কচি খোকা পেয়েছে ?

আগুন জ্বলতে লাগল মগজে। কম্বল-ফম্বল পড়ে রইল, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাঁবুর এক পাশ তুলে। একটা কিছু চাই, কিছু না পাই পাথর আছে। পাথর দিয়ে রগড়ে রগড়ে কাটব।

তাঁবুর বাইরে অন্ধকার নেই। নিদারুণ কুয়াশা, পবনদেব বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত দিয়েছেন। ঘষা কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখছি যেন, বহুদূরে মান্ধাতা পাহাড় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এক প্রাণী বাইরে নেই, ঝাব্বু ঘোড়া সব তাঁবুর মধ্যে। তাঁবুগুলোর পানে তাকিয়ে বুকের ভেতর কেঁপে উঠল। ওরা যেন সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ার, দল বেঁধে ওৎ পেতে বসে আছে তুষারের মধ্যে, নড়েচড়ে উঠবে একটু পরে।

ঠ্যাং দুখানাকে বন্ধনমুক্ত করার সংকল্পটি কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে রইলাম। নীরবতার ভাষা শুনছি তখন, দেখছি নীলকণ্ঠের আসল রূপ। যখন সৃষ্টি কর্মটি শুরু হয় নি তখন যা ছিল তাই দেখছি।

মহাকাল। মহাশূন্যতা।

মহাকালের রূপ মহাশূন্যতা। ঐ রূপ দেখবার বাসনা হলে নিষুতি মান্ধাতার পানে তাকিয়ে থাক। শোন নীরবতার ভাষা কান পেতে—

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো, বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বাবন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্ ॥

নির্বিকল্প অবস্থায় বেশীক্ষণ কাটাবার সৌভাগ্য হল না। সংশয় নড়েচড়ে উঠল। ঘষা কাঁচের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম বিশালাকৃতি একটা কিছু এগিয়ে আসছে। কি ওটা ?

এক মুহূর্তের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে মন-বুদ্ধি কত

কি আন্দাজ করে ফেললে। দেবতা পিশাচ ভূত ডাকাত কিংবা সেই তুষারমানব, কাকে দেখছি? দেখছি কিন্তু ঠিকই, নজর ঠকাচ্ছে না। ঐ তো এগিয়ে আসছে, সাদা কুয়াশার মধ্যে কালো মূর্তিটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পেছন ফিরে দৌড়ব নাকি? জাগানো উচিত সবাইকে। অন্ততঃ একজনের জেগে পাহারা দেওয়া উচিত ছিল। এইরকম সাংঘাতিক জায়গায় দলসুদ্ধ মানুষ তাঁবুর ভেতর শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে, এতটা বেপরোয়া হওয়া নিশ্চয়ই উচিত হয় নি।

মন-বুদ্ধি যতই আঁকুপাঁকু করুক, শরীরটা একচুল নড়ল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম, ক্রমেই কাছে এগিয়ে এল সেই মূর্তিটা, একদম এক হাত সামনে এসে পৌঁছল। দম বন্ধ হয়ে গেছে তখন, মন-বুদ্ধিও স্তব্ধ হয়ে গেছে। তরঙ্গ আর নেই, শুধুই অপেক্ষা, নির্জলা ঔৎসুক্য—কে ও?

কি যেন শুনতে পেলাম না? দাঁতে দাঁত চেপে তাকিয়ে আছি—বলুক আর একটিবার কি বলছে।

"বাইরে বেরিয়েছ কেন?" সামান্য তিনটি বাক্য, খুবই চাপা গলায় আবার বলা হল। তৎক্ষণাৎ চিনলাম—স্বয়ং বজ্রগিরি। কয়েকটি মুহূর্ত সেই অবস্থায় পার হল। আরও কিছু শোনার আশায় কান পেতে রইলাম।

"বারণ করেছি না বাইরে বেরুতে। দরকার পড়লে যা করার তাঁবুর ভেতরেই করবে, কিছুতেই কেউ বাইরে বেরুবে না। মরতে চাও?"

প্রত্যেকটি কথা খুবই ভাল ভাবে শুনতে পেলাম। নড়লাম না তবুও। ভয় দেখাচ্ছেন? কি ভেবেছেন আমাকে?

"না, তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না। যতক্ষণ না ফিরে আসছি কৈলাস থেকে ততক্ষণ সকলে আমার হুকুম মেনে চলবে—এইটুকু আশা করেছিলাম। ঠিক আছে, এস আমার সঙ্গে। আজ রাত্রেই হয়তো বুঝতে পারবে আসল ব্যাপারটা।"

অতএব চললাম। সেই আসল কথাটি যে আমায় জানতেই হবে

গুণে গুণে পা ফেলছি। ষাট কদম বাড়বার পর খাদে নামতে হল। কোমর সমান নিচু খাদের গর্ভে বরফ জমেছে। মুখ মাথা পেঁচানো কম্বলখানা খুলে আমার গায়ে ফেললেন বজ্রগিরি। তখন সবিস্ময়ে দেখলাম তাঁর কাঁধে যা ঝুলছে। একটি রাইফেল, ইংরেজ-রাজের সৈন্য পুলিস হামেশা ঐ বস্তু কাঁধে ঝুলিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেশ-সুদ্ধ মানুষকে ওর মাহাত্ম্য বুঝিয়ে ছেড়েছে। অন্ধকারে সেই জ্যান্ত দেবতার পানে তাকালেও চিনতে ভুল হল না। কিন্তু—

কেমন যেন কুঁকড়ে গেল মনটা। ও জিনিস এখানে কেন! নীরবতার ভাষা শোনা যায় যেখানে সেখানে ঐ জঘন্য দুশমনকে কাঁধে ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন বজ্রগিরি! পারবেন উনি এই জায়গায় ঐ পাপকে ব্যবহার করতে!

"কম্বল জড়িয়ে বসে পড়, মাথা তুল না। এই কুয়াশা আয়নার মত, বহু দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমাদের। খাদের ওপর মাথা তুলে নড়াচড়া করলেই ধরা পড়ে যাব।" বলতে বলতে বজ্রগিরি রাইফেলটিকে খাদের কিনারায় যথাযথভাবে স্থাপন করে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তাঁর মাথা খাদের ওপর উঁচু হয়ে রইল। কিন্তু একদম স্থির, একটিবারের জন্যে একচুল নড়ল না। প্রায় ওঁর গা ঘেঁষে বসে রইলাম, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম মাথাটির দিকে। অদ্ভুত ব্যাপার, ঐভাবে নিশ্চল হয়ে জ্যান্ত মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে?

অনেকক্ষণ পরে সেইভাবে স্থির হয়ে থেকে থেমে থেমে বলতে লাগলেন—"লোধাকে বাঁচাবই। কিছুতেই ওরা আমার হাত থেকে লোধাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। জ্যান্ত কবর দিয়েছিল—আমার ভুল—ভাবতেই পারি নি যে এখানেও ওরা পিছু নেবে। ভালই হল—ভবানীর দয়া—দুশমনি করার শখ এবার মিটবে ওদের। ফিরতে পারবে

না এখান থেকে—পড়ে থাকবে এখানে—একশ বছর,পরে যার আসবে এই তীর্থে তারাও দেখতে পাবে হাড়গুলো। কিছুই নষ্ট হয় না এ রাজ্যে—মানুষ এখানে মরেও মরে না—কিছু না কিছু পড়ে থাকবেই। সঠিক সংবাদ পেয়েছি—আগে চলে গেছে তারা। দিনের বেলা সামনে আসতে সাহস হবে না। বজ্রগিরির চোখে ধুলো দেবে—আর একবার ঠকাবে আমাকে—কি আস্পর্ধা!”

স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বহুক্ষণ পরে লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন—“না, এ রাতটা দেখছি ভালয় ভালয় কাটল। কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত পৌঁছে যাব রাক্ষস তাল। এখান থেকে বড় জোর বিশ মাইল. কিন্তু চড়াই আছে। একটা পাহাড় ডিঙোতে হবে, ডান পাশের ঐ মান্ধাতা পাহাড়ের তলা দিয়ে গেলে সোজা মানসসরোবর পৌঁছে যেতাম। কিন্তু ও পথে নয়, ঐ পথেই নিশ্চয়ই গেছে তারা। যাত্রীরা আগে মানসসরোবরেই যায়। আমরা আগে কৈলাস যাব। এতগুলো মানুষ চলেছে তীর্থ করতে, প্রথমেই একটা খুনোখুনি দেখলে সকলের মন খারাপ হয়ে যাবে। থাকুক এখন, কোথাও না কোথাও ওদের দেখা পাবই। ওরাই খুঁজুক না আমাদের, আমাদের কোন্ দায় পড়েছে ওদের খোঁজবার।”

আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। জয় বাবা কৈলাসপতি—দোহাই বাবা—খুনোখুনিতে কাজ নেই—ভালয় ভালয় যেন—

সবটুকু গুছিয়ে বলবার আগেই বজ্রগিরি গেয়ে উঠলেন—

ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে মাতা চ জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্॥

রাইফেলটি সযত্নে জোব্বার ভেতর চালান করে দিলেন বজ্রগিরি। বাইরে থেকে দেখে বুঝতেও পারবে না কেউ যে সেই সাংঘাতিক জিনিসটি ওঁর অঙ্গে ঝুলছে। দুজনেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি তখন। বহুদূরে মান্ধাতার মাথায় সিঁদুরের ছোপ ধরেছে। জাগছেন পবনদেব

সারাটা দিন দামালপনা চালাবেন বলে। একটু একটু ঢেউ উঠেছে কুয়াশা সমুদ্রে। খাদ ছেড়ে আমরা ওপরে উঠে পড়লাম।

"আর দেরি করে কাজ নেই, জাগাতে হবে সবাইকে, এখনই যাত্রা করা চাই। বিশ মাইল চলতে হবে আজ। যাও, লোধাকে উঠিয়ে দাও। ওধার থেকে আমি একটু ঘুরে আসি।" বলে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন বজ্রগিরি। ফিরে চললাম আমি। মনে পড়ে গেল গুণে গুণে ষাট কদম এসেছি, অতএব ষাট কদম গেলেই তাঁবু দেখতে পাব। কিন্তু চিনতে পারব কি করে আমাদের তাঁবুটা! অন্য কোনও তাঁবুতে ঢুকলে যে কেলেঙ্কারি হবে।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। কাজ নেই গিয়ে, ফিরে আসুন উনি, দুজনে একসঙ্গে যাব। মনে পড়ে গেল যে ঠ্যাং দুখানাকে বন্ধনমুক্ত করতে হবে। নিচু হয়ে একটা ধারালো পাথর খুঁজতে লেগে গেলাম।

খট্ খট্ খটাস্ খট্—তারপরেই ভট্—আওয়াজগুলো স্পষ্ট কানে গেল। ঝট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। তখনও শোনা যাচ্ছে শেষ আওয়াজটার প্রতিধ্বনি, ছুটতে লাগলাম। কোথায় গেলেন বজ্রগিরি! সর্বনাশ হয়ে গেল নাকি!

"থাম, আর এগিও না।" ধমক শুনে বাঁ পাশে তাকিয়ে দেখতে পেলাম ওঁকে। একটা বড় পাথরের পাশে হাঁটু গেড়ে রয়েছেন, হাতে সেই রাইফেল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"একটা বিপদ ঘটাবে দেখছি। তোমার মত লোককে সামলানো দায়। চল দেখে আসি গে। যদি বেঁচে থাকে এখনও পরিচয়টা নিতে হবে।"

যদি বেঁচে থাকে! যদি বেঁচে থাকে এখনও!

ছুটতে লাগলাম বজ্রগিরিকে ফেলে। যদি এখনও বাঁচানো যায়!

আবার ধমক লাগালেন উনি—"যাচ্ছ কোথায় মরতে? রাইফেল না থাকলেও ছোরা-ছুরি থাকতে পারে তার কাছে। কজন আছে তারই বা ঠিক কি। যদি একজনের বেশী থাকে?"

ছোটা বন্ধ হল। হাঁটতে লাগলাম ওঁর সঙ্গে। রাইফেল বাগিয়ে

ধরে সাবধানে চারিদিকে নজর ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চললেন উনি।

অবশেষে দেখা গেল। কালো কম্বল জড়ানো কি যেন একটা পড়ে আছে। হ্যাঁ মানুষ, নিশ্চয়ই মানুষ। ভুলে গেলাম সব। দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। উল্টে ফেললাম তাকে। ছ্যাঁকা লাগল যেন হাতের চেটোয়। বোকার মত তাকিয়ে রইলাম নিজের হাত দুখানার পানে—দু হাতের চেটোই লালে লালে।

"খোল শীগ্‌গির যা আছে ওর গায়ে, খুঁজে দেখ কিছু পাও কি না। আমি নজর রাখছি, আর কেউ হয়তো—। আঃ জলদি কর না, এধারে সকাল হয়ে গেল।"

হুকুম—তামিল না করে উপায় নেই। তার কম্বলেই রগড়ে হাত দুটো পরিষ্কার করলাম। কম্বলটা খোলবার জন্যে তুলে বসালাম তাকে। কম্বল কোট সোয়েটার সার্ট তুলোর গেঞ্জি তার নিচে আর একটা সার্ট অত কি খোলা যায় মড়ার গা থেকে। গরম কোটটা আর সোয়েটারটা খুললাম কোনও রকমে, বাকী সব ছিঁড়ে ফেললাম। আসল খাঁচাটা বেরিয়ে পড়ল। শুধুই হাড়, চেষ্টা করলে এক-একখানি করে গোণা যায়। বুকের বাঁ পাশে বেশ বড় একটি গর্ত, পিঠের ডান দিকে একটি ছোট গর্ত, বুলেটটা পিঠের সেই ছোট গর্ত দিয়ে ঢুকে কোণাকুণি বেরিয়ে গেছে।

আবার হুকুম হল—"খুঁজে দেখ জামাগুলো ভাল করে।"

ভাল করেই খুঁজতে লাগলাম। নেশা ধরে গেছে তখন, মানুষটাকে মানুষ বলে মনেই হচ্ছে না। নিশ্চয়ই কিছু খুঁজে পাব, এমন কিছু পাব নিশ্চয়ই যা বলে দেবে ওর পরিচয়। তন্নতন্ন করে খুঁজে বার করলাম বহু জিনিস। সস্তা সিগারেট, দেশলাই, ছোট ছুরি একখানি, টাকাকড়িসুদ্ধ একটি মণিব্যাগ, কয়েকখণ্ড সুগন্ধী সুপারি, ছোট্ট একখানি গোল আয়না, চিরুনি, তিনটে শিশিভরতি তিন রকমের ট্যাবলেট,

এক টিউব মুখে মাখবার ক্রীম। রেগে উঠলাম মড়াটার ওপর, হত-ভাগাটা এমন কিছু সঙ্গে রাখে নি যা থেকে ওর পরিচয় জানা যায়।

"ঐ ছুরি দিয়ে প্যান্ট কেটে খুলে ফেল। দেখ, প্যান্টের ভেতর কি আছে। হাত চালাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

বাঁচা গেল ছুরিখানা পেয়ে। প্যান্ট কেটে ফেলতে বেশী সময় লাগল না। প্যান্টের পকেটে পাওয়া গেল কতকগুলো শুখনো মেওয়া। কিন্তু এটা আবার কি? প্যান্টেরও ভেতরে পকেট থাকে নাকি? পকেটের মাথায় আবার বোতাম লাগানো। টিপতেই মালুম হল মণিব্যাগ গোছের কি যেন রয়েছে। তর সইছে না আর তখন, ছুরি দিয়ে ফ্যাঁস করে টান দিলাম পকেটের গায়ে, চ্যাপটা একটা চামড়ার খাপ বেরিয়ে পড়ল। খাপটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল ফোটো, তিনখানা ফোটো। কুয়াশার ভেতর স্পষ্ট দেখা গেল না ফোটোগুলো, বজ্রগিরির দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

বাঁ হাতে ধরলেন ফোটোগুলোকে। মুখের সামনে তুলে এক মুহূর্ত তাকিয়ে বললেন—"আসল জিনিস পাওয়া গেল এতক্ষণে। বজ্রগিরি ভুল করে না। যাক, পাজামাটা দেখে নাও ওপর থেকে, ওটা আর খুলতে হবে না। জামাকাপড়গুলো চাপা দিয়ে দাও। ঢেকে দাও সব কম্বল দিয়ে। চল পালাই। এতক্ষণে হয়তো সবাই উঠে পড়েছে।"

ফিরে আসছি।

বার বার হাত দুখানা মুখের সামনে তুলে দেখছি লাল ছোপ পড়েছে কি না। পড়লেও উঠে যাবে। বরফ দিয়ে ঘষতে হবে। দাগটা উঠলেও গন্ধ কিন্তু যাবে না। রক্তের গন্ধ, তাজা রক্তের গন্ধ, মানুষের গন্ধ, কারণ রক্তটা যে মানুষের। মানুষের গন্ধ এত বিশ্রী!

"এইবেলা ভাল করে দেখ ফোটোগুলো। বেশ আলো ফুটেছে, একটু নজর করে দেখলেই ঠিক চিনতে পারবে।" বলতে বলতে ফোটোগুলো আমার হাতে দিলেন।

দেখলাম। এক এক করে তিনখানাই দেখলাম। তিনজন জেল ওয়ার্ডার হাফপ্যান্ট পরে রুল হাতে করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে একখানা ছবিতে, আর একখানায় এক বৃদ্ধ শিখ এক যুবক শিখের কাঁধে হাত দিয়ে হাসছে, তৃতীয়খানায় সেই যুবক শিখটি সেজেগুজে বসে আছে এক যুবতীর পাশে। দেখলেই বোঝা যায় ওটা বিয়ের ছবি, সদ্য বিয়ে করে ফোটো তুললে ঐরকম বোকা বোকা দেখায়।

"চিনতে পেরেছ?" প্রশ্নটি করে আমার মুখপানে তাকালেন বজ্রগিরি। হাত পেতে বললেন—"দাও ওগুলো, আমার কাছে থাকুক। পাছে ভুল হয়, চিনতে না পারে লোধাকে, তাই ঐ ফোটোগুলো সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। কি দুঃসাহস দেখ! ঐ লোকটা এই দলেই ভিড়ে পড়েছে। মওকা পেলেই খতম করে দিত লোধাকে। কিন্তু আমার পেছনে গেল কেন? কোনও কিছু পাওয়াও তো গেল না ওর কাছে যা দিয়ে আমাকে নিকেশ করতে পারে। কি মতলবে গিয়েছিল তাহলে?"

এসে পড়েছি তখন তাঁবুগুলোর কাছে। দূর থেকেই বোঝা গেল সবাই জেগেছে। ধোঁয়া দেখা গেল। তার মানে চা-পাতা ফোটানো শুরু হয়ে গেছে।

থামলেন বজ্রগিরি। বললেন—"এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ব্যাপারটা। ভুল করো না। ভুলের ফল সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি তোমাকে চিনতে না পারতাম তাহলে এতক্ষণে তুমিও—। যাক, সহজে ভুল হয় না বজ্রগিরির। তাঁবু থেকে বেরিও না কিন্তু রাত্রে। বুড়ো হয়েছি তো, চোখ দুটো হয়তো নিমকহারামি করে বসল আমার সঙ্গে। চিনতে পারলাম না। নিশানা কিন্তু আমার অব্যর্থ। চোখ বেইমানি করলেও হাত বেইমানি করবে না। আগে যাও তুমি, দেখ তোমার বন্ধুটি উঠেছে কিনা। আমার বিশ্বাস, আর তুমি ওকে একলা ফেলে রেখে তাঁবু ছেড়ে বেরুবে না।"

না, ঐ ভুলটি আর একবার নিশ্চয়ই করব না। পুরাং ফিরে আসা পর্যন্ত লোধা সিং আমার চোখে চোখেই থাকবে।

ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে লোধা, স্নান করা হল না। ঐ অবস্থায় আর সে থাকতে পারছে না। যতক্ষণ না স্নান করতে পারছে ততক্ষণ কিছুই মুখে তুলবে না। সত্যিই খেলো না চা ছাতু, নিরম্বু উপোস করে রওয়ানা হল। যে দুজন বৃদ্ধ সাধু ছিলেন আমাদের তাঁবুতে তাঁদের একজন কৈলাস ঘুরে এসেছেন কয়েক বছর আগে। তিনি ওকে সান্ত্বনা দিলেন। সামনেই রাক্ষস তাল, দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাব আমরা, স্নান করা যাবে। কিন্তু খুব সাবধান, রাক্ষস তাল মানুষ খায়। ঐ তলাওটার জলে নামলে আর রক্ষে নেই। পাড়ে দাঁড়িয়ে জল উঠিয়ে স্নান করতে হবে।

শুনে লোধা এর ওর তার কাছে বালতির সন্ধান করতে লাগল।

ক্রমেই ওপর দিকে উঠতে লাগলাম। সাধুটি বললেন— পাহাড়টির নাম গুরলা, গুরলার মাথায় উঠলেই রাক্ষস তাল দেখা যাবে। রাক্ষস তালের অপর পাড়ে কৈলাসও দেখা যাবে।

কৈলাস দেখা যাবে সংবাদটি শুনে বেশ কিছু সময় অন্যমনস্ক হয়ে পা চালাতে লাগলাম।

তাহলে সত্যিই দেখা যাবে কৈলাস পাহাড়!

খিদিরপুরের ভূকৈলাস নয় সত্যিকারের কৈলাসকে চাক্ষুষ দেখব। কি এমন পুণ্য করেছি আমি যে ইহজন্মেই কৈলাসদর্শন হবে!

আগাগোড়া জীবনটা মুখস্থ রয়েছে। কি রকম ঘরে জন্মেছি, লাথি ঝাঁটা খেতে খেতে নিতান্ত বেহায়ার মত কি রকম ভাবে বড় হয়েছি, কতটুকু শিক্ষা পেয়েছি, কত জনে কত ভাবে ঘেন্না করেছে, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মনে মনে চুলচেরা বিচার করতে লাগলাম। কই, কোথাও তো এমন কিছু শুভ লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যার দরুণ মনে করা যেতে পারে কৈলাস দর্শনের মত মহাসৌভাগ্য ইহজন্মে ঘটে বসবে। তাহলে কি বুঝতে হবে যে প্রারব্ধ কথাটা ষোল আনা ফালতু কথা নয়!

পূর্বজন্মের কর্মফল নিশ্চয়ই। ইহজন্মে কৈলাসদর্শন হচ্ছে পূর্ব-

জন্মের কর্মফলে, ইহজন্মের এই কৈলাসদর্শনের ফলটা পরজন্মে মজা করে ভোগ করা যাবে। কিন্তু সেই মজাটি কেমন জাতের মজা তা যদি কোনও রকমে এখন জানবার উপায় থাকত!

অসহ্য অসহ্য। এইভাবে অন্ধের মত বেঁচে থাকা সত্যিই অসহ্য। কাল কি হবে তা জানবার কোনও উপায় নেই। কাল তো কালকের কথা, আজ এই মুহূর্তের পরমুহূর্তে কি ঘটবে তাও জানি না। একে কি অন্ধের মত বাঁচা বলা অন্যায়?

কি লাভ হল? ছ বছরের বেশী হয়ে গেল তিন-তিনটে কুটকচালে ব্রত বজায় করে নীলকণ্ঠের আশ্রয়ে টিকে আছি, কি পেলাম? সত্যিই তো আর আমি তীর্থ করে পুণ্য কামাবার লোভে আসি নি। বদরী কেদার যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী কৈলাস মানসসরোবর দেখলে পুণ্য কামানো হয়, এই পবিত্র তত্ত্ব বিশ্বাস করব এমন থসথসে বিশ্বাস আমার রক্তে নেই। তবু সব ঘোরা হয়ে গেল। ঘুরব না তো করব কি! তিনটে বছর ঐ ব্রত তিনটিকে ঘাড়ে করে বসে থাকতাম কোথায়? চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকলে পাগল হয়ে যেতাম যে।

অন্যমনস্ক হয়ে পা চালাচ্ছিলাম। প্রচণ্ড জোরে একটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে সামলে গেলাম। সেই মুহূর্তে কোথায় যেন কি গড়বড় হয়ে গেল। থ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম—এক মুহূর্ত আগেও জানতে পারি নি যে একটা হোঁচট খাব। তাহলে কি ঠিক এই রকমটাই ঘটবে? জীবনের শেষ হোঁচটটি যেদিন খাব সেদিনও এক মুহূর্ত আগে জানতে পারব না কি ঘটতে চলেছে?

বজ্রগিরির বুলেটটি সেই হতভাগার অনাহতচক্র ভেদ করে বা অনাহতচক্রটিকে উপড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই বোধ হয় বুলেট তার স্বধর্ম পালন করেছে। সেই সময়টুকুর ঠিক আগের মুহূর্তে লোকটা কি জানতে পেরেছিল যে বুলেট একটা তার বুকের ভেতর ঢুকে পড়বে?

কিছুই নয়, একটা হোঁচট, যা মানুষে আকছার খায়, সেই আকছার

খাবার জিনিস হোঁচট একটি উদয় হল ওর জীবনে বজ্রগিরির বুলেট হয়ে। কি এল গেল তাতে? কিছুই নয়—কিছুই নয়।

বেঁচে থাকাটা কিছুই নয়, মরে যাওয়াটাও কিছুই নয়। বাঁচা মরা দুই-ই মস্ত বড় ফাঁকিবাজি। কাল কি হবে, এই মুহূর্তের পরমুহূর্তে কি হবে, তাও জানবার উপায় নেই। এইভাবে বেঁচে থাকাটা ফাঁকি-বাজি ছাড়া কি? কবে মরব কখন মরব কিভাবে মরব তাও জানার উপায় নেই মরার এক মুহূর্ত আগে। ঐভাবে মরাটাকে ফাঁকিবাজি ছাড়া কি বলা যেতে পারে?

ঘণ্টা কতক পরেই কৈলাস দর্শন হবে। যদি সামনের সেই সময়টুকুতে হোঁচট না খাই। জীবনটা কি? খানিকটা সময় চলার নাম জীবন। চলতে চলতে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থেমে গেল। ব্যাস—হয়ে গেল।

কেন চলেছি কৈলাস দর্শন করতে? কৈলাস দর্শন করলে কতটুকু লাভ হবে আমার? কৈলাসনাথ কি সেই শক্তি দেবেন আমাকে যে শক্তির জোরে অনাগত কালের হোঁচটগুলোকে এখনই জানতে পারব?

চমকে উঠলাম। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি সামনে। কি দেখছিলাম?

মহাশূন্যতা। হ্যাঁ নিশ্চয়ই—এর নামই তো মহাশূন্যতা। ঐ অনাগত ভবিষ্যৎ—এই মুহূর্তের পরমুহূর্তটি—যে মুহূর্তটি সম্বন্ধে কিছুই আমি জানি না—ঐ অজানা মুহূর্তগুলোকে মহাশূন্যতা বললে কি ভুল বলা হবে?

সামনের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মহাশূন্যতা দর্শন করতে হলে শূন্যদৃষ্টিই লাগে।

কানে মুখ দিয়ে চুপি চুপি কথা বললে মহাশূন্যতা—"ঐ কৈলাস, দেবাদিদেব নীলকণ্ঠ ওখানে বাস করেন। প্রণাম কর—

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ, মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্য ভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্

শিবোঽহম্॥"

ইয়াঃ! ইয়ারে কওয়া যায় রূপা দিয়া বাঁধানো সোনার দিগন্ত!

ব্যাস—খতম। সোনার মুকুট পরানো ঐ রূপোর পাঁচিলটার ওপারে আর কিছু থাকতে পারে না। যদি কিছু থাকেও থাকতে দাও, ওর ওপারে কি আছে তা জানবার বিন্দুমাত্র গরজ নেই আমার। যথেষ্ট জেনেছি বুঝেছি দেখেছি, জানা বোঝা দেখার তুঙ্গে চড়ে যা দেখছি তার পরে আর কিছু দেখতে চাই না। পরিপূর্ণ হয়ে গেল ভাণ্ড, আর নয়। চরম তৃপ্তি। যে চক্ষু দুটোকে দুশমন জ্ঞান করেছি মনে বিকার জন্মায় বলে, সেই দুশমন চক্ষু দুটো ভাগ্যে ছিল। তাই তো দেখতে পেলাম নীলকণ্ঠের আশ্চর্য রূপ গুরলার মাথায় পা দিয়ে। আর ক্ষোভ নেই, এই মুহূর্তে যদি সব শেষের হোঁচটটি খেয়ে ঠাণ্ডা মেরে যাই একদম তাতেও কোনও ক্ষতি হবে না।

যদি জিজ্ঞাসা কর, কেমন দেখলে কৈলাসকে তাহলে একটিমাত্র জবাব পাবে—অনবদ্য। অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা যার নিন্দা করা যায় না। তারপরও যদি জানতে চাও তাহলে বলব বাক্যের দ্বারা কৈলাসের স্তুতি করাও সম্ভব নয়। অক্ষরের পিঠে অক্ষর সাজালে বাক্য তৈরী হয়। নীলকণ্ঠ যে ক্ষর-অক্ষরের নাগালের বাইরে।

যদি শুধাও—কৈলাসকে দর্শন করে কি ভাব উদয় হল তোমার মনে তাহলে এক কথায় জবাব দোব—অভাব। ভাবের নাগাল পৌঁছতে পারে না কৈলাস শিখরে, সাক্ষাৎ নীলকণ্ঠ তাই ভাববিহীন।

যদি বল—তাহলে কি শূন্য হাতে ফিরে এলে কৈলাস থেকে?

অকপটে উত্তর দোব—না, কিছুতেই নয়। শূন্য হাতে ফিরব কেন—পূর্ণ হয়ে ফিরেছি। কৈলাসনাথ তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য দান করে আমার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকে পূর্ণ করে দিয়েছেন।

জানি তারপর কি জানতে চাইবে। তাই আগে থাকতে জবাবটি দিয়ে রাখি। যে ঐশ্বর্য দান করেছেন আমাকে কৈলাসনাথ তার নামটি শুনিয়ে রাখি – হলাহল।

সেই হলাহলটির নাম সৌন্দর্যতত্ত্ব।

সেটি কি!

এইবার একটু ইংরেজী ভাষার সাহায্য নিচ্ছি। বাঙলা গ্রন্থে ইংরেজী দেখলে যাঁদের পিত্তি জ্বলে ওঠে, সবিনয়ে নিবেদন করছি যে আমি তাঁদের দলের চ্যাম্পিয়ন সভ্য। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন কথাটিকে চ্যাম্পিয়ন না বলে অন্য কিছু বললে যে চ্যাম্পিয়ন বলার আরামটুকু পাওয়া যায় না।

যাক এখন শুনুন সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে Ruskin কি বলেছেন—

In all high ideas of beauty, it is more than probable that much of the pleasure depends on delicate and untraceable perception of fitness, propriety and relation, which are purely intellectual and through which we arrive at our noblest ideas of what is rightly called "intellectual beauty."

Anything which elevates the mind is sublime, and elevation of mind is produced by the contemplation of greatness of any kind ; but chiefly of course by the greatness of noblest things. Sublimity is, therefore, only another word for the effect of greatness upon the feelings ; greatness whether of matter, space, power, version or beauty.

সত্য-শিব-সুন্দর বললে যা বোঝায় Ruskin সেটুকু এমনভাবে বুঝিয়েছেন যার তুলনা হয় না।

মাত্র তিনটি লাইনে Wordsworth বলেছেন—

The universal instinct of repose
The longing for confirmed tranquility
Inward and outward humble yet sublime.

ঐ humble yet sublime হচ্ছেন সাক্ষাৎ নীলকণ্ঠ। তাই তো আমরা বলতে পেরেছি—

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং, ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্
শিবোঽহম॥

মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত দিয়ে নাগাল পাবে না আমার, কান জিভ নাক চোখ দিয়েও আমাকে ধরতে ছুঁতে পারবে না। আমি তো তোমাদের ভূমি তেজ বা বায়ু নই। আমারা রূপ চৈতন্য এবং আনন্দ তাই আমি সাক্ষাৎ শিব নীলকণ্ঠ।

চৈতন্য এবং আনন্দ যাঁর স্বরূপ তাঁকেই কি Ruskin বলেছেন—Intellectual beauty! আর ঐ যে Universal instinct of repose ওটাকে যদি বলি—

ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ুর্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ু শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্
শিবোঽহম্॥

প্রাণ বলতে যা বোঝায় ঐ পঞ্চবায়ু প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান তা নই আমি। আর এই যে দেহ রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র দিয়ে তৈরী এই সপ্তধাতুতেও আমি নেই। অন্নময় প্রাণময় মনোময় জ্ঞানময় বিজ্ঞানময় পঞ্চকোষেও আমাকে খুঁজে পাবে না। বাক পাণি পদ পায়ু উপস্থ দিয়ে যে আনন্দের স্বাদ পাও সে আনন্দ আমি নই। আমার রূপ হল চৈতন্যময় আনন্দ।

এক কথায় Inward and outward humble yet sublime.

স্নান করতে পারল লোধা। ওর স্নানের জন্যে রাক্ষস তালের ধারে পৌঁছে থামতে হল আমাদের। বিরাট তোড়জোড়, আগে এক তাঁবু লাগাও, ঘড়া ঘড়া জল এনে দাও সেই তাঁবুর ভেতরে, তবে তো বজ্রগিরি মহারাজের প্রধান চেলার স্নান হবে। সেই সর্বপ্রথম দেখলাম যে আমাদের সঙ্গে মুখে আঙটা লাগানো বড় বড় ঘড়াও চলেছে। জানতে পারলাম যে ভয়ঙ্কর রকম ধনী এক ভুটিয়া মহাজনের পত্নী চলেছেন আমাদের সঙ্গে। ইতিমধ্যে দলসুদ্ধ সবাই পরস্পরের মুখ চিনে ফেলেছে, আলাপ পরিচয় চালু হয়ে গেছে, একে অপরের সুখ-

দুঃখের সংবাদ নিচ্ছে। আমি অবশ্য বাদ, মুখ বন্ধ করে আছি, কে আসবে আমার সঙ্গে আলাপ করতে ?

দুঃখ নেই তাতে আমার। লোধা বেচারার ওপর সকলের নজর পড়েছে দেখে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

ঐ অবসরে ঝট্‌পট্‌ আর একবার চা সিদ্ধ হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা লেগেছে লোধার, গরম চা একটু না খেতে পেলে মারা যাবে যে! লোধার জন্যে আমরাও আর একবার চা পেয়ে গেলাম।

তারপর চল, এগিয়ে চল রাক্ষস তালের পাড়ে পাড়ে, সন্ধ্যার আগে কোনও মতেই থামা চলবে না। থামবে কে, সামনেই কৈলাস, হাত বাড়ালেই কৈলাস ছুঁতে পারা যায়। মাত্তর পঁচিশ-ত্রিশ মাইল লম্বা হাত চাই এই যা মুশকিল। তা তাতেই বা আটকাচ্ছে কোথায় ? পা যখন রয়েছে তখন এক হাত লম্বা খাটো হাত দুখানা বয়ে নিয়ে চল কৈলাসের কাছে। যেতে হবে তোমাকেই কৈলাসের কাছে, কৈলাস তো আর তোমার কাছে এগিয়ে আসবে না।

চলছি। চলার নেশায় পেয়ে বসেছে, না চলে উপায় কি। থামবার কথা একটিবারের জন্যেও মনের কোণে উদয় হচ্ছে না। তার প্রধান কারণ ঠ্যাং দুখানা মুক্তি পেয়েছে। রাক্ষস তালের পাড়ে লোধা যখন স্নান করছিল তখন ধারালো পাথর একখানা খুঁজে নিয়ে চামড়ার ফিতেগুলোকে কাটবার চেষ্টা করছিলাম। দেখতে পেয়ে ঝাব্বুওয়ালারা হা হা করে ছুটে এল। থাম থাম, সর্বনাশ করো না, অমন মহামূল্য সামগ্রী নষ্ট করতে আছে ? সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হয়ে পড়ল একজন পায়ের ওপর, দাঁত দিয়ে খুলে ফেলল গিঁটগুলো। তৎক্ষণাৎ সেই অদ্ভুত জুতো, জুতো বাঁধা চামড়ার ফালিগুলো, মায় পায়ে জড়ানো কম্বলের পটি সর্বস্ব তাকে দান করে ফেললাম। আহা—দানে কি বিমল আনন্দ !

আমার চেয়ে ঢের বেশী দান করে ফেললে লোধা সিং। পুরাং মঠ থেকে দেওয়া অঙ্গের আবরণ একটিও সে কাছে রাখল না। স্নান

করবার পর আবার ঐ পাপ স্পর্শ করতে আছে? তা বলে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে বেরুল না সে তাঁবু থেকে। এমন সব সাজসজ্জা জুটল ওর কপালে যা পরে মানুষ শ্বশুরবাড়ি যায়। টকটকে লাল আলোয়ান একখানা কোমরে জড়িয়ে কুচকুচে কালো এক সোয়েটার চড়িয়েছে। সোয়েটারের ওপর পেঁচিয়েছে ধপধপে সাদা এক কাশ্মিরী শাল। মাথায় জড়িয়েছে চকচকে সিল্কের চাদর। চরণে আর চড়ায়নি কিছু। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম, তুমুল উৎসাহে হাত মুখ নেড়ে কথা বলতে বলতে চলেছে ঘোড়সওয়ারনীদের সঙ্গে। আগেই জানতাম যে মহিলারা ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছেন, তাই দূর থেকে দেখেও বুঝতে পারলাম তাঁদের ঘোড়সওয়ারনী বলে। মাথা মুখ সর্বাঙ্গ ঢাকা দলসুদ্ধ মানুষের, নারী পুরুষ সব এক সাজে সজ্জিত। একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য না করলে বোঝাই যাবে না কে পুরুষ কে নারী। লোধা সিং ওঁদের না হলেও ওঁদের ঘোড়াদের গা ঘেঁষে চলেছে। বজ্রগিরির প্রধান শিষ্য লোধা, একটু আধটু বিশেষ জাতের ভক্তি-শ্রদ্ধা তো পাবেই ও। হক আছে।

আমি চলেছি দলের একেবারে পেছনে মাণ্ডকে-খানেওয়ালাদের সঙ্গে। আমার স্থানটি সুনির্দিষ্ট, লোধার মত কপাল নয় আমার। দয়া করে সঙ্গে নিয়েছেন বজ্রগিরি এইটুকুই যথেষ্ট।

স্বয়ং বজ্রগিরি কিন্তু একেবারে একলা চলেছেন। দল চলেছে ওঁর পঞ্চাশ হাত পেছনে। দলপতি যে উনি, ওঁর মর্যাদাই আলাদা। সর্দারকেই প্রয়োজন পড়লে সর্বাগ্রে শিরদার হতে হয়। শিরদার মানে শির দান করে যিনি প্রমাণ করেন যে তিনিই একমাত্র মাথাওয়ালা।

আমরা সবাই বজ্রগিরি মহারাজের শিরের প্রতি লক্ষ্য রেখেই চলেছি। লক্ষ্য রাখার উপযুক্ত শির, পোয়া মাইল পেছন থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। টিলার মত একটা জায়গায় উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বজ্রগিরি মহারাজ। কি হল? থামলেন কেন?

দিন তখন ঢলে পড়েছে। বাঁ দিকে নেমে চলে গেছেন সূর্যদেব।

সামনে রূপার দিগন্তে সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে নীলকণ্ঠ ধ্যানমগ্ন। আমরা সবাই বজ্রগিরি মহারাজের কাছে পৌঁছলাম। ডান দিকে হাত তুলে দেখালেন বজ্রগিরি—"ঐ মানস।"

সামান্য একটু মানস দেখা গেল অনেক দূরে। নীল, গাঢ় নীল আয়না একখানি।

বজ্রগিরি আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলেন—"এখন ওখানে ভগবান কৈলাসপতি আহ্নিক করছেন। এস, এখানে দাঁড়িয়ে আমরা প্রণাম করি—

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং, ন মন্ত্রো ন তীর্থং
ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ
শিবোঽহম্ শিবোঽহম্॥

*

আবার এক রাত, পুরাং থেকে রওয়ানা হবার পর তৃতীয় রাত। সেই টিলার ওপর তাঁবু খাটানো হল। মানসসরোবরকে দেখা যাচ্ছে, কৈলাসকে তো হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কাল ভোরে রাক্ষস তাল পেছনে ফেলে চলে যাব আমরা। এবং কাল ঠিক এই সময় কৈলাসের পায়ে মাথা ঠেকাতে পারব। অর্থাৎ আর মাত্র চব্বিশটি ঘণ্টা কোনও রকমে কাটলে হয়। চব্বিশ ঘণ্টার প্রথম বারো ঘণ্টা থেমে থাকতে হবে। পড়ে থাকতে হবে তাঁবুর মধ্যে। কেন? এই বারোটা ঘণ্টা অনর্থক নষ্ট। সোজা চলতে থাকলে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসের কাছে পৌঁছতে পারতাম। রাতটাকেও ফাঁকি দেওয়া যেত।

নতুন এক উপসর্গ—রাতকে ফাঁকি দেবার মতলব পেয়ে বসেছে। ঘেন্না করছে আবার একটা রাতের পাল্লায় পড়লাম বলে। বিশ্বাস করতে পারছি না রাতকে, কি অভিসন্ধি আছে ওর অন্ধকার জঠরে বুঝতে পারছি না। কবে উদ্ধার পাব রাতের গ্রাস থেকে? যতটা সময় বেঁচে আছি তার অর্ধেকটা গিলে খেয়েছে রাত। কৈলাসে এসেছি,

এখানেও পরিত্রাণ নেই। ঠিক সময় রাতের গ্রাসে ঢুকে পড়তে হল। যতক্ষণ না আবার উগরে দিচ্ছে ততক্ষণ থাক পড়ে পঙ্গুর মত। কৈলাসনাথের বাপের ক্ষমতা নেই যে রাতকে জব্দ করবে।

রান্না চড়েছে। চাল ডাল আলু ঘি মায় কাঠ পর্যন্ত বয়ে আনা হচ্ছে ঝাব্বুর পিঠে চাপিয়ে। ভয়ঙ্কর রকম ধনী ভুটিয়া মহাজনের পত্নী সর্বস্ব নিয়ে চলেছেন। গুরুজী বজ্রগিরির আদেশ হলে খিচুড়ি বানিয়ে খাওয়াবেন সকলকে। রোজ তো আর মানুষকে চা ছাতু খাওয়ানো যায় না। হাপিত্যেশ করে বসে রইল সবাই। রান্না হবে তারপর খাবে তারপর শোবে! আগুন জ্বলছে পেটের মধ্যে, সেই আগুনে কিছু আহুতি না পড়লে যে ঘুম হবে না।

তাঁবুর ভেতর ঢুকে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছি। তাঁবু তখনও খালি, যেখানে রান্না হচ্ছে সেখানে আগুনের পাশে বসে আছে সকলে। লোধা সিং পরিচালনা করছে রন্ধন, মহিলারা ওর সাহায্য নিচ্ছেন। দিব্যি জমিয়ে ফেলেছে ছোকরা। ওর জন্যে আর চিন্তা নেই। মহিলা মহলে প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছে যখন তখন নির্বিঘ্নে পুরাং পর্যন্ত ফিরে যাবে। মহিলারাই ওকে আগলে নিয়ে যাবেন।

আকাশ পাতাল ভাবছি। রাতটার জঠরে কি রহস্য লুকনো আছে কে জানে!

তাঁবুর পাশে অল্প একটু শব্দ হল। পর মুহূর্তে শুনতে পেলাম বজ্রগিরি মহারাজের স্বর। প্রায় চুপি চুপি বললেন—"মৌনীবাবা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?"

তৎক্ষণাৎ হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে কাছে সরে এসে বললেন—"চল খানিক ঘুরে আসা যাক। রান্না হতে এখনও অনেক দেরি।"

চলতে লাগলাম ওঁর পাশে পাশে। তাঁবুগুলোর কাছ থেকে অনেকটা তফাতে গিয়ে বজ্রগিরি বললেন—"এস বসি এখানে। হাওয়া বন্ধ হয়েছে, ঠাণ্ডা অনেক কম আজকে। পনেরো হাজার ফিট ওপরে

উঠেছি আমরা। কিন্তু ঐ জলের জন্যে ঠাণ্ডা কম মনে হচ্ছে। রাক্ষস তাল থেকে দূরে গেলেই আবার সেই দারুণ ঠাণ্ডা। জলের ধারে ঠাণ্ডা কম লাগে।"

বুঝলাম কথা বলার জন্যেই কথা বলছেন। বসে পড়লাম ওঁর পাশে। কান পেতে রইলাম, আসল বক্তব্য কখন বেরুবে কে জানে। শুধু শুধু নিশ্চয়ই বজ্রগিরি আমাকে তুলে আনেন নি।

উত্তর দিকে মুখ করে বসে আছি। অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কৈলাস। কুয়াশা একদম নেই। পরিষ্কার আকাশ, প্রত্যেকটি তারা গোণা যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পরে বজ্রগিরি আবার কথা বলতে শুরু করলেন।

"আমি কি ভাবছি জান মৌনীবাবা, ভাবছি এখানেই আমি থেকে যাব। এ দেশেও তো মানুষ থাকে। কৈলাসের চারিদিকে অনেক-গুলো মঠ আছে। কোনও মঠে যদি থেকে যাই, বাকী জীবনটা শান্তিতে কাটে। রাইফেল ঘাড়ে করে বেঁচে থাকতে থাকতে বাঁচার ওপরেই ঘেন্না ধরে গেছে। এইভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয়? মানুষ মারছি, এ পর্যন্ত কত মানুষ যে মলো এই রাইফেলটার জন্যে তা মনে করতেও পারি না। কিছুই নয়, ট্রিগারের সঙ্গে সম্বন্ধ আমার এই আঙ্গুলটার, যা করার এই আঙ্গুলটাই করে, কি করছে তা যেন আমি টেরই পাই না। যখন পড়ে যায় মানুষটা তখন চমকে উঠি। কি হল! ছুটে গিয়ে দেখি সেই এক দৃশ্য—একটা মানুষ মরে পড়ে আছে। ঘেন্না ধরে গেছে, মানুষের ওপরেও ঘেন্না ধরে গেছে আমার। আমার এই আঙ্গুলটার সামান্য একটু চাপ তাও সহ্য করতে পারে না মানুষ, মানুষ জাতটার ওপরেই আমার ঘেন্না ধরে গেছে। দূর দূর,, মানুষ জীব এতই দুর্বল!"

আশ্চর্য হয়ে গেলাম, বজ্রগিরিও আবোলতাবোল বকতে পারেন। কি হল? ফুরিয়ে যাচ্ছে নাকি লোকটা? ঐ বিপুল ভাণ্ডে যে আগুন অনির্বাণ জ্বলছে সেটা নিভে আসছে নাকি?

"এতদিন পাহারা দিয়েছি লোধাকে, এবার বোধ হয় ও কাজটা শেষ হল।" বলে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললেন। তারপর খুব আস্তে আস্তে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন যেন নিজেকে— "ভাল হল, এ তো সবচেয়ে ভাল হল। ভুলে থাকুক হতভাগা ঐ ভুটিয়া মেয়েটাকে নিয়ে। গারবেয়াংএ ওর বাবার বিরাট কারবার, জামাইকে রাজার হালে রাখবে। কিন্তু বাঁচবে তো? দুশমনরা কি ওকে বাঁচতে দেবে? আমি যদি পাহারা না দিই ওকে, কতক্ষণ তাহলে ও বেঁচে থাকবে। এখানেও তারা লোক পাঠিয়েছে ওকে নিকেশ করবার জন্যে। ভুলতে পারছে না, ভোলা সম্ভবও নয়। একে একে সবাইকে শেষ করে দিয়েছি কিনা, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী এমন কি পাঁচ বছরের বাচ্চাটাকে পর্যন্ত রেহাই দিই নি। অত বড় রাজবাড়ি একদম সাফ করে দিয়েছি। শুধু বেঁচে আছে বুড়ো, রাজসিংহাসনে বসে রাজাগিরি করছে। নিমকহারামি করার ফল, গাঙ্গুর সঙ্গে নিমকহারামি করেছিলি। গাঙ্গুর পেছনে ইংরেজ কুত্তা লেলিয়ে দিয়েছিলি। ভেবেছিলি গাঙ্গুর ফাঁসি হয়ে যাবে আর তুই মজা করে রাজাগিরি করবি। সে আশায় ছাই, গাঙ্গু মরবে না, ভবানী গাঙ্গুকে বাঁচাবে। জেল থেকে বেরিয়ে এলাম বজ্রগিরি হয়ে, যার ফাঁসি হবে তার ওজন তিন গুণ বেড়ে গেল। প্রতিশোধ নিলে ঐ লোধার বুড়ো বাপের ওপর, ওর বউটাকে আর বাচ্চাটাকে লোপাট করে দিলে। ফল হাতে হাতে পেয়েছে। এখন ওকে নিকেশ করতে পারলে তবু একটু বুকের জ্বালা জুড়োয় বুড়োর। গাঙ্গুকে তো আর খুঁজে পাচ্ছে না। গাঙ্গুই যে বজ্রগিরি হয়ে ওর বংশের মাথায় বজ্র হেনেছে এটা যে ভাবতেই পারে না।"

আবার চুপ। স্তব্ধ হয়ে বসে কৈলাসের পানে তাকিয়ে রইলেন কি দেখছেন? যারা মরেছে ওঁর ডান হাতের তর্জনীটার জন্যে তারা কি সামনে এসে দাঁড়াল? সেই পাঁচ বছরের বাচ্চাটাকেও দেখতে পাচ্ছেন নাকি?

মৃত্যু—অন্ধকার যবনিকা। যবনিকার পেছনে কি নজর পৌঁছয় ওঁর,

হঠাৎ উঠে পড়লেন বজ্রগিরি। ছেলেমানুষের মত হৈ হৈ করতে
পতে ফিরে চললেন।

"চল চল, খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই তৈরী হয়ে গেছে
এতক্ষণ। আমি না খেলে ওরা যে খেতে পাবে না। কি রকম
আক্কেল দেখেছ লোধার। তোমাকে আমাকে খুঁজতে বেরুবে তো।
রতে পারলে তো নন্দার চেপ্টা মুখের সামনে থেকে। ইস্, কিবা
কন্যের! দেখ নি বুঝি তুমি? আচ্ছা চল, খেতে বসে দেখিয়ে
। নন্দার বাপ-মা আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছে। ওর মাকেও
য়ে দোব। লোধা আমার পহেলা নম্বর চেলা, লোধাকে জামাই
ার আশাতেই মেয়ে নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়েছে নন্দার মা।
য পর্যন্ত পড়েছে জালে বাছাধন, এখন যাবে কোথায়। ভুটিয়া মেয়ে
ঘাতিক ধড়িবাজ, ধরেছে যখন শিকার তখন কিছুতে ছাড়বে না।"

আবার শুরু হয়ে গেল আবোলতাবোল। প্রমাদ গণলাম। এ
ভাল লক্ষণ নয়। হল কি বজ্রগিরি বাবার? বজ্রের ধ্বংসশক্তিটা
উবে গেছে?

তাঁবুর ভেতর নয়, বাইরে আগুন ঘিরে বসে একসঙ্গে খেতে হবে
বাইকে। ঝাব্বুওয়ালা ঘোড়াওয়ালাও বসবে। আগে গুরু মহারাজ
াজন করবেন, পরে সবাই প্রসাদ পাবে, ওসব আইনকানুন চলবে
। স্বয়ং গুরু মহারাজই ধমকাধমকি করে সবাইকে নিয়ে বসে
উ লেন। যার কাছে যা আছে তাতেই নাও খিচুড়ি। মৌনীর কাছে
প ুই নেই? বেশ, দাও ওকে একটা কিছুতে। সাধু মহারাজরা নিজেদের
ত রপাত্রে নিলেন। কোথায় মিলবে সবায়ের জন্যে থালা বাসন? খাওয়া
য়ে কথা। আগুনের মত গরম খিচুড়ি টপাটপ্ বদনে দিয়ে গিলে
ল। লোধা পরিবেশন করুক না, লোধাই তো ভোজন করাচ্ছে।

বজ্রগিরির বজ্রে বিদ্যুৎ নেই। সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। পহেলা
রর আমুদে মানুষ খেতে বসে যেমন ভাবে হৈ চৈ করে ঠিক
মনি কাণ্ড করতে লাগলেন।

নন্দাকে দেখলাম। লোধার হাতে খিচুড়ির পাত্র তুলে দিচ্ছে হাত থেকে খালি পাত্রটা নিয়ে আবার ভরতি করে দিচ্ছে। নন্দার মাকে দেখলাম, দিদিমাকে দেখলাম, আরও কয়েকজন মহিলাকে দেখলাম। সকলেই নন্দার আত্মীয়া, মাসী মামী খুড়ী পিসী। যেখানে যত আপনজন ছিলেন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ করতে চলেছেন নন্দার মা। ঘাবড়ে গেলাম ওঁদের গহনার পরিমাণ দেখে। পাঁচ সাত জন মহিলার হাতে গলায় নাকে কানে যে ছিষ্টির পাথর আর সোনা রয়েছে, সমস্ত খুলে নিয়ে একটা ঝাব্বুর পিঠে চাপালে ঝাব্বুটা খা হতে পারবে না।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন। হঠাৎ বজ্রগিরির গলার স্বর পাল্টে গেল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল। নিজস্ব ঢঙে নিজস্ব কায়দায় সাবধান করে দিলেন সকলকে—"খবরদার, কিছুতেই কেউ তাঁবু থেকে বেরুবে না রাত্রে। সামনেই কৈলাস—এইটুকু মনে থাকে যেন। আর ঐ রাক্ষস তাল, এখনও ঐ রাক্ষস তালের আশেপাশে রাক্ষসদের দেখা পাওয়া যায়। তোমরা জান, আমার তাঁবু নেই, আমি ঘুমাই না। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও সকলে। ভোর হলেই আবার যাত্রা। কা আমরা এই সময় কৈলাসের তলায় বসে খাওয়াদাওয়া করব। জয় কৈলাসপতি হরে।

ভাববৃত্ত্যাহি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতাম্।

কি করছি ?

আবার সেই রোগে ধরেছে—ভাববৃত্তি। সৃষ্টি করতে বসেছি হিমালয়ান্ সাহিত্য। দূর দূর—ঝাড়ু মার ঐ ভাববৃত্তির মুখে। নীলকণ্ঠের পরিচয় দিতে গিয়ে ভাববৃত্তি রোগে পেয়ে বসল। ভুলেই মেরে দিয়েছি নীলকণ্ঠ মহাশূন্যতার প্রতীক। অতএব হে অন্তঃকরণ—দোহাই তোমার—ভাববৃত্তি বিসর্জন দিয়ে শূন্যতত্ত্বে লীন হও।

বজ্রগিরি যেমন শূন্যতত্ত্বে লীন হয়ে গেলেন।

ওরা সবাই চলে গেল তারচেন। ওরা তীর্থ করতে এসেছিল যে, এবে কেন ?

কোথায় হারিয়ে গেলেন বজ্রগিরি তা জেনে ওদের কি লাভ হবে। নন্দাকে বিয়ে করবে লোধা, সংসার পাতবে। বড়মানুষ শ্বশুর মাইকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। অন্তঃকরণে—ঐ লোধার আর নন্দার ন্তঃকরণে সৃষ্টিভাব-বিশেষের উদয় হয়েছে। ওরা তো আর দেরি রতে পারে না।

আমি কিন্তু রয়ে গেলাম।

ওদের সঙ্গে সাততাড়াতাড়ি কৈলাস পরিক্রমা করার বিন্দুমাত্র রজ ছিল না আমার। তিন বছর শেষ হতে অনেক বাকী তখনও। াকী সময়টা কাটাতে হবে তো। ভালই তো হল, রাক্ষস তালের ের পড়ে রইলাম। পক্ষীব্রত অজগরব্রত সহায় রয়েছে, ভাবনা নেই। ণ্যদ্রব্য নিশ্চয়ই মুখের সামনে এসে হাজির হবে।

"শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতাম্"—অন্তঃকরণে শূন্যতত্ত্বের উদয় হবে তখন—ন মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার বৃত্তিশূন্যতা প্রাপ্ত হবে। কৈলাস মানস রিক্রমা করার প্রবৃত্তি থেকে প্র বাদ দিলে থাকে বৃত্তি। সোজা থায়—লোধার হবু স্ত্রী হবু শাশুড়ীর সঙ্গ ত্যাগ না করার বাসনাটা কটা বৃত্তি—পেশা। দিব্যি খেতে খেতে আর তাঁবুর তলায় ঘুমোতে মোতে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দেওয়ার ফন্দি। থাক, আর ফন্দিতে কাজ নেই। শূন্যবৃত্তি অবলম্বন না করলে ব্রহ্মবৃত্তিতে পৌঁছতে পারব না যে।

ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি পূর্ণত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ ॥

ঐ ব্রহ্মবৃত্তিতে পৌঁছতে পারলে তবেই পূর্ণত্ব লাভ। সুতরাং কোন্ রজে লোধার পেছনে ছুটতে যাব ?

বজ্রগিরি কি পূর্ণত্ব লাভ করলেন ?

খুঁজে দেখতে হবে, কোথায় কিভাবে লুকিয়ে আছেন বজ্রগিরি হারাজ। পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলে কি লীন হওয়া যায় ?

নির্ব্বিকার তথা বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকার তথা পুনঃ।
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্জ্ঞান সংজ্ঞকঃ॥

বিকার নেই, বৃত্তি নেই, উঠে দাঁড়াবারও শক্তি নেই। মহাশূন্যতায় ডুবে আছি। তাকিয়ে আছি সামনে—নীলকণ্ঠের পানে। এক টুকরো মানসসরোবর অনেক দূরে ডানদিকে তাকালে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দর্পণ, নীলদর্পণ একখানি। মহাশূন্যতা নীলদর্পণ। ঐ আকাশ—ঐ নীলদর্পণখানি—ওর গায়ে নিশ্চয়ই পড়ছে আমার ছায়া। সেই ছায়াটা কেমন? একটিবার সেই ছায়াটা দেখতে পেলে বুঝতে পারতাম নিজের আসল রূপ। ঐ নীলদর্পণে নিজের রূপ দেখে বুঝতে পারতাম আর কোনও বিকার আছে কি নেই।

ঊর্দ্ধ পূর্ণং অধঃ পূর্ণং মধ্য পূর্ণং তদাত্মকম্।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥

ঊর্দ্ধ অধঃ মধ্য সমস্ত ইমহাশূন্যতায় পূর্ণ হয়ে গেল। নীলদর্পণে নিজের রূপ স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

"লেও, খা লেও।"

হাত পেতে নিলাম, মুখে ফেললাম। জিনিসটা মুখের মধ্যে মিলিয়ে যাবার আগেই শুনতে পেলাম—

"বলেছিলাম—আবার দেখা হবে। এই দেখ এসেছি। ওঠ, এগিয়ে চল, নিশ্চিন্ত হও। শোন কান পেতে নীলকণ্ঠের বাণী—ঐ শোন—সৃষ্টির হলাহল যিনি কণ্ঠে ধারণ করে আছেন তিনি কি বলছেন সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে।"

শুনতে লাগলাম—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

সমাপ্ত